

চাকমা দুই রাজবংশ

১ম ও ২য় খণ্ড



কুমুদ বিকাশ চাকমা



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

ঢাকমা দুই রাজবংশ

(মুলিমা গব্বা ধাবানা গুপ্তি ঢাকমা রাজা ও রাজতুকাল)

১ম খণ্ড

১ম সংস্করণ/২০১৪ খ্রিঃ

কুমুদ বিকাশ ঢাকমা

প্রকাশনা	: চাকমা দুই রাজবংশ (মুলিমা গঝা ধাবানা শুত্তি চাকমা রাজা ও রাজতুকাল) ১ম খণ্ড, ১ম সংস্করণ (২০১৪ খ্রিঃ) ও (ওয়ান্ঝা গঝা কালা কাঙারা শুত্তি চাকমা রাজা ও রাজতুকাল) ২য় খণ্ড, ১ম সংস্করণ (২০১৪ খ্রিঃ)
গ্রন্থকার	: কুমুদ বিকাশ চাকমা
প্রকাশকাল	: বুদ্ধ পূর্ণিমা (বৈশাখী পূর্ণিমা) ২৫৫৮ বুদ্ধাব্দ ৩১শে বৈশাখ ১৪২১ বাংলা, ১৪ই মে ২০১৪ খ্রিঃ বুধবার
সংকলন কাল	: ২০০০ খ্রিঃ থেকে ২০০৫ খ্রিঃ
প্রকাশক	: লেঃ কর্নেল (অবঃ) পরিমল বিকাশ চাকমা, পি,এস,সি
সর্ব স্বত্বাধিকারী	: লেখক ও প্রকাশক।
প্রচ্ছদ (সম্মুখে)	: রাজবাড়ী (পুরাতন রাজ্যমাটি) কর্ণফুলী হ্রদে জলমগ্ন
" (পশ্চাতে)	: ফতে খাঁ কামান
প্রাণ্ডিস্থান	: কুমুদ বিকাশ চাকমা, খাদ্য শুদাম, তবলছড়ি, রাজ্যমাটি। ফোন- ০১৫৫৩৬৫৫৪৪৭
"	: লেঃ কর্নেল (অবঃ) পরিমল বিকাশ চাকমা, পি,এস,সি আনন্দ বিহার এলাকা, তবলছড়ি, রাজ্যমাটি। মোবাঃ ০১৭৩২৯২০৩০৮
মুদ্রণে বিশেষ তত্ত্বাবধানে	: রণজিৎ কুমার দেওয়ান নালন্দা প্রিন্টার্স, বনরুপা, রাজ্যমাটি। মোবাঃ ০১৫৫৬৫৯৮৩৯০
মুদ্রণে	: সীবলী অফসেট প্রেস, কাকলী মার্কেট, কাঠালতলী, রাজ্যমাটি। ফোন : ০৩৫১-৬১৮৮২
মূল্য	: ৪০০/- (চারশত) টাকা \$ 25 (Twenty Five) Dollars.

উৎসর্গ

যে সকল লেখক ও ইতিহাসবিদ তাদের লেখনী দ্বারা চাকমা জাতির পরিচয় তত্ত্বকার থেকে আলোতে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, যাদের লেখনীতে অনুপ্রাণিত হয়ে, আমি চাকমা ইতিহাসের প্রায় মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কালটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে পরিমার্জন, পরিবর্ধন ও সংযোজন করে সাধারণ পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে, সম্পূর্ণ চাকমা জাতির ইতিহাস উদ্ধারের দায়িত্ব নব-প্রজন্মকে দিয়ে আমার চোখের দৃষ্টিতে প্রতিভাত অনুসন্ধানের পথ ও মতগুলির দিক-নির্দেশনা দিয়ে আমার অগ্রজ শ্রদ্ধাভাজন পূজনীয় লেখক, চিন্তাবিদ ও গবেষক শ্রী সঞ্জীৱ চন্দ্র ঘোষ, রাজা বাহাদুর ভুবন মোহন রায়, শ্রী মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী), বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান, বাবু প্রাণহরি তালুকদার ও বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চাকমাকে শতকোটি প্রণাম ও গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে ঋণ পরিশোধ স্বরূপ আমার সামান্যতম প্রচেষ্টা ও লেখনী “মুলিমা গব্বা খাবানা গুন্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল ১ম খণ্ড” ও “ওয়াংঝা গব্বা কালা কাঙারা গুন্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল ২য় খণ্ড” বহিরা তাদের প্রতি গুন্ডি শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্বক উৎসর্গ করলাম।

তারিখ : রাঙ্গামাটি,
৩০ শে জুন, ২০০৫ ইং ।

ইতি
শ্রদ্ধাবনত
কুমুদ বিকাশ চাকমা



চাকমা রাজা দগুৰ

শুভেচ্ছা বাণী

লেখক ও ইতিহাসবিদরা জাতিকে, জাতির অতীত ও বর্তমানকে ধরে রাখেন এবং গতির পথে নিয়ে যান। জাতির অতীত জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং জাতিকে সমৃদ্ধ করে, জাতিকে উজ্জ্বল ও জীবন্ত করে। লেখক ও ইতিহাসবিদরা চাকমা জাতিকে দেৱীতে হলেও ইতিহাসের পাতায় চিত্ৰিত ও লিপিবদ্ধ করে রাখার প্রচেষ্টা চালান। এই প্রক্ৰিয়া শুরু হয় দেড় শতাব্দিক বছর আগে। এই পর্যন্ত বহু দেশী বিদেশী লেখক ও সমাজ সেবক চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতি ধরে রাখার লক্ষ্যে লিপিবদ্ধ করেছেন এবং ইতিহাসের ভান্ডারকে পূৰ্ণ ও পূৰণ করেছেন।

বর্তমান লেখকের “চাকমা দুই রাজবংশ” বইটি চাকমা জাতির ইতিহাসে আর একটা নতুন সংযোজন। ইহাতে দুই রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিহাস পৃথক পৃথকভাবে রাজাগণের ইতিহাস, রাজত্ব কাল, তাদের প্রতিভা ও অবদান, বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। ইতিপূৰ্বে কোন লেখক বা ইতিহাসবিদ এভাবে চাকমা ইতিহাস ও রাজাগণের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেননি। লেখকের এই নতুন ধারায় লিখিত ইতিহাস বর্ণনা ও উপস্থাপনা প্রসংশনীয়।

লেখক তার ভূমিকার বা প্রাক-কথনে চাকমাদের হারানো মাতৃভূমি চম্পক নগর অনুসন্ধান মূল্যবান দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। হয়তো আমাদের সমাজে অনুসন্ধিৎসু কোন গবেষক, অথবা অনাগত প্রজন্মের কোন একদিন অতীতকে গবেষণা করে, হারানো চম্পকনগর এর অবস্থান পরিচিহ্নিত করে ফেলবেন। আশা করি “চাকমা দুই রাজবংশ” ইতিহাসবিদ, গবেষক, সংস্কৃতি কৰ্মী ও অন্যান্য পাঠকেরা উৎসাহের সাথে বরণ করবেন।

তারিখ : ১৫ জানুৱাৰী ২০২৩।

ব্যৱিষ্টাৱ দেৱাশীষ ৱায়

চাকমা ৱাজা, চাকমা সাৰ্কেল

পাৰ্বত্য চট্টগ্ৰাম।



অভিযত

একুশ শতাব্দীর বিশ্বের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত চাকমা সমাজ এখন শিক্ষাদীক্ষা, পড়ালেখা, চাকরী, কাজকর্ম, ইত্যাদি নানা কাজে ও পেশায় যুক্ত হয়ে তাদের নিজ বাসভূমি পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে নানা দিক ছড়িয়ে পড়ছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এসব শহর ও ইপিজেড গুলিতে বহু হাজার চাকমা ইতিমধ্যে যেমন কাজ করছে আবার অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, কানাডা, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন এসব দেশেও অভিবাসী হয়ে এখন কয়েকশত চাকমা ইতিমধ্যে চলে গেছেন। দ্বি শতাব্দী পূর্বেও চাকমাদের একটি অংশ ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে এবং অপর একটি অংশে লুসাই হিলস বা মিজোরামে পূর্ব থেকেই বসবাসরত অবস্থায় ছিল এবং অদ্যাবধি আছে। আবারও বিংশ শতাব্দীর ৬০ এর দশকে হাজার হাজার চাকমা তাদের পূর্ব পুরুষদের যুগায়ুগান্তরের ভিটেমাটি, ঘরবাড়ি, জায়গাজমি, বাগান বাগিচা হারিয়ে আত্মীয় স্বজন সহায় সম্মল ফেলে, পাকিস্তান আমলে উদ্বাস্তু হয়ে ভারতের অরুনাচল (নেফা), আসামের মিকির হিলস, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অন্যান্য অঞ্চলে দেশান্তরিত হয়ে চলে যায়। অধিকন্তু, চাকমাদের ‘দৈংনাক’ নামে একটি শাখা বা অংশ মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে বা আরাকান প্রদেশে যুগের পর যুগ ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে পশ্চাৎপদ হয়ে আজও পড়ে আছে। চাকমাদের এহনে পরিস্থিতিতে তাদের প্রকৃত ইতিহাস কেবল অন্যদের জন্য নয় নিজেদেরও সত্যিই জানা দরকার। বহু গ্রন্থের লেখক, বিশিষ্ট গবেষক শ্রী কুমুদ বিকাশ চাকমা সম্প্রতি “চাকমা দুই রাজবংশ” নামক বইটি লিখে সে অভাবই পূরণ করেছেন যার জন্য তার অশেষ ধন্যবাদ প্রাপ্য। এই বইটিতে তিনি চাকমাদের বর্তমান রাজবংশ এবং তৎপূর্বের রাজবংশ এ দুটি রাজবংশকালীন ইতিহাসের কথা লিখতে গিয়ে প্রকৃত পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চাকমাদের তিনশত বৎসরের আধুনিক ইতিহাস লিখারই দুরূহ কাজটি করারই সূত্রপাত করে ফেলেছেন। যে সুগভীর দৃষ্টিভঙ্গী ও “ভিজন” (Vision) নিয়ে তিনি এই চাকমা ইতিহাস বইটি লিখেছেন তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, সেই সাথে নতুনত্ব ও কৃতিত্বের দাবীদার। আমাদের ঐকান্তিক কামনা ও দৃঢ় বিশ্বাস এই বইটির গবেষক, অধ্যাপক ও সুধীমহলের কাছে প্রশংসিত ও সমাদৃত হবে।

সবশেষে যাদের অবদানে চাকমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, গবেষণা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে আজকের এই উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে তাঁদের সম্মানে চাঙমা ভাষায় নিম্নের কথাগুলি উৎসর্গ করে এই অভিমতটির ইতি টানলাম।

. চাঙমার রাজপদে জনপথে ত' নাঙ

বাজি থোক বাজি থোক জনমান

গুণী তুই বাজি থাক গুণী তুই বাজি থাক।

সুখে দুখে জনমান আমি ঈদত তরে রাখেবং গুণী

ফুলে ফুলে ত' নাঙ লিখিবং আমি জনমান

গুণী তুই বাজি থাক গুণী তুই বাজি থাক

তারিখ : রাত্রামাটি

৩০ জুন ২০১৪ খ্রি.

সুগত চাকমা

সাবেক পরিচালক

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট

রাত্রামাটি, বাংলাদেশ।



অভিষেক

চাকমা জাতি ও চাকমা ইতিহাস অতিপ্রাচীন হলেও, চাকমাদের লিখিত ও প্রাপ্ত ইতিহাস অতি সাম্প্রতিক কালের। চাকমাদের ইতিহাস, প্রাপ্ত কিংবদন্তি, লোকগীতি, পুরাতন ধর্মশাস্ত্র, জনশ্রুতি ও বংশ পরম্পরা শ্রুতির উপর নির্ভরশীল। তাই চাকমা ইতিহাসে অনেক ভুল-ত্রুটি, গাল-গল্প ঢুকে গেছে বলে মনে হয় এবং বহু সত্য ঘটনা বাদ পড়েছে বা চাকমারা ভুলেই গেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

(১) সুখদেব রায়কে রাজা না হয়েও চাকমা রাজা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি ছিলেন চাকমা রাজা সেরমুস্ত খাঁ (১৭৩৭-৫৮ খ্রিঃ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ও রাজ প্রতিনিধি। চাকমা রাজা সেরমুস্ত খাঁ চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চল (আলীকদম, মানিকপুর, রামু-রোয়াং) রাজত্ব করার সময় উত্তর চট্টগ্রামে সুখবিলাসে সুখদেব রায় রাজ প্রতিনিধি হয়ে তথায় রাজ্য পরিচালনা করতেন। সকলে তাকে রাজা হিসাবে সম্মান করতেন এবং রাজা বলতেন। অবশ্যই নিঃসন্তান রাজা সেরমুস্ত খাঁ সুখদেব রায়কে তাঁর উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজা সেরমুস্ত খাঁ ১৭৫৮ খ্রিঃ মৃত্যুবরণ করার আগেই হঠাৎ সুখদেব রায় ১৭৫৪ খ্রিঃ মারা যান।

(২) জলজ্যাস্ত একজন চাকমা রাজা ১৭৫৮ খ্রিঃ থেকে ১৭৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করে যান, চাকমারা ও চাকমা রাজন্যবর্গ তাকে সম্পূর্ণ ভুলে যান এবং ইতিহাসে তার নাম উল্লেখ নাই। তিনি হলেন চাকমা রাজা সের জব্বর খাঁ (১৭৫৮-১৭৬৫ খ্রিঃ)। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস সেন্সলার ডঃ আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজ উদ্দীন সাহেব Royal Asiatic Society Journal এ প্রবন্ধে চাকমা রাজাদের তালিকা প্রকাশ করেন। উক্ত তালিকায় চাকমা রাজা সের জব্বর খাঁ (১৭৫৮-১৭৬৫) এর নাম আবিষ্কৃত হয় এবং অশোক কুমার দেওয়ান এর লিখিত ইতিহাস বিচার বহি ১ম খন্ড ও ২য় খন্ড ১৯৯১ ও ১৯৯৩ সনে প্রথম চাকমা রাজা সের জব্বর খাঁ এর নাম প্রকাশ পায়।

চাকমাদের উপর লিখিত ও প্রাপ্ত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক (সুপারিন্টেন্ডেন্ট ও ডিপুটি কমিশনার) ক্যান্টেন হার্ভার্ট টমাস লুইন, তার বহি The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers therein (1869) খ্রিঃ প্রকাশ করেন। উক্ত বহিতে সর্বপ্রথম চাকমা জাতি ও চাকমাদের ইতিহাস লিখিতভাবে পাওয়া যায়। তার পরবর্তীতে বহু লেখক, বহু ইতিহাসবিদ চাকমাদের ইতিহাস লিখেন এবং লিখার চেষ্টা করেন। উহাদের মধ্যে নিম্ন কয়েকটি বহি উল্লেখযোগ্য, ঘটনাপূর্ণ এবং ইতিহাসে চাকমাদের সম্বন্ধে নতুন নতুন তথ্য সংযোজন করা হয়েছে :

- (১) The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers therein (1869)
by H T Lewin
- (২) History of Burma (1883) by Sir Arthur P. Phayree.
- (৩) চাকমা জাতি ১৯০৯, সতীশ চন্দ্র ঘোষ।
- (৪) চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস ১৯১৯ রাজা ভুবন মোহন রায়।
- (৫) শ্রীশ্রী রাজানামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস ১৯৪০, মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী)
- (৬) চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ১৯৬৯, বিরাজ মোহন দেওয়ান।
- (৭) ইতিহাস বিচার ১ম ও ২য় খণ্ড ১৯৯১, ১৯৯৩ অশোক কুমার দেওয়ান।
- (৮) চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস ১৯৯৬, বক্ষিম চন্দ্র চাকমা।
- (৯) Chakma Resistance to British Domination (1998), by S. B Qanungo
- (১০) চম্পক নগর সন্ধানে বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি ১৯৯৯, সুপ্রিয় তালুকদার।

বিগত প্রায় দেড় শতাধিক বৎসরের মধ্যে লিখিত ও প্রাপ্ত চাকমা জাতি ও চাকমাদের ইতিহাস প্রায় একই ধাচে ও রকমে লিখিত হয়েছে। বর্তমান লেখক ইহার ব্যতিক্রম। তিনি তার “চাকমা দুই রাজবংশ” বহিতে লিখার ধরন-ধারণ, মাত্রা ও পরিবেশনা নতুনভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাংলা বা ভারতে ইতিহাস অথবা ভারতীয় ইতিহাস ভালভাবে জানতে হলে প্রাচীন রাজবংশ- মৌর্য, গুপ্ত, কুষান, পাল, সেন বংশ এবং দাস, খিলজি, তোগলক ও মোঘল বংশ পাঠ করতে হবে। তবেই ঐ বংশের বা রাজ্যের বিস্তারিত তথ্যপূর্ণ সঠিক ইতিহাস জানার সুযোগ হবে। এ পর্যন্ত চাকমা ইতিহাস সেভাবে বিরচিত ও উপস্থাপিত হয়নি। এ লেখক, চাকমা ইতিহাসে সেই অভাবটা পূরণ করার চেষ্টা করেছেন। তিনি তার “চাকমা দুই রাজবংশ” বই এ চাকমাদের চাকমা জাতির দুই রাজ বংশ “মুলিমা গঝা ধাবানা গুন্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্ব কাল” এবং “ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গুন্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল” নামে দুইটি চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস ধারাবাহিকভাবে রচনা সম্পাদনা ও উপস্থাপন করেছেন। ইতিপূর্বে এভাবে কোন লেখক কোন চাকমা জাতির ইতিহাস বা চাকমা রাজার ইতিহাস রচনা করেন নাই। এমন কি শুধু বাঙালী বা বিদেশী নয়, অনেক চাকমাও জানেন না, অনুভব করেনি, কিভাবে এই চাকমা রাজারা এসেছেন, সৃষ্টি হয়েছেন বা কেহ তাদেরকে রাজা বা রাজত্ব দিয়েছেন? চাকমাদের এই রাজাগণ আছেন বলেই চাকমাদের এত নাম দাম প্রতিপত্তি, যশ-খ্যাতি। চাকমারা অনেক অতীতকে হারিয়েও এখনও টিকে আছেন মাথার গুণে। চাকমা রাজা চাকমা জাতির মাথা। বড়ুয়ারা তাদের রাজাকে হারিয়ে বাঙালী হয়ে গেছেন। আমরা “বড়ুয়া বাঙাল বলি”। এখনও চাকমাদের কেহ চাকমা বাঙাল বলেন না। চাকমাদেরকে চাকমা বলেন।

লেখক চাকমা ইতিহাস থেকে চাকমা রাজাদের খুঁজতে গিয়ে চাকমা রাজাদের, চাকমা সমাজ ও ইতিহাস থেকে বের করতে গিয়ে আমাদের হারানো অনেক পথ, অনেক তথ্য, অনেক নিশানা খুঁজে পেয়েছেন। যেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারলে হয়তো একদিন ভারতের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন মহেনজোদারো হরপ্পা যেইভাবে বের হয়েছিল, সেইভাবে আমাদের হারানো মাতৃভূমি চম্পক নগর বের হবে, উদ্ধার হবে, আবিষ্কার হবে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার মত। চাকমাদের সঠিক ইতিহাস, চাকমাদের সমৃদ্ধ ইতিহাস পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশে পাওয়া যাবে না। চাকমাদের আসল ইতিহাস আমাদের নাকের ডগায় লুকিয়ে আছে, আমরা খোঁজ করি না। আমরা জাতি হিসাবে মৃত প্রায়। এখন শুধু দাফন করাটা বা দাহ করাটা বাকী আছে। আমরা মরা দেহ বা মরদেহটা লয়ে কখনো কাঁদতেছি, কখনো হাসতেছি। আরাকান বার্মায় আমাদের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। আমাদের জাতির দেহটা রয়েছে আরাকানে। আমরা এখনো প্রাণটা নিয়ে অবয়বটা নিয়ে চলতেছি। লেখক আরাকান বার্মায় গিয়ে স্বজাতিকে আসল চাকমাদের দেখে এসেছেন। কথাবার্তা বলে এসেছেন। বুসিতং, রাসিতং, ক্যাক্ত, লিমিও, শ্রোহং (আরাকান) প্রভৃতি স্থানে আনাচে-কানাচে চাকমারা বসবাস করতেন। লেখক বহু জায়গায় আরাকানে দৈংনাক চাকমাদের সাথে চাকমা কথায় আলাপ করেছেন। দারা ত নাম কিরে? দারা ম নাম মংহলা এ্যাহি ইত্যাদি। তবু কি বিশ্বাস হয় না? যান, একবার আরাকান বার্মা ঘুরে আসেন। মান্দালায় টাউনের উত্তর পশ্চিমে “চাকমা শহর” = সেগাইন টাউন (চাক+গাইন)। আরাকানি বার্মা ভাষা জানতে হবে, সেখানকার বই, ইতিহাস, দাগ-কথা, পুরাতন ইতিহাস পড়তে হবে, দৈংনাক চাকমারা আপনার সহায়ক হবেন।

লেখক তার বই এ প্রাক-কথন অধ্যায়ে এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা, তথ্য প্রদান ও পথ নির্দেশনা দিয়েছেন। ইতিপূর্বে কোন লেখক, ইতিহাস লেখক বা আলোচক উহার সিকিভাগও আলোচনা করেনি। লেখক নিজেই ঐ ভূমি, দেশ, আরাকান, বার্মা দেখে এসেছেন। বাস্তব অবস্থা মাঠ পর্যায়ে দেখে ও পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন। সেখানে আরাকানে লক্ষাধিক দৈংনাক চাকমা রয়েছেন। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশের চাকমাদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল রয়েছেন। এখন শুধু মতবিনিময় যোগাযোগ করতে হবে। আরাকানে সীমান্তে গুনধুং ওয়াক্ষ্যং এলাকায় দৈংনাক চাকমারা নিয়মিত পথে আরাকানে যাতায়াত করেন।

লেখক কিছু হারানো তথ্য উদ্ধার করেছেন। আগে লেখকেরা বা ইতিহাসবিদরা কক্সবাজার এলাকায় রোয়াং বা রোসাঙ্গ বলে গেছেন। তারা জানতেন না মানিকপুরে (চকরিয়া) প্রধান রাজধানী, আলীকদমে ২য় রাজধানী হিসাবে চাকমা রাজা দীর্ঘ দিন রাজত্ব করে গেছেন। সুখদেব রায়কে রাজা থেকে রাজ প্রতিনিধিতে নামিয়েছেন। ফতে খাঁ ও কালো খাঁ কামান উদ্ধার করেছেন। কক্সবাজারে রাজার কুল ও চাকমা কুল

চিহ্নিত করেছেন। জনৈক রাজমনি দোভাষীর পুত্র জয়মনি দোভাষীর বংশধর সহকারী পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর রমেন্দ্র ত্রিপুরা (দোভাষী) কে চিহ্নিত ও তার বাসস্থান লক্ষীছড়ি থানায় ‘কুমারী ও চম্পাতলী’ মৌজার ঠিকানা খুঁজে পেয়েছেন। এখন তার বংশধররা হেডম্যান রূপে অধিষ্ঠিত।

লেখকের বইটি “চাকমা দুই রাজবংশ” পাঠকের কাছে বিশেষতঃ চাকমাদের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য হবে এবং বহু অজানা বিষয় জানা যাবে, সুপাঠ্য না হউক, অপাঠ্য হবে না বলে আমার বিশ্বাস। এই বলে আমার সংক্ষিপ্ত অভিমত বা মতামত সমাপ্ত করলাম।

তারিখ : চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
২৮/০৪/২০১৩ ইং

প্রফেসর বকুল চন্দ্র চাকমা
ইতিহাস বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম।



প্রকাশকের দুটি কথা

আপনারা হয়ত জানবেন না আমার অগ্রজ বাবু কুমুদ বিকাশ চাকমা (অবসরপ্রাপ্ত সমবায় পরিদর্শক) দীর্ঘকাল চাকুরী করেও চাকুরীর ফাঁকে ফাঁকে বৌদ্ধ ধর্ম ও চাকমা সমাজ ও চাকমা জাতির ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করেছেন। ইতিমধ্যে তিনি চাকমা জাতি ও চাকমা ইতিহাসের উপর বেশ কিছু বই রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু আর্থিক দৈন্যতার কারণে মাত্র দু-একটি লেখা প্রকাশ করতে পেরেছেন। বর্তমানে তার অনেকগুলি লেখা পান্ডুলিপি আকারে রয়ে গেছে। দাদা অনেক সময় তার লেখা পান্ডুলিপিগুলির বিষয়ে আমার সাথে আলোচনা করেছেন এবং কিছু পান্ডুলিপি আমাকে পড়ার জন্য দিয়েছেন। আমি নিজেও চাকমা জাতির ইতিহাস নিয়ে পড়াশুনা করে থাকি। আমি দেখলাম দাদার লেখা পান্ডুলিপির মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। এসবের ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনা করে এর মধ্য থেকে কয়েকটি বই প্রকাশের জন্য দাদার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করতে দাদা সানন্দে রাজী হয়ে গেলেন।

আমি জানি দাদার বর্তমান আর্থিক অবস্থায় এ সব গ্রন্থ ও বই প্রকাশনায় সামর্থ্য তাঁর নেই। আমি দাদার ইচ্ছানুযায়ী তার লেখা চাকমা জাতির ইতিহাস ভিত্তিক বই “চাকমা দুই রাজবংশ” (ধাবানা ও ওয়াংঝা রাজবংশ) বইটি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলাম। বইটিতে ষোড়শ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় পৌনে চারশত বছরের চাকমা রাজাগণের ও চাকমা সমাজের অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। এই সময়ে চাকমা দুই গঝার রাজাগণ রাজত্ব করেন। মুলিমা গঝার ধাবানা গুন্তির (গোষ্ঠী) চাকমা রাজাদের রাজত্ব কাল ও ওয়াংঝা গঝার কালা কাঙারা গুন্তি (গোষ্ঠী) রাজত্ব কাল ধারাবাহিক ভাবে বর্ণনা আছে। বই এর ভূমিকায় চাকমাদের মধ্যযুগীয় ইতিহাসের কিছু বর্ণনা আছে। ঐ সময়ে চাকমারা আরাকানে (সাপ্রাইকুলে) বসবাস করতেন। এখনো তাদের একটা অংশ দৈনাক (Daingnet) নামে বসবাস করেন। বর্তমানে তাদের সংখ্যা প্রায় ০১ লাখের কাছাকাছি। এরা মূলতঃ আরাকানের লেমিও (Lemeo) নদীর পাড়ে আরাকানের পুরাতন রাজধানী ম্রাকউ বা ম্রোহং অঞ্চলে এবং কিছু অংশ বাংলাদেশ পার্শ্ববর্তী বুজিদং ও মংদু এলাকায় বসবাস করেন। কিছু দৈনাক ভারত মিয়ানমার সীমান্ত Chin State এর পেলাওয়া (Paletwa) অঞ্চলে বসবাস করেন। তারা বার্মিজ সংস্কৃতি ও ভাষার আধিপত্যের মাঝেও নিজ স্বাভাব্য নিয়ে টিকে আছেন। আরাকানী/বার্মিজরা তাদেরকে দৈনাক বললেও তারা নিজেদেরকে চাকমা হিসেবে পরিচয় দেন। বর্তমানে চাকমাদের ভাষা বাংলা ভাষার প্রভাবে শতকরা ৭০/৮০% ভাগ বাংলা শব্দে ভরা। তঞ্চঙ্গ্যাদের ভাষায় হয়ত বাংলা শব্দ কিছুটা কম। আসলে দৈনাক, তঞ্চঙ্গ্যা ও চাকমা এককালে এক জাতিই ছিলেন। কালের প্রভাবে

সময়ের বিবর্তনে এবং বিভিন্ন ভূ-রাজনীতির প্রভাবে চাকমাদের ভাষায় শব্দে ও উচ্চারণে কিছুটা পার্থক্য এসে গেছে। আমি নিশ্চিত যে এরা একই জাতির বিভিন্ন অংশ মাত্র। এখনও ভাল দিক হল আমরা একে অন্যের ভাষা বুঝতে পারি (Intercommunicable) চাকমারা এখন বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমারে বসবাস করেন। ভারতে মূলতঃ ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরাম ও অরুনাচল প্রদেশে থাকেন। ইতিমধ্যে কিছু চাকমা যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসী হয়ে চলে গেছেন। তারা ভবিষ্যতে ইংরেজী ভাষাভাষি এবং ফ্রান্স ভাষাভাষি চাকমা হিসাবে পরিচিত হবেন। তাদের দ্বিতীয় প্রজন্মের ছেলে মেয়েরা প্রায় চাকমা ভাষা বলতে পারেনা। তৃতীয় প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা চাকমা ভাষা বলা এবং বুঝা কঠিন হবে। অভিবাসী চাকমাদের জন্য এটি একটি আগাম সতর্ক বার্তা।

এ যাবৎ চাকমা জাতির উপর যে সকল ইতিহাস লিখা হয়েছে তার মধ্যে অনেক অসংগতি তথ্য দেখা যায়, যেমন চম্পক নগর থেকে আরাকান অভিযানে যাওয়া এবং পরে উত্তর ব্রহ্ম রাজ্য স্থাপন করা এবং পরে আরাকান রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আবার চট্টগ্রামে ফিরে আসা ইত্যাদি। তারপর চাকমাদের পূর্ব পুরুষগণ কি সাক্য ছিলেন না শান-খেমর ছিলেন? এ সম্পর্কে গবেষণা করার যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি। সাম্প্রতিক আমার আরাকান ও মান্দালয় ভ্রমণের পর উত্তর ব্রহ্ম চাকমা রাজ্য স্থাপন তত্ত্ব নিতান্ত কল্পনা প্রসূত বলে প্রতীয়মান হয়। উত্তর আরাকানে চাকমাদের একাংশ দৈনাংক নামে এখনো বসবাস করে। ৬ থেকে ১০ হাজার ফুট উচ্চতা আরাকান পর্বত শ্রেণীর উত্তর পাশে সেগাইন ও মান্দালয় অঞ্চলে আজো কোন চাকমা বা তার সমগোত্রীয় লোকের দেখা মেলেনি। পরবর্তীতে আমার লেখা বই এ সম্পর্কে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছা পোষন করি।

চাকমা জাতির ইতিহাস আমার নিজের একটি অতি পছন্দের বিষয়। আমি এ বিষয়ে এখনো পড়াশুনা করছি। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আমার লেখা একটি বই প্রকাশের ইচ্ছা আছে। চেষ্টা করে দেখবো মহাকালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া চাকমা জাতির ইতিহাস থেকে মূল চম্পক নগর এবং চাকমাদের মূল রক্তের শিকড় (Roots) খুঁজে পাওয়া যায় কিনা?

পরিশেষে আমি আশা করি পাঠকগণ বইটি পড়ে চাকমা জাতির হারিয়ে যাওয়া অতীত সম্পর্কে আরো জানার আগ্রহ সৃষ্টি করবে। বইটি প্রকাশনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেয়ার জন্য আমি দাদার কাছে কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ কামনা করি।

ইতি,

লেঃ কর্নেল (অবঃ) পরিমল বিকাশ চাকমা

পিএসসি

তারিখ : রাঙ্গামাটি।

১০/০২/২০১৪ ইং

ইউএনডিপি'র নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ

খাদ্য গুদাম এলাকা, তবলছড়ি, রাঙ্গামাটি।

ভূমিকা

ছাত্রজীবন থেকে ইতিহাস পাঠের উপর আমার স্পৃহা ছিল প্রবল। ইতিহাস নিয়ে আমার উচ্চ শিক্ষা করার বাসনা ছিল। আর্থিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিকতার কারণে আমার সে ইতিহাস নিয়ে উচ্চ শিক্ষার বাসনার স্রোত মরুপথে হারিয়ে যায়। আমার শিক্ষা জীবন মহাবিদ্যালয়ের দ্বার-প্রান্তে গিয়ে অসমাপ্ত ও অতৃপ্ত অবস্থায় আমাকে জীবন সংগ্রামে টেনে নিয়ে যায়। জীবন জীবিকার কারণে ষাট দশকের প্রথমার্ধে (১৯৬১ ইং সনে) সরকারী চাকুরীতে ঢুকে পড়ি নব্বই দশকের শেষ প্রান্তে এসে সেই গতি, কর্মময় জীবন শেষ হয়ে যায়; অবসর গ্রহণ করি ১৯৯৭ ইং সনে।

কর্ম জীবনের বাস্তবতার মধ্যে আমার ইতিহাসের স্বপ্ন ঘুমন্ত অবস্থায় পড়ে রইল। তবু আমি ইতিহাসের বই পেলে পড়ে দেখতাম এবং বিশেষতঃ চাকমাদের ইতিহাস বই ক্রয় করে সংরক্ষণের চেষ্টা করি। কালে ইহা আমার কাজে আসতে পারে। ভারতীয় ইতিহাস দুইটা বিতর্কিত ঘটনা ও চাকমাদের প্রচলিত প্রবাদ একটা ঘটনা আমাকে সমাধানের জন্য খুবই উৎসুক করে তুলে। ভারতীয় ইতিহাসের ঘটনা হল (১) সম্রাট আলাউদ্দীনের সাথে চিতোরের রানা রতন সিং এর স্ত্রী পদ্মাবতী/পদ্মিনীর প্রেম (২) মেহেরুনেছা বা নূর জাহানের সাথে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীর এর বাল্যপ্রেম এবং (৩) চাকমা রাজা ধাবানার পুত্র ধরম্যার সাথে মোগল রমণী (শাহ সূজার মেয়ে) পাণি গ্রহণ, কলেজ ছাত্র জীবনে উপরোক্ত ১ম ও ২য় বিষয়াবলীর সমাধান পেয়ে যাই কিন্তু ৩য় বিষয়টি দীর্ঘদিন প্রায় সারাটা জীবন বিতর্কিত থেকে যায়। আমার খুবই আত্মতৃপ্তি এত দিনের আমার লালিত বিতর্কিত বিষয়টি আমার প্রায় ৬৯/৭০ বৎসরের শেষ প্রান্তে এসে। “মুলিমা গবা ধাবানা গুণ্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল” বইটা সম্পাদনা, সংকলন ও গবেষণা করতে গিয়ে “History of Burma by Arthur Phayree (1883) কর্তৃক লিখিত বইটা আমার একান্ত স্নেহভাজন সুহৃদ শ্রীমান শান্তি কুমার চাকমা বিসিএস (শিক্ষা) ও প্রভাষক, রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ মহোদয় থেকে পড়ার সুযোগ ও পাঠ করে আমার ঐ বিতর্কিত বিষয় যাহা সমাধান পেয়ে যাই। ধাবানার ছেলে ধরম্যা বাংলার সুবাদার শাহ সূজার মেয়েকে বিবাহ করেননি; অন্য কোন মোগল রমণীর পাণি গ্রহণ করেছেন। শাহ সূজা পরিবার সহ ৩ (তিন) মেয়ে নিয়ে ঢাকা থেকে পলায়নের পথে আরাকানে গিয়ে পৌঁছেন। চরম এক দুর্যোগে পড়ে শাহ সূজা পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ৩ মেয়ে সহ সেখানেই নিহত হন। সুতরাং চাকমা রাজার ছেলের আর তাদেরকে বিবাহ করার অবকাশ নেই। (অত্র বই এর ধাবানা ও ধরম্যা অধ্যায় বিস্তারিত দেখুন)।

চাকমাদের জাতীয় ইতিহাস খুবই বিস্তৃত ও রহস্যে ভরপুর এবং দুর্গম প্রান্তরে নিমজ্জিত। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে সেই মহাকাব্যে হাত দেওয়া সমীচীন নয় বিধায় ভবিষ্যত প্রজন্মকে সেই রহস্যময় ইতিহাস উদ্ধার করার দায়িত্ব ও অনুরোধ জানিয়ে আমি চাকমা ইতিহাসের খণ্ডাংশ দুই খণ্ডে ভাগ করে (১) চাকমা রাজ পরিবার

“ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গুত্তি চাকমা রাজা ও রাজতুকাল” এবং “মুলিমা গঝা ধাবানা গুত্তি চাকমা রাজা ও রাজতুকাল” নাম দিয়ে পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও সংযোজিত করে নতুন আকারে সম্পাদনা ও সংকলন করে পাঠক সমাজের কাছে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি জুম-ভূমিতে রান্যা কাবার সময় ‘দাঙর বেদাগী দুবয়’ (বেতের গুচ্ছ) বেত সংগ্রহের মত (বেদাগী আগা) আগা থেকে পিছন দিকে যতদূর সম্ভব কাটা ও সংগ্রহ করা যায় সেইভাবে চাকমা ইতিহাস রাস্তামাটি থেকে টেকনাফ নদীর পাড়, বার্মা আরাকান সীমান্ত, ২০০০ খৃষ্টাব্দ সন থেকে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এতে টেনে আনার চেষ্টা করেছি। এতে কতদূর সাফল্যমণ্ডিত কিংবা ব্যর্থতায় পর্যাবসিত হয়েছে, তাহা সুধী সমাজ ও পাঠকবর্গের কাছে বিচারের ভার রইল।

পরিশেষে এই বইয়ের শুভেচ্ছা বাণী দেওয়ার জন্য চাকমা রাজা ব্যারিষ্টার দেবশীষ রায়কে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে বাবু সুগত চাকমা, সাবেক পরিচালক উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনষ্টিটিউট ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক বাবু বকুল চন্দ্র চাকমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি বইটিতে তাদের অভিমত দেওয়ার জন্য। সর্বশেষ আমার অনুজ লেঃ কর্ণেল (অব:) পরিমলকে বইটি প্রকাশনার জন্য অনেক ধন্যবাদ ও আশীর্বাদ। সে মুক্ত মনে স্বইচ্ছায় বইটি প্রকাশনার জন্য এগিয়ে না আসলে হয়তো আমার পক্ষে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না।

এই সংকলন করতে গিয়ে যাদের বহি, প্রবন্ধ ও রচনা পাঠ করেছি, তাদের প্রতি একান্ত কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার অজ্ঞানতা, অজ্ঞতা, অসমর্থতা ও অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটির জন্য ক্ষমা চেয়ে আমার নীতিদীর্ঘ বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে নিলাম।

তারিখ : রাস্তামাটি,
৮ই মে ২০০৫ ইং।

ইতি,
ভবদীয়
গ্রন্থকার
কুমুদ বিকাশ চাকমা

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা
১.	বাংলা ভূমিতে চাকমা রাজাদের নাম ও রাজত্বকাল প্রথম অধ্যায়	ক - ঘ
২.	চাকমাদের ইতিবৃত্তের “প্রাক-কথন” দ্বিতীয় অধ্যায়	১ - ৩০
৩.	চাকমাদের বার্মা-আরাকান ত্যাগের পটভূমি তৃতীয় অধ্যায়	৩১ - ৩৮
৪.	চাকমাদের বঙ্গভূমিতে আগমন ও রাজত্বকাল	৩৯ - ৪০
৫.	রাজা খৈন সুরেশ্বরী	৪১ - ৪৩
৬.	রাজা জন্ম (২য়)	৪৪ - ৪৮
৭.	রাজা সান্তয়া (সাথোয়াই) পাগলা রাজা চতুর্থ অধ্যায়	৪৯ - ৫০
৮.	রাজা ধাবানা	৫১ - ৫২
৯.	মুলিমা গঝা ধাবানা শুভি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল	৫৩ - ৫৪
১০.	রাজা ধরম্যা	৫৫
১১.	রাজা সুভল খাঁ	৫৬ - ৫৭
১২.	রাজা জালাল খাঁ	৫৮
১৩.	রাজা ফতে খাঁ	৫৯
১৪.	রাজা সেরমুস্ত খাঁ	৬০ - ৬১
১৫.	চট্টগ্রাম বিজয়ের পর মোগল ফৌজদার (শাসনকর্তা) এর নাম	৬২
১৬.	রাজা সের জব্বর খাঁ	৬৩ - ৬৪
১৭.	রাজা সের দৌলত খাঁ	৬৫ - ৬৯
১৮.	রাজা জান বক্স খাঁ	৭০ - ৭৫
১৯.	রাজা টক্সর খাঁ	৭৬ - ৭৯
২০.	রাজা জব্বর খাঁ	৮০
২১.	রাজা ধরম বক্স খাঁ	৮১ - ৮৯

(ক)

বাংলার ভূমিতে চাকমা রাজাদের নাম ও রাজত্বকাল

ক্রঃনং	রাজাদের নাম	পূর্ববর্তী রাজার সহিত সম্পর্ক	আনুমানিক রাজত্বকাল	রাজধানী	মন্তব্য
১.	রাজা মানেকগিরি (মারেক্যা) মগেরা বলেন মারেকাস (নিঃসন্তান)	পুত্র	১৪১৮/১৯ - ১৪৩৩/৩৪ খ্রিঃ	আলীকদম/ মানিকপুর (রোয়াং)	রাজা রাম তংছা এর ৩ পুত্র (১) জ্যেষ্ঠ- মানিক গিরি (২) ২য় - কামেক গিরি আসার পথে বুদ্ধে হত (৩) ৩য়- রদংসা বাংলার মাটিতে মগের আক্রমণে হত।
২.	রাজা খৈন সুরেশ্বরী	মন্ত্রী	১৪৩৪ - ১৫১৫ খ্রিঃ	আলীকদম/ মানিকপুর (রোয়াং)	প্রথম জীবনে মন্ত্রী। রাজ পরিবারে কেহ না থাকায় সিংহাসনে আরোহন। বাংলার নবাব থেকে “রাজা” খেতাব লাভ।
৩.	রাজা জুনা (২য়) রাখাইনরা বলেন (চনুই)	পুত্র	১৫১৬ - ১৫৯৯ খ্রিঃ	আলীকদম/ মানিকপুর/ রামু	রাজার ২ কন্যা। (১) রাজেশ্বরী সাথে মগ রাজার বিয়ে হয়। (২) রাজেশ্বরী সাথে বুড়া বরবুয়ার (ভুতুস্যা) বিয়ে হয়। সেনাপতি।
৪.	রাজা বুড়া বরবুয়া (ভুতুস্যা)	জামাতা	১৫৯৯ - ১৬০১ খ্রিঃ	ঐ	রাজার মৃত্যুর পর জামাই বুড়া বরবুয়া সিংহাসন লাভ করেন এবং স্বল্পকাল রাজত্ব করেন।
৫.	রাজা সান্তয়া (সাখোয়াই) পাগলা রাজা	পুত্র	১৬০১ - ১৬২৪ খ্রিঃ	ঐ	রাজকন্যা রাজেশ্বরী গর্ভে বুড়া বরবুয়ার ঔরসে সান্তয়া দৌহিত্র সূত্রে রাজ্য লাভ করেন।
৬.	রাণী কাটুয়া রাণী (পাগলা রাজার স্ত্রী)	স্ত্রী/রাণী	১৬২৫ - ১৬৩৯/৪০ খ্রিঃ	ঐ	পাগলা রাজার মৃত্যুর পর দেশে বিরাট অরাজকতা সৃষ্টি হয়। পরিশেষে প্রজা ও অমাত্যবর্গ রাণীকে রাজ্যভার অর্পণ করেন।
৭.	রাজা ধাবানা (মুলিমা গঝা ধাবানা গুতি ১ম রাজা)	নাতি ও দৌহিত্র	১৬৪০ - ১৬৬০ খ্রিঃ	ঐ	মুলিমা গঝা রাজবংশ আরম্ভ
৮.	রাজা ধরম্যা	পুত্র	১৬৬০ - ১৬৮৩/৮৪ খ্রিঃ	ঐ	জনশ্রুতি রাজা ধরম্যা কোন এক সম্ভ্রান্ত যোগল কন্যা বিবাহ করেন।

(খ)

ক্রঃনং	রাজাদের নাম	পূর্ববর্তী রাজার সহিত সম্পর্ক	আনুমানিক রাজত্বকাল	রাজধানী	মন্তব্য
৯.	রাজা মোগল্যা	পুত্র	১৬৮৪ - ১৭১২ খ্রিঃ	আলীকদম/ মানিকপুর/ রামু	মোগল কন্যার গর্ভে জন্ম বিধায় তার নাম মোগল্যা রাখা হয়। ৩ পুত্র (১) সুভল খাঁ বা যুবল খাঁ (২) জালাল খাঁ (৩) ফতে খাঁ
১০.	রাজা সুভল খাঁ	পুত্র	১৭১৩ - ১৭১৪ খ্রিঃ	ঐ	উত্তর চট্টগ্রামে সুখ-বিলাসে ৩য় রাজধানী স্থাপন (খামার)
১১.	রাজা জালাল খাঁ	ভাই	১৭১৪ - ১৭২৫ খ্রিঃ	ঐ	জালাল খাঁ এর ১ ছেলে সের জব্বর খাঁ।
১২.	রাজা ফতে খাঁ ৩ পুত্র (১) সের্জন খাঁ (২) সের মুস্তা খাঁ (৩) ওর মুস্তা খাঁ	ভাই	১৭২৫ - ১৭৩৫ খ্রিঃ	ঐ	রোয়াং (মানিকপুর) থেকে সুখ বিলাস রাজধানী স্থানান্তর ও রাজধানী খামার রাজধানী স্থাপন।
১৩.	রাজা সের্জন খাঁ	পুত্র	১৭৩৫ - ১৭৩৭ খ্রিঃ	সুখ বিলাস/রাজা নগর	তিনি স্বল্পকাল রাজত্ব করার পর মৃত্যুবরণ করেন।
১৪.	রাজা সেরমুস্তা খাঁ	ভাই	১৭৩৭ - ১৭৫৮ খ্রিঃ	ঐ	(১) তিনি রাঙ্গামাটিতে খামার রাজধানী স্থাপন করেন। (২) রাজা নিঃসন্তান ছিলেন। ভাতুম্পুত্র সুখদেব রায় কে (ওরমুস্তা খাঁ এর পুত্র) দস্তক পালন ও উপ রাজ নির্বাচন করে সুখ দেব রায় সুখবিলাস ও সিলক জমিদারী পরিচালনা করেন। দুর্ভাগ্য রাজার মৃত্যুর আগে সুখ দেব রায় মারা যান ১৭৫৪ খ্রিঃ নরুন্না খাঁ সীং সের জব্বর খাঁ এ জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করেন।

(গ)

ক্রঃনং	রাজাদের নাম	পূর্ববর্তী রাজার সহিত সম্পর্ক	আনুমানিক রাজত্বকাল	রাজধানী	মন্তব্য
১৫.	রাজা সের জক্বর খাঁ	রাজা ফতে খাঁ এর বড় ভাই জালাল খাঁ এর পুত্র	১৭৫৮ - ১৭৬৫ খ্রিঃ	সুখ বিলাস/রাজা নগর/খামার রাজাধানী রাঙ্গামাটি।	রাজা জালাল খাঁ এর ছেলে।
১৬.	রাজা সের দৌলত খাঁ	পুত্র	১৭৬৫ - ১৭৮২ খ্রিঃ	ঐ	(১) ১৭৭২ খ্রিঃ থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী (বৃটিশ বাহিনী) এর সাথে মত বিরোধ দেখা দেয়। (২) ১৭৭৭ ও ১৭৮০ খ্রিঃ বৃটিশ বাহিনী শোষণীয় ভাবে পরাজিত হয়ে পশ্চাৎ অপসারণ করতে বাধ্য হয়।
১৭.	রাজা জ্ঞান বক্স খাঁ	পুত্র	১৭৮২ - ১৭৯৮ খ্রিঃ	রাজধানী- সুখবিলাস/ রাজা নগর/ রাঙ্গামাটি।	রাজার ৪ পুত্র (১) টক্কর খাঁ (২) জক্বর খাঁ (৩) দোল-পেটা (৪) ছলা জক্বর তার রাজত্বকাল ১৭৮৫খ্রিঃ বৃটিশের সাথে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রামমনি দোভাষীর পুত্র জয়মনি দোভাষী ষড়যন্ত্র করায় চাকমা রাজা যুদ্ধ না করে আত্মগোপন করতে বাধ্য হন।
১৮.	রাজা টক্কর খাঁ	পুত্র	১৭৯৮ - ১৮০১ খ্রিঃ	ঐ	তিনি স্বল্পকাল রাজত্ব করেন।
১৯.	রাজা জক্বর খাঁ	ঐ ভাই	১৮০১ - ১৮১১ খ্রিঃ	ঐ	তার আমল থেকে বৃটিশের সাথে বিরোধ কমে যায়, কোন যুদ্ধ হয়নি।

(ঘ)

ক্রঃনং	রাজাদের নাম	পূর্ববর্তী রাজার সহিত সম্পর্ক	আনুমানিক রাজত্বকাল	রাজধানী	মন্তব্য
২০.	রাজা ধরম বক্স খাঁ	পুত্র	১৮১২ - ১৮৩২ খ্রিঃ	সুখ বিলাস/ রাজা নগর/ রাস্কামাটি।	তার ৩ রানী (১) কালিন্দী রানী (২) আটকবি (৩) হারিবি রাজার মৃত্যুর পর বড় রানী কালিন্দী রানী শাসনভার গ্রহণ করেন যদিও বৃটিশ সরকার কালিন্দী রানীকে ১৮৪৪ খ্রিঃ তেই রাজ্যভার অর্পণ করেন। তিনি ১৮৭৩ খ্রিঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।
২১.	রানী কালিন্দী রানী	রাজার স্ত্রী বা রানী	১৮৪৪ - ১৮৭৩ খ্রিঃ	রাজা নগর ও রাস্কামাটি।	রাজধানী- রাজানগর ও রাস্কামাটি
২২.	রাজা হরিশ্চন্দ্র রায় বাহদুর	নাতি	১৮৭৩ - ১৮৮৫ খ্রিঃ	ঐ	ধরম বক্স খাঁ এর কন্যা ঘরের নাতি দৌহিত্র
২৩.	রাজা ভুবন মোহন রায়	পুত্র	১৮৯৭ - ১৯৩৪ খ্রিঃ	ঐ	রাজধানী রাস্কামাটি
২৪.	রাজা নলিনাক্ষ রায়	পুত্র	১৯৩৫ - ১৯৫১ খ্রিঃ	ঐ	ঐ
২৫.	রাজা ত্রিদিব রায়	পুত্র	১৯৫৩ - ১৯৭১ খ্রিঃ	ঐ	ঐ
২৬.	রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়	পুত্র	১৯৭৭ অদ্যাবধি	ঐ	ঐ

চাকমা দুই রাজবংশ

(মুলিমা গব্বা ধাবানা গুন্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল)

প্রথম অধ্যায়

চাকমাদের ইতিবৃত্তের “প্রাক-কথন”

চাকমাদের ইতিহাস উদ্ধার করতে গেলে চাকমাদের ইতিহাসকে ৩ (তিন) ভাগে বিভক্ত করতে হবে :-

- (১) চাকমাদের অতীত ইতিহাস (বিজয়গিরি রাজার চম্পকনগর থেকে রোসাঙ্গ বা আরাকান সাপ্রাইকুল বিজয় পূর্ব ইতিহাস)।
- (২) চাকমাদের বার্মা আরাকানের ইতিহাস (বিজয়গিরি রাজার রাজত্বকাল থেকে মইস্যাং রাজার রাজত্বকাল ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)।
- (৩) বাংলার ভূমিতে চাকমাদের ইতিহাস (১৪১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত)

পৃথিবীর মানচিত্রে ‘চম্পকনগর’ যেখানেই হউক না কেন, বিজয়গিরি রাজা চম্পকনগর থেকেই বিজয় অভিযান চালিয়ে রোসাঙ্গ দেশ আরাকান জয় করে সাপ্রাইকুলে নতুন চাকমা রাষ্ট্র পত্তন করেন এবং পরবর্তীতে চাকমারা বার্মা-আরাকানে বিভিন্ন অঞ্চলে সরিয়ে পড়েন। অতীতের সেই বার্মা-আরাকান থেকেই চাকমারা বাংলার ভূমিতে প্রবেশ করেন, ইহা ইতিহাস স্বীকৃত। সুতরাং, চাকমাদের বার্মা-আরাকানের অবস্থানের ইতিহাসই জাতির জন্য সবচেয়ে মূল্যবান সময়। এই যুগেই জাতির নামের খোলসের উপর চাকমা নামটার উদ্ভব ও পরিচিতি হয়। চাকমাদের অতীত নামের উপর উচ্চারণের বিভ্রাট ও অপভ্রংশ হয়ে চাক/সাক/থেক্ হয়ে চংসা/চাংসা/চাকমার পরিণতি ও পরিচয়। এভাবে শুধু অতীতকে হারান নয়। অতীত/আদি জনাভূমিও হারান গিয়েছে। আদি আবাস ভূমি চম্পকনগরকেও চাকমারা হারিয়ে ফেলেন ইতিহাসের লুকোচুরিতে। বার্মা-আরাকান যুগেই চাকমারা উন্নতির শিখরে উঠে এবং পরে পতনের শেষ পর্যায়ে নেমে আসেন। একটা ঘটনাই একটা জাতির ভাগ্য উত্থান-পতন নির্ধারিত হয়ে যায়। ভারতের “পানিপথ যুদ্ধ” ভারতের ইতিহাস সম্পূর্ণ বদলিয়ে দেয়। “টুরস যুদ্ধে” মুসলমানেরা বিজয়ী হলে সমগ্র ইউরোপের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাস পরিবর্তন হয়ে যেতো। “ওয়াটারলু যুদ্ধে” নেপোলিয়ান জয় করলে ইউরোপ রাজতন্ত্রের আয়ু আরো দীর্ঘায়িত হতো। সেইরূপ বিজয়গিরি রাজা “খ্যাং যুদ্ধে” বিজয়ী হওয়ায় চাকমারা বার্মা-আরাকানে বিরাট ভূ-খন্ড প্রায় ৫০০ (পাঁচ শতাধিক) বৎসর শাসন করেছিলেন। রাজা অরুণ যুগের পতনের প্রেক্ষিতে চাকমারা চিরতরে জাতির ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও রাজ্য হারিয়ে ফেলেন। চাকমাদের উর্বর ইতিহাস বার্মা-আরাকানেই রয়েছে। বার্মা-আরাকানের ইতিহাস মন্থন করতে পারলে চাকমাদের সম্পূর্ণ ইতিহাস বের হয়ে আসবে। শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাধেরো (যিনি বার্মায় প্রায় ১০/১১ বৎসর ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন) মহোদয় বলেছেন যে, বার্মায় স্কুল পাঠ্যক্রমে ইতিহাস বিভাগে চাকমাদের ইতিহাস

বাদ দিয়া ইতিহাস পড়ানো যায় না। উচ্চ পর্যায়ে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ্য পুস্তকে চাকমাদের ইতিহাস রয়েছে। তাহা ছাড়াও আরাকানের ইতিহাসে দেঙ্গাওয়াদি আরেদফুং, রাজাওয়াং, ক্যাক রাখাইন রাজা ওয়াং প্রভৃতি বহিতে চাকমাদের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণনা রয়েছে। এসব আমাদের সকলই শ্রুতি। আমরা নিজেরা কেহ সেই সব বহি কোন দিন দেখিনি, পড়িনি বা তা সংশ্লিষ্ট বিষয় জানি না। আমাদের চাকমা ইতিহাস লেখকেরা শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে লিখে গেছেন এবং এখনও সেই ভাবে লিখে উপস্থাপন করতেছেন। তারা সঠিক ইতিহাস কমই উদ্ঘাটন করতে পেরেছেন। বার্মা আরাকানে চাকমাদের ইতিহাসের ক্ষেত্র উজ্জ্বল ও উর্বর হলেও আমি তাতে হাত দিচ্ছি না। তাহা প্রজন্ম লেখক ও গবেষকদের হাতে দিয়ে যাচ্ছি। শুধু বঙ্গভূমিতে এসে চাকমাদের যেই ইতিহাস সৃষ্টি উদ্ধার ও রচিত হয়েছে তাহা আলোচনা ও বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি (১৪১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দী ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত)। তার সঙ্গে শুধু চাকমাদের বার্মা আরাকান ত্যাগের পটভূমিটা যোগ করেছি। ইহার মধ্যেও অনেক অঘটন ঘটেছে যাহা এখনও সংশয় কাটেনি। ইতিমধ্যে মৃত রাজা বা রাজপুত্রকে জীবন্ত করা হয়েছে। নিঃসন্তান রাজাকে পুত্র দান করা হয়েছে। পুত্র পিতাকে চিনেন না। জীবন্ত রাজাকে কবর দেওয়া (বাদ দেওয়া) হয়েছে। রানীর নামে কলংক লেপন করা হয়েছে আঠার মাস্যা পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার জন্য রানীকে মগের ঘরে চাকরানী কাজ করতে দেখা গেছে। রাজার 'খেতাব' বা উপাধিকে নতুন একজন রাজা রূপে চিত্রিত করা হয়েছে সবই কল্পনা, ইতিহাস নয়। এভাবে চাকমা ইতিহাসে অনেক আবর্জনা ঢুকানো হয়েছে। যাহা পরিষ্কার করতে হবে।

চাকমাদের অতীতের ইতিবৃত্ত সম্পূর্ণ উদ্ধার না হলেও বেশ কয়েকজন বিদেশী ও স্বদেশী ইতিহাসবিদদের চোখে চাকমারা ভারতের সুলতানী আমলে পাঠান সৈন্যের মগ রমণীর গর্ভে চাকমাদের জন্ম, চট্টগ্রামে আগত আরব বনিকদের ঔরসে চাকমাদের জন্ম, মগ রাজার দাসদের সন্তান-সন্ততি চাকমারা কেহ কেহ চাকমাদের মালয় থেকে, কেহ শ্যাম (থাইল্যান্ড) থেকে কেহ বা কম্বোডিয়া থেকে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। এভাবে চাকমাদের প্রকৃত ইতিহাস না জেনে বিভ্রান্তিকর মন্তব্য করে চাকমাদের ইতিহাসকে আরো ঘোলাটে ও রহস্যময় করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। পরবর্তীতে ইহার আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হবে।

১৮৬৯ ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক ক্যাপ্টেন টি, এইচ, লুইন সর্ব প্রথম চাকমাদের নিয়ে ইতিহাস লিখা আরম্ভ করেন এবং এখনও এই লিখার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে দেশী-বিদেশী অনেক লেখক ইতিহাসবিদ বা গবেষক চাকমাদের নিয়ে লিখলেও নিম্ন লেখকগণের লিখা ইতিহাস, তথ্য ও গবেষণা চাকমাদের ইতিহাস অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে বলে মনে হয়। যদিও তারা এখনও বিজয়গিরি রাজার আদি বাসস্থান চম্পকনগরের হৃদিস দিতে পারেন নি, তবে মোনতলা বা কাছাকাছি পৌঁছেছেন বলে মনে হয় :

- ১। The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein 1869 by Captain T. H. Lewin.
- ২। চাকমা জাতি ১৯০৯ সতীশ চন্দ্র ঘোষ।
- ৩। চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস ১৯১৯ রাজা ভুবন মোহন রায়।
- ৪। শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস ১৯৪০, মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী)।
- ৫। পার্বত্য রাজ লহরী ১৯৬২ নোয়ারাম চাকমা।
- ৬। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ১৯৬৯ বিরাজ মোহন দেওয়ান।
- ৭। চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস ১৯৮১ (রচনা ১৯৬১-৬২) প্রাণহরি তালুকদার।
- ৮। চাকমা পরিচিতি ১৯৮৩ সুগত চাকমা।
- ৯। চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ১ম খন্ড ১৯৯১, ২য় খন্ড ১৯৯৩ আশোক কুমার দেওয়ান।
- ১০। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি ১৯৯৪ সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।
- ১১। চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস ১৯৯৬ বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা।
- ১২। চম্পকনগর সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি ১৯৯৯ সুপ্রিয় তালুকদার।

পূর্ববর্তী লেখক বা ইতিহাসবিদদের দোষ ধরা বা সমালোচনা করা আমার প্রয়াস নয়। শুধু আমার দৃষ্টিতে প্রতিভাত অসংগতিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে পরবর্তী প্রজন্মের লেখক বা ইতিহাসবিদদের সুবিধার্থে অসংগতি বা ভুলের দ্বার উদ্ঘাটনের জন্য আমার আলোচনা ও বিশ্লেষণ। প্রায় সকল চাকমা ইতিহাসবিদরা তাদের রচনায় ইতিহাসের উপাত্ত, তথ্য ও উপাদানগুলির অভাব যথেষ্ট অনুভব করেছে। উপরোক্ত ১২ (বার) জন লেখক ও ইতিহাসবিদ কেহ বার্মা আরাকান যাননি। শুধু ক্যান্টেন লুইন একবার আরাকানের কলাডাইন নদীর উজানে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাধা পেয়ে ফিরে আসেন বলে জানা যায়। তারা সকলেই প্রায় শ্রুতির উপর নির্ভর করে চাকমাদের ইতিহাস রচনা করেছেন। ইহাদের মধ্যে সতীশ চন্দ্র ঘোষের “চাকমা জাতি ১৯০৯ ইং”, বিরাজ মোহন দেওয়ানের “চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ১৯৬৯ ইং” ও প্রাণহরি তালুকদার এর “চাকমা জাতি ও চাকমা রাজবংশের ইতিহাস ১৯৮১ ইং” (রচনা ১৯৬১-৬২ ইং) এই তিনটি বহিতে চাকমা জাতির ইতিহাস রচনা ও উদ্ধারে যথেষ্ট মৌলিকত্বের অবদান রয়েছে। অবশিষ্ট বহিগুলি এই তিনটি বহির যথেষ্ট প্রতিচ্ছবি বলা যায়। অবশ্য তারাও কিছু কিছু নতুন তথ্য উদ্ঘাটন ও সংযোজন করেছেন বৈকি। সতীশ চন্দ্র ঘোষ থেকে অতি আধুনিক কালের লেখকেরা কেহ বার্মা আরাকান যাননি বা ভ্রমণ করেননি। শুধু ঘরে বসেই বা রাস্তামাটিতে বসেই শুধু শ্রুতি অনুমান ও কয়েকটা গোলাগুলির আওয়াজ করেই যুদ্ধ শেষ করে গিয়েছেন। সতীশ চন্দ্র ঘোষ ও রাজা ভুবন মোহন রায় মহোদয় আরাকানের ইতিহাস “দেঙ্গ্যাওয়াদি আরেদ ফুং” এর কথা ও শ্রুতি শুনেছেন কিন্তু

দেখেছেন, পাঠ করেছেন বলে মনে হয় না। অথচ ঐ বহির উপর তাদের রায় ঘোষণা করা হয়েছে। আমার মনে হয় হিন্দুদের হিন্দু ইতিহাসবিদদের তালে-বেতালে পড়ে চাকমাদের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। ত্রিপুরারা তিব্বোতো মঙ্গোলীয় বোডো গ্রুপের লোক। অতীতে তারাও শান দেশের লোকদের মত রাজাদের নামের শেষে ‘ফা’ উপাধি ধারণ করতেন। যেমন “রত্নফা” থেকে মানিক্য উপাধি নিয়ে “রত্নমানিক্য” হন। হিন্দুরা তাদেরকে আর্য্য সভ্যতায় টেনে এনে “চন্দ্রবংশ” এর অধঃস্তন পুরুষ বর্ণনা করে রাজাকে মোহিত করে হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করে ভারতীয় রূপে রূপান্তর করেন কিন্তু সকল ত্রিপুরাদের হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করলেও জাতি দীক্ষিত করতে পারেন নি। রাজ বংশের ত্রিপুরারা হয়ে গেল বর্মণ-বান্জালী, জামাটিয়া, রিয়াং, উসুই ত্রিপুরারা হয়ে রইল পাহাড়ী। তাদের পরম্পর ভাষা পর্য্যন্ত বুঝাবুঝি নাই। চাকমারা মঙ্গোলীয়ান, বার্মা আরাকান থেকে এসেছেন, গবেষক, Risely চাকমাদেরকে শতকরা ৮৫% ভাগ মঙ্গোলীয়ান বলে মন্তব্য করেছেন।

চাকমাদের আর হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত করা গেল না, চাকমাদের পৌরহিত রুণী বা রাউলীদের বাধার প্রেক্ষিতে। তবু চাকমা রাজা ও চাকমা জাতিকে শাক্য জ্ঞাতি ক্ষত্রিয় জাতি রূপে বুঝান হল, শাক্যরা ভারতীয় তাই চাকমারাও Semi Indian অর্ধ ভারতীয় করে ছাড়লো হিন্দু পণ্ডিতরা। এতেই চাকমারা খুশী, একে তো বুদ্ধ বংশ, শাক্য বংশ দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয়, বেশ হয়ে গেল। চাকমা রানী কালিন্দী রানীর আমলে সংঘরাজ সারমেধ ভাস্তে না আসলে এতদিন চাকমারা সকলেই হিন্দু হয়ে যেতেন। তবু তুলাবানে (লংগদু থানার) বহু সংখ্যক চাকমা বৈষ্ণব হরিভক্ত ছিলেন এবং কাটাছড়ি তৈমিদিংএ-ও কিছু বৈষ্ণব হরিভক্ত চাকমা আমি নিজেই দেখেছি। তুলাবানে (বাঘাইছড়ি থানায়) এখনও বৈষ্ণব হরিভক্তের পুত্র কন্যা নাতি নাতনিরা রয়েছে। চাকমাদেরকে এখনও শাক্য বংশ, ক্ষত্রিয় বংশ, যোদ্ধা বললে, তাদের মুখে হাসি ফুটে উঠে। যাদের এখনও আদি আবাস ভূমি, জন্মস্থান চম্পকনগরের ঠিকানা নেই, সেই জাতির পরিচয় কই? মা-বাপকে চিনি না অভিজাত প্রমাণ করতে চাই!

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে রাজা সের মুস্তা খাঁ এর দস্তক পুত্র (ভাইপো) সুখদেব রায় একাধারে রাজ বংশীয় লোক, জমিদার, রাজ প্রতিনিধি ও মোগল বাদশা থেকে “রায়” খেতাব প্রাপ্ত ব্যক্তি। তিনি হিন্দু ধর্ম ভাবাপন্ন ও হিন্দুধর্মের পক্ষপাতি ছিলেন। তার ত্রিপুরা মহারাজার সাথে সখ্যতা ছিল। তিনি ত্রিপুরা মহারাজার নিকট ব্রাহ্মণদূত পাঠিয়ে কালী পূজার ব্যবস্থা করেন এবং চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ে “ত্রিপুরা সুন্দরী” নামে একটা কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চাকমা রাজা জব্বর খাঁও হিন্দু ধর্মের প্রতি দুর্বল ছিলেন এবং তিনি হিন্দুর মত ভোজন করতেন। রাজাদের এই দুর্বলতার সুযোগে ব্রাহ্মণ রাজ গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য আচার্য্য মহোদয় তার কাজ হাসিল করেন। চাকমাদের ‘জনশ্রুতি’ বিজ্ঞক উলত-পালট (উল্টা-পাল্টা) করে গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য আচার্য্য ব্রাহ্মণ মহোদয়

চাকমাদের ইতিহাসের রূপরেখা তৈয়ার করে দেন এবং চাকমা রাজ ও চাকমাগণকে ক্ষত্রিয় ও শাক্য বংশে পদোন্নতি দিয়ে দেন। এতে চাকমা রাজা খুশী, প্রজারা আরো খুশী। সুচতুর গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য আচার্য্য ব্রাহ্মণ মহোদয় সম্ভবতঃ ঐ চাকমা ইতিহাসের রূপরেখার কপি বা নকল রাজা ব্যতীত প্রজাবৃন্দের কাছেও বিলি করেন। পরবর্তী সময়ে চাকমা ইতিহাস লেখকেরা ঐ আচার্য্য ব্রাহ্মণ মহোদয়ের চাকমা ইতিহাসের রূপরেখার উপর ভিত্তি করে আরো কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিজ নিজ ধাচে চাকমা জাতির ইতিহাস রচনা করেন। শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস ১৯৪০ এর লেখক মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী) মহোদয় তো তার বইয়ে গ্রহাচার্য্য শঙ্করাচার্য্য আচার্য্য ব্রাহ্মণ মহোদয়ের কথা ও নাম উল্লেখ করেছেন। যার উপর তার চাকমা ইতিহাস লিখার মূল ভিত্তি। চাকমাদের হাজার বৎসরের লিখিত বিজক বিদ্যমান থাকার কথা নয়। জনশ্রুতি তাদের বিজক ও ইতিহাস। সতীশ চন্দ্র ঘোষের “চাকমা জাতি”, রাজা ভুবন মোহন রায় এর “চাকমা রাজবংশের ইতিহাস”, নোয়ারাম চাকমার “পার্বত্য রাজলহরী”, বিরাজ মোহন দেওয়ানের “চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত”, কামিনী মোহন দেওয়ানের “পার্বত্য চট্টগ্রামের এক দীন সেবকের আত্মকাহিনী”, প্রাণ হরি তালুকদার এর “চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস”, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এর “পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি”, আগর তারা শাস্ত্রী আত্ম ফুলচান কার্খারী এর “স্বধর্মের পথে” প্রভৃতি বহিঃশ্রুতি সূক্ষ্মভাবে পাঠ, অনুধাবন করলে উপরোক্ত গ্রহাচার্য্য মহোদয়ের বিরচিত চাকমা ইতিহাসের রূপরেখার চাপ বা অনুসরণ, অনুকরণ, অনুমান প্রতিফলন বুঝা যায়।

এখন আমাদের চাকমাদের আসল, খাঁটি ও সঠিক ইতিহাস উদ্ধার ও উদ্ঘাটন করতেই হবে এতে আমরা মগ, আরাকানী, বার্মিজ, থাই, কম্বোডিয়ান, মালয়ী বা শাক্য হতে কিসের লজ্জা? আপন পিতা-মাতাকেই তো মা-বাবা ডাকবো। পালক পিতাকে সম্মান করতে পারি কিন্তু বাবা ডাকতে পারবো না। আগে পিতার প্রমাণ দাও। তার পর পিতৃত্ব দাবী করতে পারো। আমি বাবু সুপ্রিয় তালুকদার এর মতের সঙ্গে একমত। আমরা চাকমারা বার্মা-আরাকান থেকে বাংলায় এসেছি কিন্তু চাকমারা বার্মা-আরাকানের আদিবাসী নয়। চম্পকনগর থেকেই চাকমারা বার্মা-আরাকানে আসেন। তথ্য জাতির পুরাতন সত্ত্বা হারিয়ে পুরাতন জাতির খোলসের উপর উচ্চারণের বিভ্রাট ও অপভ্রংশ হয়ে চাক/সাক/থেক থেকে চকমা/চাংমা/চাকমা নতুন নাম রূপ ও জাতির উদ্ভব। এখন বার্মা-আরাকানে চাকমারা কোথেকে আসলেন তাহা প্রমাণ করতে হবে। আসুন, বুদ্ধিজীবীরা অনুসন্ধান করতে যাই। জাতির কলংক মোচন করতে যাই- বাপের কলংক, মায়ের কলংক ও জাতির কলংক।

বার্মা আরাকানে চাকমাদের ইতিহাস হবে, বর্তমানে ভারতের অরুণাচল (নেফা) বসবাসরত চাকমাদের ইতিহাসের মত। অরুণাচলের চাকমারা পাকিস্তান শাসন আমলে কাণ্ডাই বাঁধের ফলে তাদের সম্পূর্ণ ঘর-বাড়ী, জমি-জমা ডুবে যাওয়ার পরও

যখন সরকার তাদের পুনর্বাসন দিতে পারলেন না, তারা বাধ্য হয়ে ১৯৬৪-৬৫ ইং সনে পূর্ব পাকিস্তান, তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ভারত সরকার তাদেরকে অরুণাচলে স্থানান্তর ও পুনর্বাসন দেন। এতদিন তারা সেখানেও পরবাসী ছিলেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৪০/৪১ বৎসর পর ভারতের সুপ্রিম কোর্টের রায়ে তারা ভারতের নাগরিকত্ব পান শুধু যারা ভারতে গিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। অরুণাচলের চাকমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস যদি লিপিবদ্ধ করে রাখা না হয়। কয়েক শত বৎসর পরে যদি তাদের উত্তরসূরীরা কেহ বলেন আমরা পাশের রাষ্ট্র ভুটান বা তিব্বত থেকে অরুণাচলে এসেছি? যাহা বিশ্বাসযোগ্য হবে এই জন্য যে ভুটান বা তিব্বতীদের চেহারা ও চাকমাদের চেহারা প্রায় একই রকম এবং ধর্মও একই বৌদ্ধ। তাহা ছাড়া অরুণাচল ভুটান ও তিব্বত থেকে প্রায় ৫০/১০০ মাইলের দূরত্বে অবস্থিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অরুণাচল থেকে প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া চাকমাদের আধুনিক কালের ইতিহাস খুবই এ কালের ১৮৬৯ ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ক্যাপ্টেন টি. এইচ. লুইন সর্ব প্রথম চাকমাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন "The Hill Tracts of Chittagong and Dwellers Therein" বইয়ে। এরপর বেশ কয়েকজন লেখক চাকমা ইতিহাস রচনা করেন। সকলেই তাদের একই সূর চাকমাদের ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিক তথ্য ও উপাদানের খুবই অভাব। পরিশেষে ১৯৯১ ইং ও ১৯৯৩ ইং সনে বাবু অশোক কুমার দেওয়ান চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড লিখে চাকমাদের ইতিহাস রচনায় এক বিরাট আলোড়ন ও বিতর্ক সৃষ্টি করে যান। তিনিও চাকমা ইতিহাস খুবই আলোচনা, পর্যালোচনা করে যান কিন্তু সিদ্ধান্ত বা সমাধান দিতে পারেন নি। সবই ভবিষ্যত প্রজন্ম ও বুদ্ধিজীবীদের কাঁধে সব দায়িত্ব দিয়ে অকস্মাৎ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি বেঁচে থাকলে তার তথ্যও হয়তো কিছু সিদ্ধান্ত ও সমাধান দিতেন। জাতির চরম দুর্ভাগ্য এভাবে আমরা জাতির জ্ঞানী-গুণী লোকদের হারাতে বসেছি। চাকমারা বার্মা-আরাকান থেকে বঙ্গভূমিতে তথা চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করেন ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে। কোথেকে চাকমারা বার্মা আরাকানে এসেছেন তাহা প্রমাণ করতে পারলে চাকমাদের আদিবাসস্থান চম্পকনগর আবিষ্কৃত ও উদ্ধার হবে।

সুলতানী আমলে নবাব জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহের আমলে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে চাকমারা রাজনৈতিক কারণে বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে বাংলার ভূমিতে আলীকদম, টেকনাফ রামুতে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। কোন কোন ইতিহাস লেখক চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলার রাজধানী গৌড় থেকে দূর দূরান্ত চট্টগ্রামের সীমান্তে নবাবের কর্তৃত্ব ও শাসন সুদৃঢ় ছিল কিনা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এবং চাকমা রাজাকে সাহায্য করার পর্যায়ে ও পরিস্থিতি ছিল কিনা সংশয় সৃষ্টি করেন। ভারত ও বাংলার ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ঐ সময়ে ১৩৪৩-১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার স্বাধীন নবাব শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ, ১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রীষ্টাব্দে

ঐ পুত্র সেকান্দর শাহ ও ১৩৯০-১৪০৯ খৃষ্টাব্দে ঐ পুত্র আজিম শাহ গৌরবের সহিত অবিলম্বে বাংলা শাসন করেন। আজিম শাহের পুত্র সেফদ্দীন হামজা ১৪১০-১৪১৪ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করে মৃত্যুমুখে পতিত হলে নবাবের দত্তক পুত্র সাহাবুদ্দীন বায়াজিৎ শাহ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব কালে দিনাজপুরের সামন্ত শাসক রাজা গণেশ ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সিংহাসন দখল করেন এবং ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে ধনুজ মার্দন দেব উপাধি ধারণ করে নিজ নামে মুদ্রা ইস্যু করেন কিন্তু অল্পকালের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলে তার ২য় পুত্র মহেন্দ্র দেব ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন দখল করে নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। কিন্তু এই সনেই গণেশের প্রথম পুত্র যদুসেন মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ছোট ভাই মহেন্দ্র দেবকে পরাজিত করে বঙ্গের সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে জালাল উদ্দীন মহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ করে রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন করেন। ঐ উপলক্ষে তিনি নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তার রাজত্ব কালেই চাকমারা বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে গৌড়ের নবাবের কৃপায় বঙ্গাধিপতির চট্টগ্রামের শাসনকর্তার সহায়তায় আলীকদম, টেকনাফ ও রামুতে স্থানান্তরিত হন এবং বঙ্গের আশ্রয় লাভ করেন। নবাব জালাল উদ্দীন মহাম্মদ শাহ সগৌরবে ১৪৩১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন। ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে তার পুত্র শামসুদ্দীন আহম্মদ শাহ সিংহাসনে আরোহণ করে ১৪৪২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। সামসুদ্দীন আহম্মদ শাহ অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাজা গণেশের রাজ বংশ লোপ পায় এবং পূর্ববর্তী শাসক সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের পৌত্র নাসির উদ্দীন মহম্মদ শাহ বাংলার রাজপটে প্রতিষ্ঠিত হন।

(সূত্র : চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ১৯০৮ খৃঃ পৃষ্ঠা- ৬২)

"The Coin of Raja Ganesh alias Dhanuzmardanadeva for the year 1417 was struck at Chatigrama and has been discovered. After Raja Ganesh his younger son Mahendra Dev declared independence in Chittagong. But his elder brother who accepted Islam and was known as Jalaluddin Shah ousted Mahendra Dev from Chittagong in 1418. In this year, his governor gave shelter to Chakmas. His coin dated 1420 has been found at Chittagong.

It appears from the history of Chakmas that the Chakma King Maisang was driven out of his kingdom upper Burma by the Arakanese King in 1418 on the ground of his showing disrespect towards Buddhism. He was given shelter at Alikadam on the Bank of Matamuhuri river by the

Muslim Governor of Chittagong. Beside, Alikadam, eleven other villages were given as gifts to the Chakma King the settlement of retinue principally at Ramu and Teknaf. They were loyal to Muslim administration.

In 1406 the Arakanese King Mawn Saw Mawn (Nara meikhlā) was dethroned by Burmese King. The Arakanese King remained in the Muslim court for 24 years. In 1414 the refugee king assisted Raja Ganesh against the army of Jounpur (Ibrahim Shah Sharqi) was not leaving the country even after allowed his son to embrace Islam and occupy the throne. In 1426 Jalaluddin Muhammed Shah dispatched army to restore Arakanese King to the throne under Gen Wali Khan. He betrayed his trust and took possession of Chittagong for himself. Mawn Saw Mawn again escaped to Gaur. The sultan sent second army under General Sandi Khan who restored the King to the throne after killing Wali Khan.

Out of gratitude of his restoration the king built Sandi Khan Mosque near Mrohong (Capital). The Arakanese King became a tributary to the sultan of Bengal and undertook to assume a Muslim name and strike coins with Kalima inscribed therein. Henceforth, Arakanese administration continued to bear definite Islamic stamp. Mawn Saw Mawn became tributary to Gaur and retained Muslim title as Sulaiman Shah himself.

In 1434-35 Meng khari alias Ali Khan (1434-59) occupied the territory up to Ramu. Chakmas on the frontier put up strong resistance on behalf of the Muslim. But as no reinforcement arrived from Shamsuddin Mohammad Shah, The Chakmas were compelled to cede some parts of Ramu to Arakanese King. The Village Rajarkul and Chakmar Kul near Ramu commemorate Arakanese invasion even now.

ইতিমধ্যে আরাকানের রাজা মেগ্যাতির মৃত্যু হলে তার উত্তরসূরী মোন শোয়েমুন বা নরমখীলা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানের রাজা হন কিন্তু ১৪০৬ খৃষ্টাব্দে দেশে বিদ্রোহের কারণে তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হন এবং ১৪২৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়ের নবাবের আশ্রয়ে বসবাস করেন প্রায় ২৪ বৎসর। ঐ সময়ে একদিন জৈনপুরের বাদশা বাংলা আক্রমণ করলে মোনশোয়েমুন গৌড়ের নবাবকে যুদ্ধে বিশেষ সাহায্য ও রক্ষা করেন। এতে নবাব সন্তুষ্ট হয়ে তার রাজ্য পুনঃ উদ্ধার করে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। নবাব জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ নির্বাচিত আরাকান রাজাকে সাহায্য করলে বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি উলু খাঁনকে পরাজিত ও হত্যা করে ১৪২৯- ৩০ খৃষ্টাব্দে মোনশোয়েমুন পুনঃ আরাকানের সিংহাসন দখল করেন। এভাবে আরাকান বাংলার নবাবের প্রভাবান্বিত রাজ্যে এবং আরাকান রাজারা নিজের উপাধি ব্যতীতও মুসলিম উপাধি ধারণ করতে থাকেন। রাজা মোনশোয়েমুন নিজেই “সোলেইমান শাহ” উপাধি ধারণ করেন। পরবর্তীতে আরো বেশ কয়েক জন আরাকান রাজা মুসলিম উপাধি ধারণ করেছিলেন।

বিজ্ঞাতি বা বিদেশীদের কোন জাতির ইতিহাস রচনায় অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। ইতিহাসবিদরা অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না বা জাতির অনেক গুহ্য বিষয় না জেনেই মন্তব্য করে ফেলেন। অনেক সত্য ঘটনাও তথ্য ও উপাদানের অভাবে সঠিকভাবে লিখিত হয় না। চাকমা জাতির ইতিহাসে এরূপ ঘটনার বহুল পরিলক্ষিত। তবু ইতিহাসবিদদের ধন্যবাদ জানাতে হয় তারা চাকমা ইতিহাসকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে এসেছেন। কিছু ভুল ত্রুটি বা অমিল অথবা গড়মিল থাকলেও সতীশ চন্দ্র ঘোষ, মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মী, বিরাজ মোহন দেওয়ান। প্রাণহরি তালুকদার ও বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা মহোদয়েরা জাতির অনেক হারানো তথ্য ও ইতিহাস উদ্ধার করেছেন। তাদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলে একদিন আমরা আমাদের পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ইতিহাস খুঁজে পাবো। ভবিষ্যত প্রজন্ম ও বুদ্ধিজীবীরা একটু পরিশ্রম, একটু ত্যাগ স্বীকার করতে পারলেই আমাদের জাতীয় সম্পদ উদ্ধার করা সম্ভব হবে। আমি চাকমা জাতির ইতিহাস সমৃদ্ধ অঞ্চলে আরাকান বার্মা ঘুরে আসলাম ১৯৯৭ ইং সনে। পথে-ঘাটে সর্বত্র চাকমাদের ইতিহাসের উপাত্ত ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। আরাকানে ঢুকেই বুসিতং ট্রান্সিট ক্যাম্পে এক চাকমা- দৈহ্নাক এর দেখা পেলাম। চাকমা কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তুই চাকমারে’ উত্তর ‘দারা (দাদা) মুই চাকমারে’। অনেক কথা হল। পরিশেষে তিনি বললেন, ‘দারা’ আমি নিজেরা চাকমা কলেউ, আরাকানিগুনে আমারে চাকমা ন কনরে, তারা আমারে দৈহ্নাক কনরে। শুধু বুসিতং নয়, আকিয়াব, ম্রোহং ও স্টিমারে দৈহ্নাক চাকমাদের সাথে দেখা ও কথাবার্তা হয়। তারা মানিকছড়ি-রন্যছড়ি ধন্য গোছা ও ওয়াগ্লার কার্বুয়া গঝাদের মত কথা ও উচ্চারণ। আপার বার্মায় মান্দালয় এর উত্তর-পশ্চিমে চাকমা শহর সেগাইন

(সাক+গাইন) টাউন প্রাদেশিক রাজধানী মইজগিরি? দেখে আসলাম ১৯৯৭ ইং সনের ডিসেম্বর মাসে। এখন শুধু ইতিহাসের পাতা থেকে পথের ধারে পড়ে থাকা চাকমাদের ইতিহাস তুলে নিতে হবে ইতিহাসের পদ্ধতিতে। এককালে আরাকানের প্রশাসক (১৮২৪/২৫ ইং) বার্মার গভর্ণর জেনারেল মি. আর্থার ফ্রেরী তার ইতিহাসে স্বীকার করছেন। সমগ্র বার্মা তিনটা বৃহৎ জাতি কর্তৃক শাসিত (১) প্র জাতি- বার্মিজ (২) রাখাইন ও (৩) থেক/সেক জাতি। শেষোক্ত জাতি বার্মার আদিবাসী নয় বিদেশ থেকে আগত Corrupted Bengali Speaking People. এই থেকরা/সেকরা চাকমা জাতি তাহা প্রমাণিত হয়েছে। সেই থেক বা সেকরা যে চাকমা জাতি তার জ্বলন্ত প্রমাণ দেখলাম আকিয়াব মিউজিয়ামে (যাদুঘরে)। সেই দিন ৬ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখ প্রেইনে রেঙ্গুন থেকে আকিয়াব পৌঁছি প্রায় সকাল ১১টায় ভাত খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমাদের দলপতি শ্রদ্ধেয় সত্যপ্রিয় মহাথেরো, বিহারাধ্যক্ষ, রামু সীমা বৌদ্ধ বিহার, কল্পবাজার মহোদয় বললেন, চল আমরা আকিয়াব টাউনটা দেখতে যাই। আমরা সর্ব প্রথম আকিয়াব যাদুঘরে প্রবেশ করি। যাদুঘর ঘুরতে ঘুরতে আমরা এখন জায়গা ও কক্ষে এসে হাজির যেখানে অতীত কাল থেকে বসবাসকারী ৫ (পাঁচ) জন আদিবাসীর স্বামী-স্ত্রী বা পুরুষ মহিলার মডেল হিসাবে পূর্ণাঙ্গ জাতীয় পোষাকে দেওয়ালা রাখা হয়েছে। ১নং মডেল খুমী জাতি অর্ধ উলঙ্গ। হাঁটুর উপর মহিলাদের পোষাক, ২নং মডেল শ্রো- জাতি। তাদের পোষাকও প্রায় একই পর্যায়। ৩নং মডেল রাখাইন জাতি (আরাকানী), ৪নং মডেল দৈহ্নাক জাতি। আমাদের দেশের তঞ্চঙ্গ্যা জাতি। ৫নং মডেল থেক বা সেক জাতি। এই থেক বা সেক জাতির পোষাক অবিকল আমাদের চাকমা মহিলাদের পিনন-খাদি। পিননের উপর চাবুগীটা রয়েছে। থেক জাতির পরনের পোষাক আমি বাল্যকালে আমার দেখা প্রায় ৬০/৬৫ বৎসর আগে বাবার ব্যবহারিত জুম্ম-সিলুমটির অবিকল নকল। বাবা জুম্ম কাটতে বা জঙ্গল কাটতে গেলে ঐ জুম্ম সিলুমটি ব্যবহার করতেন। ইদানিং সেইরূপ জুম্ম সিলুম কেহ আর ব্যবহার করতে দেখি না। সেই থেক/সেক জাতিই তো চাকমা জাতি। এখনও কেহ আকিয়াব যাদুঘরে গেলে সেই থেক চাকমার মডেল দেখতে পাবেন।

সেই দিনই তারপর আমরা যাদুঘর ত্যাগ করে রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালোক মহাথেরো এর প্রতিষ্ঠিত আকিয়াব বৌদ্ধ বিহার দেখতে পাই। বৌদ্ধ বিহার দেখার পর আমি বিহার প্রাঙ্গণে ঘুরাঘুরি করতেছি। বিহারের পার্শ্বে এক বাড়ীর লোক আমাকে হাতের ইসারায় ডাকেন। আমি তথায় গেলে এ ভদ্রলোক সরাসরি আমাকে ইংরেজীতে জিজ্ঞাস করেন Are you Chakma? আমি উত্তর দিলাম Yes এবং সঙ্গে সঙ্গে আমিও জিজ্ঞেস করলাম Who are you. তিনি উত্তর দিলেন I am also a Chakma আমার প্রশ্ন What are you doing? তিনি উত্তর দিলেন I am a retired Veterinary Surgeon. আমি আবার জিজ্ঞাস করি Could you speak your own languages? তিনি উত্তর দিলেন

No, brother we have forgottene we come here 4/5 generation back and we are detached from our people thus we lost our languages. এভাবে কিছু চাকমা আরাকানী হয়ে যান এবং আমাদের দেশেও কিছু আরাকানি বা মগ চাকমা হয়ে যান। ধামাই গম্বার মগ-গুতির লোকেরা মগ বা আরাকানি। তাদের আদি পুরুষ 'করেংগিরি' এবং তার অধঃস্তন পুরুষ মতিলাল চাকমা (মতিলাল) গোলাছড়ি রাঙ্গামাটিতে সর্ব প্রথম ১৯০৯ ইং সনে এন্ট্র্যান্স পাশ করেন এবং তার সুযোগ্য বংশধর বাবু শাক্যেন্দু শেখর চাকমা বি কম, অবসর প্রাপ্ত একাউন্ট অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিস, রাঙ্গামাটি। আমি নিজেই আরাকানে দৈন্যাক চাকমাদের সঙ্গে আলাপ ও কথা বলে আসলাম। চাকমারা এক কালে আরাকানে ছিল এখনও আছেন, ইহার পর আর সন্দেহ থাকার কথা নয়?

বহু লেখক, ইতিহাসবিদ ও গবেষক চাকমাদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য না জেনে বা চাকমাদের হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য অথবা নিম্নমানের জাতি রূপে চিত্রিত, চিহ্নিত করার জন্য অলীক, ভিত্তিহীন মন্তব্য করেছেন। বাবু অশোক কুমার দেওয়ান এইরূপ প্রায় ১০ (দশ) জন চাকমাদের উপর আংশিক মন্তব্য চিহ্নিত করেছেন এবং ঐ মন্তব্যগুলি অসারতা সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন তার চাকমা জাতির ইতিহাস বিচার বহিতে। তাহা নিম্নে পুনঃ উল্লেখ করা হ'ল এবং পরপর বিচার বিশ্লেষণ করা হল :

- (১) লুইনের মতে চাকমারা মালয় দেশজ।
- (২) কারো কারো মতে তারা শ্যাম/থাই, কমোন্ডিয়া, মাটির সন্তান।
- (৩) হাচিন সনের মতে শায়েস্তা খাঁনের সৈন্য দলের ঔরসজাত মগ রমনীদের বংশজাত।
- (৪) জনাব আবদুস সাত্তারের মতে তারা আরবের ছেক বংশধর।
- (৫) ফ্রেইরীর ধারণা অনুযায়ী তারা মগ রাজার অধীনে দাসদের সন্তান-সন্ততি।
- (৬) মগ সৈন্যদের ঔরসজাত বাঙ্গালী মেয়েদের সন্তান।
- (৭) দুরাগত বাঙ্গালীর গোষ্ঠীর কোন বিজয়ী বাহিনীর দল ত্যাগী সৈন্যদলের বংশধর।
- (৮) বাঙ্গালী হিন্দু সম্প্রদায়ের কোন পরিত্যক্ত ব্রাত্যদল।
- (৯) বহু পূর্বে মধ্যযুগে চট্টগ্রাম অভিযানকারী কোন ত্রিপুরা বাহিনীর সৈন্য দলের বংশধর।
- (১০) বহু পূর্ব থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসকারী ইন্দোমঙ্গোলীয় জন গোষ্ঠীর একটা অংশ ইত্যাদি।

বাবু অশোক কুমার দেওয়ান ও তার চিহ্নিত মন্তব্য ও ধারণাগুলি নিজেই তার ধারণা সহ বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা প্রথম হতে ১০ ধারণা পর্যন্ত বিভিন্ন যুক্তি অবতারণার মাধ্যমে বাতিল করে দিয়েছেন। আমিও আমার মত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করলাম :

আমাদের জিজ্ঞাসা, চাকমারা যদি শ্যাম/মালয় বা কম্বোডিয়া থেকে এসে থাকেন, বার্মা-আরাকানে যখন তাদের জীবন খুবই বিপন্ন হল, সেখানে আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার মত পরিস্থিতি ছিল না, তারা অনেকটা সহজ ও নিকটবর্তী দেশ থাইল্যান্ড বা মালয়ের দিকে কেন পালাল না। আরাকান দেশ এমনি পার্বত্য সংকুল, উচ্চ পর্বত মালা ইয়াহোমা সুউচ্চ পর্বত ও (তিন) টা বড় বড় নদী-মাযু, কলডাইন ও লিমিউ নদী অতিক্রম করে বঙ্গভূমিতে ভারতের দিকে আসা খুবই কঠিন ছিল। থাইল্যান্ডের দিকে যেতে একমাত্র ইরাবতী নদী ব্যতীত কোন বড় নদী নেই। মান্দালয় ও শান স্টেটের মধ্যে দিয়ে থাইল্যান্ড থেকে শুধু স্থল পথে এখনও যাওয়া যায়। চাকমারা কেন সেই দিকে গেল না, ইতিহাসই উহার উত্তর দিবে। প্রাক ঐতিহাসিক যুগে বাঁ বিজয়গিরি রাজার সমসাময়িক অথবা কিছু কাল পূর্ব যুগে চাকমাদের নামগুলি প্রায় ইন্দো এরিয়ান, যেমন বিজয়গিরি, উদয়গিরি, সমুদ্রজিৎ, ইন্দ্রজিৎ, লাক্সলধন প্রভৃতি। তারা শ্যাম বা মালয় থেকে আসলে তাদের নামগুলি নিশ্চয় এরূপ হত না। বার্মা-আরাকানে প্রায় ৫০০ বৎসর বসবাস শাসন-শোষণ বা অবস্থান করলেও তারা খুব বেশী বার্মিজ ও আরাকানিজ শব্দ বা নাম গ্রহণ করেন নি। বার্মা আরাকানিজরা চাকমাদের তাদের ভাষায় ডাকলেও চাকমারা তাদের নিজস্ব ইন্দো-এরিয়ান নাম রাখতেন। বার্মা-আরাকানিজ যুগে চাকমাদের নাম সমূহ যেমন :

চাকমা নাম	বার্মা-আরাকানিজ নাম
১। রাজা অরুন যুগ	ইয়ংজ ১৩৩৩ খৃঃ
২। রাজপুত্র সূর্য্যজিৎ	চোফ্র "
৩। রাজপুত্র চন্দ্রজিৎ	চৌফ্র "
৪। রাজপুত্র শত্রুজিৎ	চৌতু "
৫। মইঘ্যাং রাজা	মংছই ১৩৬৩ খৃঃ
৬। রাজা মানেকগিরি	ম্যারেকাস ১৪১৮ খৃঃ
৭। রাজা জনু	চনুই ১৫১৬ খৃঃ
৮। রাজকন্যা সাজেম্বি	সাজাইয়ু ১৫৩২ খৃঃ
৯। রাজকন্যা চন্দ্রমুখী	চুমি খা ১৩৩৩ খৃঃ
১০। চক্রদাহ	চাকাদাঁও ১৩৬৩ খৃঃ

বিংশ শতাব্দীর সত্তর আশি দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বিশেষতঃ বান্দরবান ও থানচি এলাকায় এক কুচক্রী মহলের প্ররোচনায় তথায় বসবাসরত চাকমা সম্প্রদায়ের উপর এক ভীষণ বিপদ নেমে আসে। প্ররোচনার দ্বারা নিরীহ পাহাড়ীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে দিলে ও কিছু অস্ত্র সরবরাহ করলে মুরুং অধ্যুষিত এলাকায় মুরুং জাতির লোকেরা সশস্ত্র মুরুং বাহিনী গঠন করে চাকমাদেরকে অত্যাচার, লুটপাট ও হত্যা করা আরম্ভ করলে তথায় বহু চাকমা থানচি মধু এলাকায় প্রাণ হারান ও অত্যাচারিত হন। আমি ১৯৮৩-৮৪ ইং সনে জুরাছড়ি থানায় চাকুরীরত কালে এইরূপ বহু অত্যাচারিত চাকমা পরিবারের সাক্ষাৎ পাই, যারা শুধু ধন সম্পদ হারাননি বহুলোকের জীবনও হারিয়েছেন। তারা অধিকাংশই সুবলং, জুরাছড়ি এলাকার লোক। কর্ণফুলী বাঁধে উদ্ভাস্ত হয়ে সরকার কর্তৃক সঠিক পুনর্বাসন দিতে ব্যর্থ হলে তারা জীবন রক্ষার্থে সুদূর বার্মা সীমান্তবর্তী থানচি মধু এলাকায় স্থানান্তরিত হয়ে জুমচাষ করতে যান। সেখানে সত্তর আশি দশকে মুরুং বাহিনীর অত্যাচারে দুর্গম পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে বগা, ঠেগা, ধুপশীল-মোন পাড়ি দিয়ে প্রায় ৬/৭ দিন পায়ে হেঁটে চাকমা এলাকা সুবলং জুরাছড়িতে এসে জীবিতরা প্রাণ রক্ষা করেন। তাদের বহু স্বজন পাড়া-পরশী মুরুং বাহিনীর হাতে প্রাণ হারান। তারা তো বি-জাতির দেশ নিকট এলাকায় আরাকানে চলে যেতে পারতেন। অনেক অঘটন ঘটে যাওয়ার পর আশির দশকের শেষ নব্বই দশকের প্রথম ভাগে সরকার তথাকথিত মুরুং বাহিনী থেকে অস্ত্রগুলি জব্দ করলে চাকমাদের বিভীষিকাময় বিপদ অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। বাঘাইছড়ি থানার লংকর এলাকার দোজর পাড়ার অনুপম কার্বারী নামে এক ব্যক্তির সাথে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়। তিনিও ঐ থানচি মধু এলাকায় মুরুং বাহিনী কর্তৃক অত্যাচারিত এক ব্যক্তি হন। তথায় তিনি একজন জুমচাষী খনাচা ব্যক্তি ছিলেন। মুরুং বাহিনীর অত্যাচারে জীবন নিয়ে সাজেক এলাকায় ফিরে আসেন। এখন ভিক্ষুকের মত জীবন যাপন করতেন। এভাবে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বার্মা আরাকানে একটা বিরাট প্রতিষ্ঠিত সরকার ও জাতি দ্বারা চাকমারা কিরূপ অত্যাচারিত হয়েছিলেন, তাহা কল্পনাও করা যায় না। তাই তারা বঙ্গভূমি ভারতের দিকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। তৎকালীন মুসলিম শাসক গৌড়ের নবাব জালাল উদ্দীন মহাম্মদ শাহের মানবিক ধর্ম ও কৃপায় চাকমারা বঙ্গভূমিতে আলীকদম, টেকনাফ, রামুতে আসার অনুমতি পান। মুরুং বাহিনীর অত্যাচার থেকে বার্মা আরাকানিজদের অত্যাচার, নিপীড়ন আরো নির্মম, আরো কঠিন ছিল। হায় দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচার কি চিরকাল চলবে?

এভাবে অশোক বাবুর চিহ্নিত ১ নং ও ২ নং ধারণা বাতিলের কোঠায় রাখতে পারি।

তৃতীয় নং ও চতুর্থ নং ধারণায় চাকমারা মুসলমান হতে বাধ্য। ইসলামিক দৃষ্টিকোণে মুসলমানের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করলে সে পুরা মুসলমান। তার জ্বী

মুসলমান, চাকমা, মার্মা বা ইউরোপিয়ান যে কোন জাতির মেয়ে হউক না কেন। তার বংশধর জন্মসূত্রে মুসলমান হয়ে যায়। ইদানীং কতিপয় ঘটনা বাদ দিলে (এ গ্রন্থটি লেখার) প্রায় ৫৮৬ বৎসর আগে (২০০৪-১৪১৮) চাকমারা প্রথম বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলে এবং প্রায় ৩৩৮ বৎসর মোগল ও মুসলমানের শাসনে বসবাস করলেও (২০০৪-১৬৬৬) এই পর্য্যন্ত কোন চাকমা মুসলমান পরিবার দেখি নাই যদিও তারা মুসলমান শাসকের কৃপায় বা সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে কোন কোন চাকমা রাজা বা প্রজারা মুসলমান নাম গ্রহণ করেছেন, মুসলমান ধর্ম নয়।

এভাবে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ১০(দশ) জন চাকমা রাজার নাম খাঁ উপাধি সম্বলিত রাজা জালাল খাঁ (১৭১৫ খৃঃ) থেকে ধরম বক্স খাঁ (১৮৩২খৃঃ)। তাহা ছাড়া যামিনী রঞ্জন ডি, এল ও এর বাবার নাম জব্বর খাঁ, প্রাক্তন সাংসদ দীপংকর তালুকদার এর প্র-পিতার নাম জামাল খাঁ এবং প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কামিনী মোহন দেওয়ানের পূর্ব পুরুষ কয়েক জনের নাম মুসলমানী নাম দেখা যায়। তারা কেহ মুসলমান ছিলেন না। সুলতানী আমলে ও মোগল আমলে বিশেষ সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে এই মুসলমানী উপাধিগুলি ধারণ করেছেন বলে মনে হয়।

এভাবে ৩য় ও ৪র্থ নং চিহ্নিত ধারণাগুলি অযৌক্তিক ও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করতে পারি।

মাতৃজাতি হল কোন জাতির সভ্যতা, সংস্কৃতির ধারক বাহক। ৫ম ধারণানুযায়ী চাকমাদের মায়েরা মগ হলে চাকমাদের নামগুলি মগের মত হতে বাধ্য এবং ৬ষ্ঠ ধারণামতে চাকমাদের মায়েরা বাঙ্গালী মেয়ে হলে চাকমা মেয়েদের পোষাক শাড়ী হত, পিনন খাদি হতো না। এখনও একবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করেও শেলোয়ার কামিজ, শাড়ী ব্লাউজের পাশাপাশি চাকমা মেয়েরা পিনন-খাদি পরিধান করেন। আমার জানামতে ১৯৪৭ বা ১৯৫০ ইং সনের আগে চাকমা মেয়েরা প্রায় পিনন-খাদি পরিধান করতেন। নব্য শিক্ষিত চাকমা পরিবার ব্যতীত সাধারণ পরিবারের চাকমা মেয়েরা বৃটিশের শাসন পর্য্যন্ত পিনন-খাদি পরিধানে সন্তুষ্ট ছিলেন। বৃটিশ চলে যাওয়ার পর পাকিস্তান আমলে ও বর্তমান বাংলাদেশ আমলে চাকমারা শিক্ষিত হয়ে নিজের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে অবহেলা করে পরের ধনে আত্মতৃপ্তি বোধ করতেছেন। জুম্ম-জাতির জনক মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মার অনুপ্রেরণা ও পাহাড়ী ছাত্র সমিতির প্রচারণা না থাকলে পাহাড়ীরা বিশেষতঃ চাকমারা, চাকমা মেয়েরা অতি আধুনিক হয়ে যেতেন, অতি তাড়াতাড়ি বিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে চাকমা মেয়েরা শতকরা ৯০% ভাগ পিনন-খাদি ত্যাগ করতেন। এখন আমার মায়ের বয়স প্রায় ৯০(নব্বই) বৎসর ও জীবিত। তিনি ১৯৬০ ইং সনের আগে শাড়ী পরিধান করেছেন কিনা আমার স্মরণ নেই। আমাদের মায়েরা মগের মেয়ে অথবা বাঙ্গালী মেয়ে হলে আমাদের মেয়েরা হয় থামি (মগের লুঙ্গি) নয়তো শাড়ী পরিধান করতেন। প্রায় ১৯৫০ ইং পর্য্যন্ত আমরা

ইহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম দেখতে পাই। ভাষাগত দিক দিয়ে আমরা হয় মগের ভাষা বলতাম বা সম্পূর্ণ বাংলা ভাষা বলতাম। চাকমাদের ভাষা মগ বা বাংলা ভাষা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ভাষা। সুতরাং আমরা কিছুতেই ঢালাও ভাবে মগ ও বাঙ্গালীর মাকে মেনে নিতে পারছি না এবং কেহ মানবেন না। এভাবে আমরা ৫ম ও ৬ষ্ঠ ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারি।

বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে বঙ্গভূমিতে চাকমাদের বসবাস প্রায় ৬০০ (ছয় শত) বৎসর অতীত হতে চলেছে। এতদিনেও বাঙ্গালীরাও বাংলার জলবায়ু চাকমাদের মঙ্গোলীয় চাপ ও চেহারা বদল করে দিতে পারেনি। প্রায় ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা চাকমাদেরকে মঙ্গোলীয় বংশোদ্ভূত বলে মত প্রকাশ করেছেন। যারা চাকমা বিদেশে গেছেন, তারা বুঝবেন কিভাবে বিদেশীরা মঙ্গোলীয়ান ভাবেন। এইরূপ দুইটা উদাহরণ দিচ্ছি : (১) বর্তমান জেলা সংগঠক ও শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা বাবু সুধাময় চাকমা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবস্থায় অবস্থানকালে সম্ভবতঃ ১৯৭৩ইং সনে সাবেক বান্দরবান জেলা পরিষদ এর চেয়ারপার্সন মিসেস ম্যামাচিং সহ পূর্ব জার্মানী সফরে যান। এরোপ্লেন থেকে নামার সময় পূর্ব জার্মানীর অভ্যর্থনাকারী ছাত্রদল তাদেরকে দেখেই জিজ্ঞাস করেন Hello brothers are you coming from Combodia তারা উত্তর দেন, No, No we are coming from Bangladesh. তারা আবার প্রশ্ন করেন Are you Bengali? তারা উত্তর দেন No, No we are Buddhist. এতে তারা বাঙ্গালী না বলায় বাঙ্গালী ছাত্ররা মনক্ষুণ্ণ হন এবং তাদেরকে ধমক দেন।

(২) বর্তমান পাহাড়তলী বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আবাসিক প্রকৌশলী বাবু বিকাশ কান্তি চাকমা সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মহোদয় আমার নিকট আত্মীয় হন। তিনি ১৯৯৫-৯৬ ইং সনে চীন বেইজিং উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চীন যান। সেখানে তার সহপাঠীরা সকলেই চীনা। বিকাশ কান্তি চাকমার চেহারা ও মুখের অবয়ব এত মঙ্গোলীয়ান যে চীনরা বুঝে কূল পায় না কিভাবে লোকটা চীনা হয়ে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব নিয়ে আবার চীনে এসেছে? তারা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েন। রসিকতা করেন, তাদের লোকটাকে কিভাবে বাঙ্গালীরা চুরি করে নিয়ে গেছে। প্রশিক্ষণ শেষে অনেকে কেঁদে ও অশ্রুবিসর্জন দিয়ে তারা তাকে বিদায় দেন। তারও সঙ্গীদের ছেড়ে আসতে মনটা যথেষ্ট বিচলিত হয়ে উঠেছিল।

চাকমারা তো মঙ্গোলীয়ান দাবী করেন এবং চেহারাই তাহা প্রমাণ দেয়। দ্বিতীয়তঃ তারা শাক্য বংশীয় মনে করেন (পদোন্নতি প্রাপ্ত)। ইন্দো-এরিয়ান বলতে তো মোটামুটি ভারতবাসীকে বুঝায় আদি নামেই চাকমাদের ভারতীয় বুঝা যায়। কিন্তু সেই দূরদেশ কোথায়? কোন দেশ জয় করতে আসলেন, সেই বিজয়ী বীর কে হবেন? কোন হৃদিস নেই? কোন বাঙ্গালী সম্প্রদায় তাদের ত্যাগ করলেন? কেহ তো

চাকমাদেরকে নিজের লোক বলে দাবী করলেন না? সব অলীক কল্পনা ও ভিত্তিহীন ধারণার উপর একটা জাতির জাতিত্ব নির্ধারণ হওয়ার তত্ত্ব ও নজির কোথাও নেই। তাই সপ্তম ও অষ্টম ধারণা বাতিল বলে গণ্য করা যেতে পারে।

নবম ধারণা মতে চাকমারা মধ্যযুগে ত্রিপুরা বাহিনীর চট্টগ্রাম অভিযানকারীর বংশধর। ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত মতে ও চাকমা তথ্যানুযায়ী দেখা যায় বিজয়গিরি রাজা কালাবাঘা রাজ্য বা চম্পকনগর থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের সহযোগিতায় সপ্তম/অষ্টম শতাব্দীতে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীতে মগ/আরাকানিগণের দমন করার জন্য আরাকান রাজ্য সীমান্ত ধ্যাং পাহাড় (রাজধানী) আক্রমণ ও জয় করেন। সেনাপতি রাধামোহন খীসার নেতৃত্বে যুদ্ধ অভিযান পরিচালিত হয় এবং ত্রিপুরা সেনাপতি কুঞ্জধন রাধামোহনকে সহায়তা করেন। নব চাকমা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাপাইকুলে উহার রাজধানী স্থাপিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসরত উসুই ত্রিপুরাই কুঞ্জধনের ত্রিপুরা সৈন্যের বংশধর বলে জানা গেছে। চাকমারা ত্রিপুরা সৈন্যের বংশধর বলেন না এবং তাহা কেহ শুনেন নাই। ত্রিপুরা রাজা বা ত্রিপুরারাও কোন দিন উহা দাবী করেন নাই। শুধু শুধু চাকমারা কেন ত্রিপুরা সৈন্যের বংশধর হতে যাবে? তাদের সৈন্যের বংশধর উসুই ত্রিপুরারা রয়েছেন। চাকমাদের সৈন্যের বংশধর চাকমা হবেন। কথার জোরে একটা জাতি সৃষ্টি হয় না। ত্রিপুরার রাজা বিজয় মানিক্য ১৫৩২-৬৩ ইং সনে বঙ্গের বাহিনীকে পরাজিত করে, বিজয় উৎসব পালন করেন। আরাকানিজ ইতিহাস অনুযায়ী উপরোক্ত ঘটনার বহু পূর্বে চাকমারা আরাকান ও উত্তর বার্মায় রাজত্ব করতেছিলেন। তারা ত্রিপুরা সৈন্যের বংশধর হতে যাবেন কোন দুঃখে? তাই নবম ধারণাকেও সহজেই বাতিল করা যায়।

চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আসামের “কুকী-ল্যান্ড” এর অন্তর্গত অঞ্চল। ঐ পাহাড়ী অঞ্চল প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে “কিরাত” নামে পরিচিত ছিল। ঐ অঞ্চলের আদিবাসী কারা সঠিকভাবে নির্ণয় করা না গেলেও তথ্য খুবই দুর্ধর্ষ উপজাতীয় লোক বসবাস করতেন বলে জানা যায়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে চাকমারা চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করলে তিব্বতী চীন ঞ্চপের লোক মিজো বা লুসাই, বোম, পাংখোয়াদের তথ্য দেখতে পান। চাকমাদের আগমনের পর ধীরে ধীরে তারা উত্তর পূর্ব দিকে সরে পড়েন এবং পরিশেষে লুসাই হিল বা মিজোরামে অনেকটা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে পরিভ্রমণের সময় রামু কল্লবাজার এলাকায় পাহাড়ী অঞ্চলে কিছু কুকী বা মিজো বসবাস দেখতে পান। বর্তমানে তথ্য কোন মিজো নাই। মিজোরা এত সহজে চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়েন নাই। তারা সময় সময় দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এসে লুঠন, লুটপাট, ধন সম্পদ, হরণ এমনকি নর-হত্যা ও লোক অপহরণ করে নিয়ে যেতেন। সেই অরাজকতা বৃটিশের আমলে ১৮৯২ ইং

পর্যন্ত চলে। ১৮৭১-৭২ খ্রিঃ বৃটিশরা চাকমা মার্মাদের সহযোগিতায় অভিযান চালিয়ে মিজোদের দমন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে শেষ মিজো অভিযানের ফলে মিজো অভ্যচার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। চাকমাদের আগমনের পূর্বে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে কোন আদিবাসী ইন্দো-মঙ্গোলীয়ান জনগোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। শুধু চাকমারা সপ্তম/অষ্টম বা দ্বাদশ শতাব্দীতে যুদ্ধ করতে চট্টগ্রাম আসার খবর পাওয়া যায় এবং তৎপরবর্তী সময়ে চাকমারা সাপ্রাইকুলে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে আসায় বার্মায় চলে যান ‘চাদিগাং ছাড়া পালা’ তার প্রমাণ। এখনও চাকমা বাঙ্গালীরা চট্টগ্রামকে মগ রাজ্য বলে থাকেন। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে শায়েস্তা খাঁ আমলে মোগলেরা মগ বা আরাকানিজদের থেকে চট্টগ্রাম দো-হাজারী পর্যন্ত দখল করে নেন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমারা বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রবেশ করেন। চাকমারা সুলতানি আমল, আরকানি আমল ও মোগল আমলে নিজস্ব শক্তি দিয়ে কোন সময় স্বাধীন, কোন সময় অর্ধ-স্বাধীন, করদমিত্র ও তাবেদারী রাজ্যরূপে আত্মরক্ষা করতে থাকেন। সেইভাবে বৃটিশের আমল পর্যন্ত চলে আসেন। তারা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে চট্টগ্রামের উত্তর অঞ্চলে এসে যান। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরম বক্স খাঁ এর মৃত্যু হলে রানী কালিন্দী রানী আমলে বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যটি গ্রাস করেন এবং ১৮৬০ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম একটা জেলায় ও ১৮৭০ইং সনে ঐ চাকমা রাজ্য ও জেলাটি ৩ (তিন) সার্কেলে বিভক্ত করে রাজাকে চীফ-এ পরিণত করে শুধু মাত্র কর্ণফুলী ভেলীটি চাকমা রাজা ও চীফকে দিয়ে চাকমা রাজ্যটি ধ্বংস করেছেন। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে আর আদিবাসী ইন্দো মঙ্গোলীয়ান পাওয়া গেল না। আন্তর্জাতিক আদিবাসী বিধি মোতাবেক যারা একই জায়গায় দুইশত বৎসর বসবাস করলে বা ততোধিক বৎসর বাস করলে তারা সেই স্থানের আদিবাসী। চাকমাদের ইতিহাস রচনায় এক একজন লেখকের এক এক দৃষ্টিভঙ্গি, এক এক আগাম সিদ্ধান্ত নিয়েই ইতিহাস লিখা আরম্ভ করেছিলেন। তথ্য সংগ্রহে ও গবেষণায় যাহা পাওয়া যাক না কেন, তার আগাম সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টি-ভঙ্গিটাই তার শেষ সিদ্ধান্ত। ফলে, তাদের গবেষণা ও চাকমাদের ইতিহাস রচনা দুর্বল ও কোন কোন ক্ষেত্রে অলীক ও কল্পনা প্রবণ হয়ে পড়ছে। এ ব্যাপারে আমি একটা ছোট চাকমা গল্প অবতারণা করলাম।

এক চাকমা শিকারী তিনি শিকারী কাজে খুবই দক্ষ ও ওস্তাদ ছিলেন। এক সময় তিনি তার এক ঝি-জামাতাকে নিয়ে শিকার করতে যান। সেইদিন দুর্ভাগ্য শিকারী মহাশয় কোন বড় শিকার পেলেন না। সেইদিন মাত্র একটা গুই সাপ একটি, পাহাড়ী কচ্ছপ (পার্বুয়া দূর) পান। শিকারী মহাশয়ের একটা বাতিক অভ্যাস ছিল। তিনি পেটুক শ্রেণীর লোক ছিলেন। এই গুই সাপটা ছিল ডিমওয়ালা (বদা পাটুয়া গুই), শিকারী মহাশয়ের ইচ্ছা তিনি গুইসাপটা নিবেন। তাই তিনি বার বার শিকার ভাগ করতেছেন মুখে মুখে “জামাইবাবু, গুইবঅ নিলে, দূরবঅ নেজ, দূরবঅ নিলেও

দুরবঅ নেজ। গুইবঅ নিলেও দুরবঅ নেজ” ইহার অর্থ এই যে, গুই সাপটা নেওয়ার ইচ্ছা হলে কচ্ছপটা নিবে। কচ্ছপটা নেওয়ার ইচ্ছা হলেও ও কচ্ছপটা নিবে। গুই সাপটা শিকারী মহাশয়ের পেতেই হবে আগাম সিদ্ধান্ত। আমাদের চাকমা ইতিহাস লেখকেরও গুইসাপটা খাওয়ার আগাম ইচ্ছার মত অনেক তথ্য যুক্তি দিয়ে তাদের আগাম সিদ্ধান্তেই শেষ রায় ও সমাপ্তি।

চাকমাদের প্রথম ইতিহাস লেখক মি. টি, এইচ, লুইন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক ছিলেন ১৮৬৬-৬৯ ও ১৮৭১-৭৪ ইং পর্য্যন্ত। তিনি এদেশে এসে পাহাড়ীদের উপকার বা অপকার যাহাই করুন না কেন, তৎকালীন চাকমা প্রধান রানী কালিন্দী রানী তার মুখ দর্শন দেন নাই এবং লুইন একবার জোর পূর্বক রাজা নগরে রাজবাড়ীতে ঢুকায় চেষ্টা করলে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অপমানে তিনি চাকমা রাজ্যটা খান খান করে ভেঙ্গে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। সম্পূর্ণ করতে না পারলেও ৩ (তিন) টা সার্কেলে ভাগ করে দিয়ে বিলাত পাড়ি জমান। সঠিকভাবে যাচাই বা না জেনেই তিনি বলেছিলেন চাকমারা মালয় থেকে এসেছেন।

চাকমা দ্বিতীয় ইতিহাস লেখক বাবু সতীশ চন্দ্র ঘোষ ১৯০৯ ইং সনে চাকমা জাতি বইটা লিখে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন কিন্তু তিনি কয়েকটা সত্য মিথ্যা কথা লিখে বা মন্তব্য করে শিক্ষিত চাকমাদের বিরাগ ভাজন হন। তিনি লিখেছেন যে, বানর যাহা খায় চাকমারা তাহা খায়। তৎকালীন সময়ের কথা বাদ দিলেও এখনও পার্বত্য চট্টগ্রামে এমন কতগুলি জঙ্গলী শাক সজী পাওয়া যায় যাহা সিদ্ধ না করে কাঁচা খেতেই বেশী স্বাদ এবং চাকমা ও পাহাড়ীরা এখনও সেই সব শাক কাঁচাও খায়। কিন্তু তার মন্তব্যটা খারাপ হয়ে যায় বান্দরের সাথে তুলনা করে। তিনি আরো মন্তব্য করেন যে, চাকমারা তাজার চেয়ে পঁচা মাছ বেশী খায়। এখনও চাকমারা খেবাং ও চুমা পদ্ধতিতে যেইটা পাক করেন ও পছন্দ করেন তাহা পচন পদ্ধতিতে পাক করে। কিন্তু সতীশ বাবু চাকমাদের খানাটা তুলনা করেন শিয়াল ও শকুনের খাওয়ার পদ্ধতির সঙ্গে। তিনি আরো বলেন যে, চাকমা মেয়েরা ৭/৮ সের ওজনের পিনন খাদি পরিধান করেন। এক জোড়া পিনন তৈয়ার করতে মাত্র সোয়া সের কালো রং এর সুতা এক পোয়া লাল রং এর সুতা, আধ পোয়া বিভিন্ন রং এর রেশম দরকার হয়। সর্ব মোট দুইসের আধ-পোয়া সুতায় একজোড়া (২টি) পিনন পাওয়া যায়। সতীশ চন্দ্র ঘোষ এত পরিশ্রম, গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ আমাদের অনেক অজানা ইতিহাস উপহার দিয়ে গেছেন কিন্তু তার কয়েকটা ভুল মন্তব্যের কারণে শিক্ষিত চাকমারা তাকে বিভিন্ন ভাবে অপমান করতে চেয়েছিলেন। আমাদের বিশিষ্ট প্রবীণ রাজনৈতিক নেতা বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান শুধু মুখে নয়, তার আত্মজীবনীতেও সতীশ চন্দ্র ঘোষকে গালিগালাজ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করতে

চেয়েছিলেন। তিনি সতীশ চন্দ্র ঘোষের প্রকাশিত ১০০০ (এক হাজার) কপি সমস্ত বহি ক্রয় করে পুড়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাই বোধ হয়, এই বহি চাকমারা ক্রয় করেন নাই। গোপনে কয়েক কপি ক্রয় করে থাকলেও সেই বহি খুবই দুষ্প্রাপ্য। আমি দাদা অনন্ত বিহারী স্বীসা প্রথম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় হেড মাস্টার (১৯৮৫ ইং সন) এর কাছ থেকে সাইক্লোস্টাইল করা সংরক্ষিত কপি পাঠ করেছি। মূল কপি দেখি নাই। ইদানীং সংগ্রহ করেছি এক কপি। সতীশ চন্দ্র ঘোষ এতগুলি ঘটনার পর পরে বোধ হয় চাকমাদের ভয়ে অন্যত্র বা কলিকাতা বদলি হয়ে যান, রাজ্যমাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে।

১৯৬৯ ইং সনে বিরাজ মোহন দেওয়ান চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত প্রকাশ করে শুধু চাকমাদের নিকট নয় তিনি ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ ও বাংলা একাডেমী থেকেও সম্মান পান। বিরাজ মোহন দেওয়ানও কিছুটা আগাম দৃষ্টিভঙ্গি ও সিদ্ধান্ত নিয়ে তার ইতিহাস রচনার সূচনা করেছিলেন বলে অনুমান করা যায়। তিনি সর্ব প্রথম চাকমাদেরকে ভারতীয় আর্থ্য সভ্যতার লোক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাই তিনি জোর গলায় চাকমাদেরকে শাক্য বংশের লোক প্রমাণের চেষ্টা করেন। তিনি ভারতের চম্পক নগর থেকে কালাবাঘা (সিলেট) ও ত্রিপুরা রাজ্য হয়ে বিজয়গিরি রাজাকে দিয়ে ধ্যাং পাহাড়ে আরাকান রাজাকে আক্রমণ করেন এবং বিজয়ী হন। তারপর আরাকানের উত্তর অঞ্চল জবর দখল করে সাপ্রাইকুলে রাজধানী স্থাপন করে চাকমা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিও পূর্ববর্তী লেখকগণের মত ক্যান্টেন লুইন, সতীশ চন্দ্র ঘোষ, রাজা ভুবন মোহন রায় ও মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী) এর ন্যায় ইতিহাস রচনায় তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদানের তীব্র অভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি সঠিকভাবে বিজয়গিরি রাজার চম্পকনগর পরিচিহ্ন করতে না পারলেও ভারত ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় স্থিত চম্পকনগরগুলির নাম ও স্থিতি নির্ণয় করতে পেরেছেন। সেইগুলির মধ্যে হয়তো একদিন আসল (মূল) চম্পকনগর উদ্ধার সম্ভব হতে পারে। বর্তমানে যারা চাকমা ইতিহাস রচনা ও চর্চা করার চেষ্টা করতেছেন, তারা সতীশ চন্দ্র ঘোষের “চাকমা জাতি” ও বিরাজ মোহন দেওয়ানের “চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত” এর বাইরে বেশী দূর অগ্রসর হতে পেরেছেন বলে আমার মনে হয় না। তাদের ডানার পাখা দিয়ে উড়ার চেষ্টা করেছেন মাত্র। পরবর্তীতে আমি বিরাজ বাবুর কয়েকটা দুর্বল জায়গায় হাত দেওয়ার চেষ্টা করবো। এমন আরো কয়েক জনের হাত গণনা করে দেখি “মহাজাতক” কি বলেন?

বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চাকমার তার চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস বইটা বার বার পড়লাম। তিনি এই বই লিখতে অনেক পরিশ্রম করেছেন। তিনি এই বই লিখতে ভারতের উত্তর প্রদেশের সীমান্ত বিহার, পশ্চিম বঙ্গ, পূর্ব বঙ্গ সীমা পেড়িয়ে বার্মার দক্ষিণ পূর্ব, দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্ত সমগ্র এলাকা পরিভ্রমণ করেছেন। পায়ে হেঁটে বা

জল-স্থল পথে নয়, হেঁটেছেন ইতিহাসের পাতায় পাতায়। তবু তিনি পূর্বসূরী চাকমা ঐতিহাসিকগণের রোগ থেকে মুক্ত হতে পারেননি। প্রায় স্থানে ও পথে পূর্ব সূরীদের সাথে মিল রেখে তিনি এক অমিল পথ বের করলেন। বিজয়গিরি রাজা ভারতের উড়িষ্যা থেকে ৬দিন ৬ রাত্রি নৌকায় দাঁড় বেয়ে সমুদ্র পথে প্রায় (১০০০) মাইল জল পথ অতিক্রম করে আরাকান রাজ্যের উত্তর সীমান্ত রাজধানী ধ্যাং পাহাড় আক্রমণ ও জয় করে নিলেন এবং চাকমা উড়িয়া (উখিয়া) রাজ্য স্থাপন করলেন সাপাইকুলে। দাদু যামিনী রঞ্জন চাকমা, প্রাক্তন ডিষ্ট্রিক্ট লাইফ স্টকস অফিসার মহোদয় আমাকে বলেছেন যে, তিনি ১৯৪২ ইং সনে ভেটেরিনারী ডিপ্লোমা ডিগ্রী পাশ করে তার মালামালগুলি স্টিমারে চট্টগ্রাম পাঠিয়ে দেন কয়লা ইঞ্জিনযুক্ত স্টিমারে। তিনি শিয়ালদহ স্টেশনে রেলে একই দিনে বিকালে চট্টগ্রাম পৌছেন। চট্টগ্রামে প্রায় দুইদিন অপেক্ষা করে তিনি স্টিমার তার মালামালগুলি পান। আমার মনে হয় জলপথে কলিকাতা থেকে চট্টগ্রাম ৪০০ (চারশত) মাইলের কম হবে না এবং উড়িষ্যা থেকে চট্টগ্রাম প্রায় ১০০০ মাইলের কম নয়। সেই ১০০০ (এক হাজার) মাইল পথ কিভাবে নৌকায় দাঁড় বেয়ে ৬ দিন ৬ রাত্রিতে অতিক্রম করলেন বিজয়গিরি রাজা আমার হিসাবে মিল হয় না। বার্মা-আরাকানে ভ্রমণের সময় ২৭ নভেম্বর ১৯৯৭ ইং সনে আমরা আরাকানের বুসিৎ থেকে আকিয়াব প্রায় ৯০ (নব্বই) মাইল পথ মাঝে ও কলাডইন নদী পথে সকাল ৭.৩০ টায় স্টিমারে রওনা দিয়ে বিকাল ৪.৩০ টায় প্রায় ৯ ঘন্টায় আকিয়াব পৌঁছি। ইহাই আমার সমুদ্রগামী জাহাজে প্রথম ভ্রমণ। সুতরাং বক্সিম বাবু ৬ দিন ৬ রাত্রিতে নৌকায় কিভাবে হাজার মাইল পথ অতিক্রম করলেন, কারো জানার কথা নয়।

বক্সিম বাবু জীবিত কালে আমি প্রায় তার কাছে যেতাম এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করতাম। আমি তার ইতিহাস বহি পৃষ্ঠা নং- ২৪৮ পাতার রাজা রদংসা ১৪১৮ খৃঃ থেকে ১৪৪৭ খৃঃ এবং কালা তংসা ১৪৪৮ খৃঃ থেকে ১৪৮৩খৃঃ পর্যন্ত চাকমা রাজা হিসাবে রাজত্ব করার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মানেকগিরি মইস্যাং রাজার মৃত্যুর পর ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা হন। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দের কিছু কাল পর আরাকান রাজার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে রদংসার মৃত্যু হয়। তাহলে আপনার বইয়ে রদংসা ও কালা থংসা কিভাবে রাজা হলেন। তার জবাব অরুণাচল প্রদেশের নিবাসী বাবু পুণ্যধন চাকমার ‘চাকমা ইতিহাস’ বহি মোতাবেক তিনি ইহা দেখিয়েছেন, তিনি নিজে কিছু জানেন না বা তার কোন গবেষণার ফসল নয়।

রাজা মানেকগিরি নিঃসন্তান অবস্থায় প্রায় ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হয়ে সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী না থাকায় মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরী রাজা হন ১৪৩৪/৩৫ খৃষ্টাব্দে। অথচ বিরাজ মোহন দেওয়ান ও বক্সিম চন্দ্র চাকমা তাদের বই এ মন্ত্রী থৈন সুরেশ্বরীকে রাজার পুত্র বানিয়ে সিংহাসনে বসান।

বঙ্কিম বাবু তার বইয়ে ১৬৫ পৃষ্ঠায় আরাকান রাজ মেনখারীর বাহিনীর সাথে ১৪৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে তিনমুড়ি গাঙের যুদ্ধে মৃত রদংসাকে যুদ্ধে হাজির করেছিলেন সেই যুদ্ধটা থৈন সুরেশ্বরী সিংহাসনে আরোহণ করার পর তৈনছড়ি মুড়িগাঙে কুলে যুদ্ধ হয়। বিরাজ মোহন দেওয়ান ও তার বই এ ১৩৮ পৃষ্ঠায় ঐ যুদ্ধের কথা ও থৈন সুরেশ্বরীর সংশ্লিষ্টতা স্বীকার করেন।

বঙ্কিম বাবু তার বই এর ২৪৯ পৃষ্ঠায় রাজা থৈন সুরেশ্বরীকে তার রাজত্বের প্রায় ৪৬ বৎসর পরে ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে (১৪৮০-১৪৩৪ = ৪৬ বৎসর) রাজ সিংহাসনে বসান অথচ রাজা থৈন সুরেশ্বরী তৈনছড়ি ছড়ার যুদ্ধের আগে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। রাজা জন্ম (২য়) ১৫৩২ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তার কন্যা সাজিষিকে (মগেরা বলেন সাজাংইয়ু) আরাকান রাজা মিনবাহীর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তার রাজনৈতিক অবস্থা দৃঢ় করেন। আরাকান রাজা মিনবাহী চাকমা রাজা জন্মর উপর সম্ভ্রষ্ট হয়ে চাকমা রাজাকে কোংহা ঞ্ (রায় বাহাদুর বা সদাশয়) খেতাব ও বিবিধ সামগ্রী উপহার দেন। সেই কোংহা ঞ্ খেতাবটিকে বঙ্কিম বাবু ৪২ নং চাকমা রাজা রূপে চিত্রিত করেন তার বইয়ে ২৪৯ পৃষ্ঠায়। এ ব্যাপারে জীবিতকালে আমি তাকে মন্তব্য করতে বললে তিনি বলেন যে, সুগত চাকমা (ননাধন বাবু) এর “মোন কথা” বইতে প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী তিনি ও জন রাজার নাম কোংহা ঞ্ সহ সংযোজন ও উপস্থাপন করেন। খেতাব তো নতুন রাজা হওয়ার কথা নয়, উপাখ্যান ও উদং হয়তো কোন উপরাজা বা সামন্ত রাজা হতে পারেন। তারা মূল কোন চাকমা রাজা নন। আমি বঙ্কিম বাবুকে তার বইয়ে রাজাদের রাজত্বকাল সম্বন্ধে মন্তব্য করতে বললে তিনি বলেন যে, অনুমান ও আন্দাজ এর উপর ভিত্তি করে তিনি রাজত্বকালগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন।

বঙ্কিম বাবু তার বইয়ের ১৭২ পৃষ্ঠায় এবং বিরাজ বাবু তার বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় রাজা জন্ম (২য়)/ কোংহা ঞ্কে ১৫৯৮/৯৯ খৃষ্টাব্দে বৃদ্ধ বয়সে আরাকানের রাজার পক্ষে প্রধান সেনাপতি পদে বরণ করে পেগু রাজ্য অভিযানে প্রেরণ করেন এবং যুদ্ধে জয়ী হয়ে পেগু রাজকুমার ও রাজকন্যাকে আরাকান রাজার হস্তে অর্পণ-এর কারণে বিশেষ সম্মান পান লিখেন। তখন পর্যন্ত রাজা জন্মর রাজত্বকাল প্রায় ৮৩ বৎসর এবং তার বয়স কত হবে? $৮৩ + ২০$ বৎসর = ১০৩ বৎসর বয়সে কি কেহ সৈন্য ও যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারে? অবশ্য বিরাজ মোহন দেওয়ান তার বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় একটা সনদ পত্র দিয়েছেন রাজা জন্ম সুদীর্ঘ কাল জীবিত থাকিয়া রাজ্য পরিচালনা করেন, কথিত আছে, তিনি একশত বৎসরের অধিকাল রাজত্ব করেন। শত বৎসর রাজত্ব করুন, আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ঐ বয়সে যুদ্ধে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার মনে হয় এখানে একটা বিরাট গড়মিল রয়েছে, রাজা থৈন সুরেশ্বরী রাজত্ব কাল থেকে। তাদের আগে বা পিছনে আরো কয়েকজন চাকমা রাজা রাজত্ব করে

থাকবেন। তাদের নামগুলি বাদ পড়ে গেছে। আমরা তাদের নামগুলি ভুলে গেছি। নামগুলি উদ্ধার করতে পারিনি। রাজা সের মুস্ত খাঁ ও রাজা সের দৌলত খাঁ এর মাঝখানে রাজা সের জব্বর খাঁ এর নামটা বাদ পড়ে গিয়েছিল। প্রায় ২৩৩ বৎসর পর ডঃ সিরাজ উদ্দীন সাহেব আমাদের হারানো রাজাকে উদ্ধার করেন ১৯৬৩-৬৪ ইং সনে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা করার সময় এবং তাহা প্রকাশ করেন অশোক কুমার দেওয়ান ১৯৯১-৯৩ ইং সনে।

এভাবে রদংসা, কালা খংজা, উপাখ্যান, উদয় ও কোংহলা প্রু এর নাম রাজার তালিকা থেকে বাদ যাবে। রাজা জনুর মৃত্যুর পর তার বড় জামাই ও সেনাপতি বুড়া বরবুয়া (ভুত্ৰস্যা) কিছুদিন রাজত্ব করেন। বুড়া বরবুয়ার মৃত্যুর পর তার পুত্র সান্ত্বুয়া বা সাথোয়াই দৌহিত্র সূত্রে রাজা হন।

বাবু সুপ্রিয় তালুকদার-এর গবেষণা ও চাকমা ইতিহাস রচনা খুবই স্বাচ্ছন্দ্য ও আকর্ষণীয়। তিনি মনে প্রাণে উৎসাহের সহিত তার চম্পকনগর অনুসন্ধানে বইটা রচনা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চম্পকনগরের সন্ধান দিতে পারেননি বা মূল চম্পকনগর চিহ্নিত করতে পারেন নাই। দ্বিতীয়তঃ তিনি পূর্ব-সুরীদের রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তারও আগাম ধারণা ও সিদ্ধান্তটাই তার ইতিহাস লিখা আরম্ভ ও সমাপ্ত। আমাদের চাকমা ইতিহাসবিদদের আগে ঔষধ সেবন, তারপর রোগ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা আমাদের ইতিহাস রচনা করতে ঐতিহাসিক উপাত্ত তথ্য ও উপাদানের খুবই অভাব, তার মধ্যেও যদি উল্টা-পাল্টা সময়ের অসামঞ্জস্য নিয়ে অনুমানের উপর সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তাহা ইতিহাস না হয়ে উপাখ্যানই হবে।

ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ নীহার রঞ্জন দত্ত ও বাবু সুপ্রিয় তালুকদার এর বদ্ধমূল ধারণা ও আগাম সিদ্ধান্ত চাকমারা থাইল্যান্ডের লোক। আপনি আসাম, মেঘালয় ভ্রমণ করতে গেলে সেই ভুল ধরা পড়বে যদি আপনি চাকমা হন। আপনি আসামের জোর হাট, গৌহাটী, বড়পেটা (একটা জায়গা) যে কোন রেল স্টেশনে বসে আছেন, ঠিক আপনার মত চেহারা একজন লোক আপনার পাশে এসে দাঁড়ালেন। আপনি জিজ্ঞেস করলেন “ভেই কেনজান আগজ? কুদু য়েবে? (ভাই কেমন আছেন, কোথায় যাবেন) লোকটা কিছুই বুঝলেন না, ফ্যাল ফ্যাল (হাঁ) করে আপনার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে চাকমা নয়, সে হয়তো নাগা, মনিপুরী ও খামতি। থাইল্যান্ডের লোকের সাথে আমাদের চেহারা মিল থাকতে পারে। দুই একটা শব্দও মিল থাকতে পারে। তাই বলে আগাম সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে না। আমরা চাকমারা থাই এর লোক হতে পারি শুণ্ড যুগে ও তার সমসাময়িক আমলে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার থাই, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ভারত সাম্রাজ্যের উপনিবেশ ছিল বেশ কয়েক শত বৎসর ধরে। ঐ দেশ সমূহের উপর ভারতীয় সভ্যতা কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। তাই ভাষাগত হয়তো ২/৪ টা বা কয়েকটা শব্দের চাকমা, মার্মা বা

কোন ভারতীয় জাতি উপজাতির ভাষার সঙ্গে মিল থাকতে পারে। তাই বলে একই জাতি হবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে উপরোক্ত গবেষকরা চাকমাদেরকে থাইবাসী ঘোষণা করতে চান। আরো এগিয়ে যান, ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করুন। আমাদের চাকমারা থাই, বার্মা, আরাকানিজ বা কম্বোডিয়ান জাতি হতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু প্রমাণ প্রয়োজন।

সুপ্রিয় বাবুর বই এ আরো একটা অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব সূরী প্রায় সকল ঐতিহাসিকগণ মুলিমা গবা ধাবানা গুন্তি চাকমা রাজা ধাবানা-এর কথা ও রাজত্ব খুবই উজ্জ্বল ভাবে বর্ণনা ও উল্লেখ করেছেন। এই বংশে ১৪ (চৌদ্দ) জন চাকমা রাজা ধাবানা থেকে ধরম বক্স খাঁ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সুপ্রিয় বাবুর বইয়ে সেই স্বনামধন্য ধাবানা রাজার অস্তিত্বও পাওয়া গেল না। আমি বঙ্কিম বাবুর কয়েক জন চাকমা রাজার নাম বাদ দিতে প্রস্তাব করেছি এবং উহার কারণও বর্ণনা করেছি। সুপ্রিয় বাবু ধাবানা রাজার সম্বন্ধে কিছু বলেননি। ধাবানা রাজার সিংহাসনে আরোহণ তো একটা বিরাট ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চাকমা রাজাদের ঐতিহাসিক গতি সৃষ্টি।

প্রয়াত অশোক কুমার দেওয়ান তার “চাকমা জাতি ইতিহাস বিচার” বহিতে চাকমাদের সম্মান উন্নত বা ম্লান করতে কয়েকটা মন্তব্য করেন, যাহা সঠিক নয় বলে বাবু বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা তার বই- এ প্রতিবাদ করেছেন। অশোক বাবু বলেছেন (১) চাকমারা চিরকাল সমভূমি বাঙ্গালীদের থেকে দূরে পার্বত্য ভূমিতে বসবাস করে আসছেন (২) চাকমারা ছিল বরাবরই জুম কৃষিজীবী (৩) চাকমা রাজা ছিলেন চিরকালই নরপতি ভূ-পতি নয়।

দেওয়ান বাবুর অজানা ছিল না যে, চাকমারা বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে বাংলার ভূমিতে এসে প্রায় পৌনে ৬০০ শত বৎসরের অধিক কাল ধারাবাহিকভাবে বসবাস করে আসতেছেন। বার্মা-আরাকানে চাকমাদের প্রধান জীবিকা সঠিকভাবে জানা না থাকলেও বঙ্গভূমিতে এসে সুদূর কক্সবাজার রামু থেকে আরম্ভ করে সুখ বিলাস, পদুয়া, শিলক, রান্ধুনিয়া, রাউজান, প্রভৃতি স্থানে যেই সমস্ত জায়গায় জমি আবাদ করেছেন। সেই নামগুলি এখনও লুপ্ত হয় নাই। রামু-কক্সবাজার এলাকায় রাজার বিল, পাগল বিল, ধামাই বিল, চাকমার কুল, রাজার কুল প্রধান এবং রান্ধুনিয়াই- গোঁঞই বিল, বগা বিল, সোনাইছড়ি বিল, দক্ষিণ রান্ধুনিয়াই-সুখ-বিলাস, পদুয়া বিল চাকমারাই আবাদ করেছিলেন। বাঙ্গালী ও ব্রিটিশ সরকারের ষড়যন্ত্রে চাকমারা ঐ অঞ্চল ত্যাগ করেন মাত্র সেদিন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। এখনও দেড় শত বৎসরের অধিক হয় নাই। পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করে কর্ণফুলী ভেলীতে মগবান বিল, বালুখালি বিল, সিনালা বিল, রাজামাটি বিল, ঝগড়াবিল, পদ্মবিল, হাজারীবাগ বিল, আবাদ করেন এবং চেন্সি ভেলীতে ছয়কুড়ি বিল, মাইসছড়ি বিল, বড়াদম বিল, মহাপ্রশম বিল, কৃষ্ণমাছড়া বিল প্রভৃতি চাকমারা আবাদ করেন।

কামিনী মোহন দেওয়ানের আত্মজীবনীতে দেখা যায় তার পিতা ত্রিলোচন দেওয়ান ২০০০ (দুই হাজার) একর ধান্য জমি আবাদ করেন। মহালছড়ি এলাকায় রাজচন্দ্র দেওয়ান- এর মুবাছড়ি সিনালা বিলে কয়েক হাজার একর লট (জমিদারী) জমি ছিল (আবাদী)। তবে বাঙ্গালীরা কৃষি কাজে চাকমাদের চেয়ে দক্ষ ছিল। তাহা স্বীকার করতেই হবে। সাধারণতঃ চাকমারা নদীর কূলে বসবাস করেন বলে আরাকানিজ ঐতিহাসিকরা ও ফেইরী, লুইন চাকমাদেরকে খ্যাংখা বা নদীর সন্তান বা নদীর কূলে বসবাসকারী জাতি বলে মন্তব্য করেন।

চাকমারা বাঙ্গালীর এত কাছাকাছি যে আরাকানি ইতিহাস ও চাকমা বিজকে দেখা যায় সম্মিলিত চাকমা বাঙ্গালী কয়েকবার আরাকান রাজার সাথে যুদ্ধ করেন এবং একজন চাকমা সেনাপতির নাম বাঙ্গালী সর্দার। তিনি আরাকান থেকে বাংলাদেশে এসে অস্ত্র শিক্ষা করেন। পরে তিনি চাকমা রাজকন্যাকে বিয়ে করেন ও রাজা হন। আদিকাল থেকে চাকমারা এত বাঙ্গালী ঘেষা যে, অদূর ভবিষ্যতে বড়ুাদের মত হয়তো হয়ে যেতে পারে।

অশোক বাবু জ্ঞানী ও বিদ্বান লোক। তাকে অসম্মান করা আমাদের লক্ষ্য নয়। তবে তার ভুলগুলির জন্য তাকে সমালোচনা করতেই হবে। যেই সব রাজা ভূপতি বা নরপতি তার কিছুটা হলেও সার্বভৌমত্ব থাকতেই হবে মুদ্রা প্রচলন করতে গেলে। ইতিমধ্যে আমরা কালিন্দী রানী আমল পর্য্যন্ত (১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ) ৭ (সাত) টি চাকমা রাজার সীল মোহর দেখতে পাই, যাহা চাকমা রাজার সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করে (বিরাজ মোহন দেওয়ানের চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ১৯৬৯ খৃঃ এর ২৯৬ পৃষ্ঠা)। হয়তো আরো অনেক সীল মোহর ছিল। সংরক্ষণের অভাবে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ডঃ সুনীতি ভূষণ কানুনগো, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর বহি "History of Chittagong" ও "Chakma Resistance to British Domination" উভয় বহিতে চাকমা রাজার সার্বভৌমত্ব ছিল বলে স্বীকার করা হয়েছে এবং তার বহিতে ১৭৭৭ ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে বৃটিশের সাথে চাকমা রাজার যুদ্ধের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। উভয়ে যুদ্ধে চাকমা রাজা জয়ী হন বলে উল্লেখ আছে। বিরাজ বাবুর বইয়েও তাহা বর্ণনা আছে যাহা ক্যাপ্টেন লুইন তার বইয়ে স্বীকার করেছেন। যেই রাজার মুদ্রার প্রচলন আছে, বৃটিশ বাহিনীকে পরাজয় করতে পারে তাকে ভূপতি, নরপতি এবং রাজা সবই বলা যায়।

দেওয়ান অশোক কুমার আরো বলেছেন চাকমা জাতির ইতিবৃত্তকারগণের এতদিনের পথ চলা সবটাই ভ্রান্ত, সবটাই নিষ্ফল- ইহা একটা অতিরিক্ত Challenging উক্তি। চম্পকনগরের ইতিহাস বা তার পূর্ববর্তী ইতিহাস কিছুটা বিতর্কিত ও অস্পষ্ট হলেও বার্মা-আরাকানের চাকমা রাজাদের কথা ইতিহাস খুললেই

পথে ঘাটে বইয়ের পাতায় পাতায় সমস্ত তথ্য প্রমাণ ও সাক্ষ্যগুলি পাওয়া যায় যা অস্বীকার করার উপায় নাই। তার পর বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে বঙ্গভূমিতে চাকমাদের বসবাস ও ইতিহাস প্রায় পৌনে ছয় শত বৎসরের অধিক জ্বলন্ত ইতিহাস ইতিহাসবিদরা স্বীকার করেই নিয়েছেন তাহার আর প্রমাণ করার প্রয়োজন পড়ে না। বার্মা-আরাকানেও চাকমারা আদিবাসী নন। দেশান্তর, রাজ্যজয় বা যে কোন কারণে তারা বার্মা-আরাকানে এসে বসতি স্থাপন করেন। আদিকালে বার্মা-আরাকানে নব বসতিকারী চাকমারা কোথা থেকে এসেছেন, তাহা প্রমাণিত হলে আদি আবাসস্থল চম্পকনগর চিহ্নিত ও উদ্ধার হবে। তারপর প্রমাণ হবে চাকমারা ভারতীয় মঙ্গোলীয় শাখা, তিব্বতীয়, চীন তিব্বতীয় অথবা বার্মিজ, আরাকানিজ, শ্যামী, মালয় বা কম্বোডিয়ার কোথাকার অধিবাসী? ইহার জন্য বার্মা-আরাকানের সম্পূর্ণ ইতিহাস অতীত ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস মছন করতে হবে- স্থানে স্থানে, প্রতি পর্বত-বন্দরে, নদী-নালায়, সমুদ্র পথে। এভাবে চাকমাদের হারানো ইতিহাস, স্মৃতি, চম্পকনগর, বিজয়গিরি রাজার জন্মভূমি ইতিহাসের পাতায় উঠে আসবে। ইহার জন্য প্রজন্ম ও নব্য বুদ্ধিজীবীদের আত্ম-ত্যাগ, শ্রম ও অর্থ দান করতে হবে। দেওয়ান বাবু আমাদের শুধু হতাশার সুর শুনিয়ে গেছেন।

বাবু সুগত চাকমা তার ‘চাকমা পরিচিতি’ তে চাকদের বা চাক জাতি সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন যে, ‘চাকমাদের সাথে চাকদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ ব্যবস্থা ইত্যাদিতে এক বিন্দুও মিল নাই’। ইহার অর্থ চাকরা চাকমা নন। বঙ্কিম বাবু ইহার প্রতিবাদ করেছেন এবং কয়েকটি চাকমা ও চাক ভাষার সম উচ্চারিত শব্দ দ্বারা দৃঢ়ভাবে চাকদের চাকমা বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। আমার মনে হয়, চাকদের চাকমাদের থেকে বহিষ্কার করা, বাদ দেওয়া বা গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাদের পিতা রেংজ ও আমাদের পিতা বা রাজা ইয়ংজ একই চেহারা, একই বর্ণ জন্মস্থান মৈইনজাগিরি, মিছাগিরি একই নদীর কূলে অবস্থিত, জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনী একই নাটক। আমরা যদি পৃথক জাতি হয়ে থাকি, হয়তো আমরা মিথ্যা কথা বলতেছি। নতুবা তারা, হয়তো তারা আমাদের ইতিহাস চুরি করেছেন, নতুবা আমরা। একই জাতি হলে উভয়ে অপরাধ থেকে মুক্ত। ত্রিপুরাদের দেব বর্মনারা বাঙ্গালী হয়ে গেছেন। রিয়াং, জামাটিয়া, উসুইরা এখন পাহাড়ী। পরস্পর কথা বুঝাবুঝি নাই। চাকরা মগের কাছাকাছি, চাকমারা বাঙ্গালীর কাছাকাছি। অতীতকে হারিয়ে হয়তো চেনা-চিনি হচ্ছে না। এ ব্যাপারে আমারও অনেক প্রশ্ন- যেই প্রশ্নের উত্তর এখনও পায়নি। ২৬শে নভেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখ আরাকানের পথে বসিতং ট্রান্সিট ক্যাম্পে দৈন্যাক চাকমা মংহলাএহি (চাকমা) এর সাথে কথা হলে তিনি বললেন যে, আরাকানে দাঙর দাঙর চাক-পাড়া/আদাম আগে, তারা চাকমা নয়। আকিয়াব যাদুঘরে সংরক্ষিত চাক জাতি নাই। শুধু “থেক বা সেক” এরা আছে যারা চাকমা প্রমাণিত। চট্টগ্রামের বাঙ্গালীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতিদের চাকমা,

মার্মা, ত্রিপুরা, লুসাই, সকলকে ‘জুম্ম’ বলে থাকেন। বার্মা-আরাকানেও উপজাতিদের থেক/সেক/চাক বলা হয় বলে জানা গেছে। সুতরাং সরেজমিনে ইতিহাস পরীক্ষা না করলে তাহা রায় দেওয়া কঠিন হবে।

এখানে এ ব্যাপারে আর একটা আশ্চর্য্য সত্য ঘটনা বলি। আমরা বুদ্ধিষ্ট ডেলিগেইটরা ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ ইং তারিখ আরাকানের সুদূর অভ্যন্তরে শ্রোহং ব্রাউক (পাথরী কিল্লা) শহরে লঞ্চে চলে যাই। সেখানে আমরা ৩ দিন অবস্থান করি এবং আরাকান রাজ্যের প্রাচীন রাজ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, চান্দা-সুরিয়া রাজ্যের প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও চৈত্য দর্শন করি। ঐ সময়ে একদিন আমরা গাড়ীতে ভ্রমণ করার সময় সকাল বেলা চা-নাস্তা খাওয়ার জন্য এক জায়গায় নেমে পড়ি। তথায় আমি রাস্তায় দাঁড়ালে এক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করেন বাংলায়- ‘দাদা, আপনি কি চাকমা? আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম- এই বাংলাভাষী লোকটি কে? আমি উত্তর দিলাম ‘হ্যাঁ’ আমি চাকমা, দেশ ভ্রমণে এসেছি। “আপনি কে?” জিজ্ঞেস করায় তিনি বললেন যে, তিনি চাক, নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) থেকে সপরিবারে এখানে এসেছেন। এখানে বহু চাক বসবাস করেন।

তঞ্চঙ্গ্যারাই নাকি আসল চাকমা, আদিতে তঞ্চঙ্গ্যারাই চাকমা রাজ্যের আসল/মূল দল বা প্রজা। চাকমারা দূরের দল তারা আনক্যা চাকমা। কর্নেল ফেইরী ও ক্যান্টেন টি এইচ লুইনের রিপোর্টের আগে, তঞ্চঙ্গ্যা বলে কোন গ্রুপ বা দলের অস্তিত্ব ছিল না। সকলেই থেক/সেক বা সাক রূপে পরিচিত ছিল। বার্মা-আরাকান ত্যাগের পর বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করে এই থেক/সাক-এরা নতুন জায়গায় বিভিন্ন এলাকায় বসতি স্থাপন করেন। রাজা ও অন্যান্যরা এলাকা ভিত্তিক পরিচয় জানার জন্য দল বা এলাকা ভিত্তিক পরিচয় দিতে থাকেন। যেমন বর্তমানেও বিশেষ পরিচয় না থাকলে আমরা ঠেগা কুল্যা, সলক (সুবলং) কুল্যা, ফেনী কুল্যা, চেক্সি কুল্যা, মাইনি কুল্যা, বরগাং কুল্যা (কর্ণফুলী ভেলী) বলে পরিচয় দিয়ে থাকি। এভাবে যে সব থেক/সাক পাহাড়ী এলাকায় বা তৈনছড়ি উজান এলাকায় বসবাস বা জুম-চাষ করতেন তাদেরকে তৈনছড়ি কুল্যা বা টুনচংগ্যা বা তঞ্চঙ্গ্যা বলা আরম্ভ হয়। যারা লামা এলাকায় বসবাস করেন তাদের লামা কুল্যা বা লামা গঝা বলা আরম্ভ হয়। যারা কুরা আঙুট্যা ছড়ায় বসবাস, তাদেরকে কুরা-আঙুট্যা ছড়া কুল্যা বা সংক্ষেপে কুরাকুট্যা বলা আরম্ভ হয়। এভাবে সাধারণত বার্মা-আরাকান ত্যাগ করে সেক/সাকরা গঝা বা গছা সৃষ্টি করে নিজের পরিচয় দিতে থাকেন রাজ-বাড়ীতে বা অন্যান্য জনের নিকট। পরবর্তীতে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গঝা বা গছায় গুপ্তিতে (গোত্রে) বিভক্ত হন। তঞ্চঙ্গ্যারা গঝায় ১২ (বার) গুপ্তিতে ধামাই গঝারা প্রায় ২০ (বিশ) গুপ্তিতে বিভক্ত হন। এভাবে অন্যান্য গঝারা বিভক্ত হন। শ্রদ্ধেয় রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরো, বিহারাদ্যক্ষ রাজ-বিহার রাজ্যমাটি, কথার ছলে প্রায় তিনি আমা-চাকমাগুন বলে গর্ব

করেন, চাকমাদের গৌরব গাথা বর্ণনা করেন। তিনি কখনও তঞ্চঙ্গ্যা বলেন না, যদিও তিনি তঞ্চঙ্গ্যা। তিনি তঞ্চঙ্গ্যাদের জাত বা জাতি বলেন না, তঞ্চঙ্গ্যা একটা গঝা বা গছা মাত্র। কাণ্ডাই বা চন্দ্রঘোনা থানার ওয়াল্লা মৌজা হেডম্যান প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য বাবু পরিমল চন্দ্র তালুকদার বলেন যে, তার ঠাকুর দাদা ১৯০০ ইং সনে বৃটিশ সরকার তালুক প্রথা রহিত করে ‘মৌজা’ প্রথা চালু করলে তার ঠাকুর দাদা ওয়াল্লা মৌজার হেডম্যান নিযুক্ত হন। তিনি একজন প্রভাবশালী তালুকদার, হেডম্যান ও সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তার মৌজায় বহু প্রজা ছিলেন। প্রতি বৎসর হেডম্যানকে রাজবাড়ীতে ও ডিসি কার্যালয়ে “জুম-তৌজী” কারেন্ট (বর্তমান) ও বকেয়া দাখিল করতে হয়। সে সময় চাকমারা “আনক্যা-চাকমা” ও “তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা” নামে পরিচিত ছিল। আনক্যা চাকমারা তখন গোয়ার গবিন্দ ছিল। যথা সময়ে জুম-খাজানা বা বকেয়া খাজানা পরিশোধ করতেন না ফলে হেডম্যান বকেয়া জুম তৌজী দাখিলে অসুবিধায় পড়তেন মানুষ চিহ্নিত করতে। তাই, তিনি জুম তৌজীতে আনক্যা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা ভাগ করে রাজ কার্যালয়ে দাখিল করতেন। তার আগে চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা মুখে মুখে ভাগ থাকলেও লিখিত ভাগ ছিল না। পরবর্তীতে নামের শেষ চাকমারা আনক্যা বাদ দেন এবং তঞ্চঙ্গ্যারা চাকমা বাদ দেন। এভাবে একই থেক/সাক চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা ভাগ হয়ে যায় বলে হেডম্যান পরিমল চন্দ্র তালুকদার এর মতামত ও ভাষ্য। এখনও কতিপয় তঞ্চঙ্গ্যা, তঞ্চঙ্গ্যা না লিখে চাকমা লিখেন। উখিয়া, টেকনাফ, ওয়াকগং এর দৈহ্নাকরা চাকমা লিখেন। আরাকানের দৈহ্নাকরা কিছুই লিখেন না, সেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে ‘পদবী’ লিখা নিষেধ। দৈহ্নাকরা নিজেদের চাকমা বলে পরিচয় দেন।

বড়ুয়ারা অনেকে কয়েকজন চাকমা রাজা বড়ুয়া গোষ্ঠীর লোক বলে দাবী করেন। ঘটনাটি কিন্তু সত্য নয়। চাকমা ইতিহাসবিদরা, চাকমা ইতিহাস লেখকেরা নামের বিভ্রাট ও উচ্চারণের পদ্ধতি না বুঝার বা না জানায় বড়ুয়া ও চাকমা রাজা বুড়া বরবুয়ার নামের কারণে বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন। বড়ুয়ারা নিজেরাই ‘বড়ুয়া’ অর্থ করেন এইভাবে বড়+উয়া অর্থ বড়+আর্য্য বা পূজনীয় তাই বড়+উয়া অপভ্রংশ হয়ে ‘বড়ুয়া’ শব্দের উৎপত্তির বা বড়ুয়া জাতি। চাকমার কথায় বরবুয়া অর্থ জ্যেষ্ঠ Elder চিকননুয়া অর্থ হয় কনিষ্ঠ Younger। রাজা বুড়া বড়বুয়া বা বর্বোয়া কোন বড়ুয়ার ছেলে ছিলেন না। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। তাই, তার পিতা-মাতা তাকে বুড়া বরবুয়া বা বুড়া বর্বোয়া বলতেন। চাকমারা বড় ছেলেকে আদর করে শুধু ‘বুড়ুং’ (বড়+অং) ও বলে থাকেন এবং কনিষ্ঠ ছেলেকে চিকননুয়া বলে থাকেন। বুড়া বর্বোয়া কোন রাজার ছেলেও নন। তিনি রাজার বড় জামাতা, চাকমা রাজা জন্ম (২য়) এর কোন পুত্র সন্তান ছিল না। দুই কন্যা (১) রাজেশ্বি স্বামী বুড়া বর্বোয়া ও (২) সাজেশ্বি

স্বামী আরাকান রাজা মিনবাথী। রাজা জনুর মৃত্যুর পর তিনি বুড়া বর্বোয়া রাজা হন। রাজা বুড়া বর্বোয়াকে বড়ুয়া বলার অনেক ইতিহাসবিদ সংশয় প্রকাশ করেছেন এবং অনেকে তাহা মেনে নিতে পারেননি। রাজা বুড়া বর্বোয়া কোন বড়ুয়ার ছেলে ছিলেন না। তিনি পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন। তাই তার পিতা মাতা তাকে বুড়া বরবুয়া বা বুড়া বর্বোয়া বলতো। আগর শাস্ত্রী আঙু ফুলচান কার্কারী তার ইতিহাস ‘স্বধর্ম পথে’ বহিতে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে, বর্বোয়া শব্দটি বড়ুয়া রূপান্তর চাকমা অর্থে অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন। বড়ুয়া চাকমা ভাষায় কোন শব্দ বা অর্থ নাই। বরবুয়া অর্থ জ্যেষ্ঠ বা বড় গুণ বাচক। জাতি বাচক শব্দ নহে।

কোন কোন লেখক চন্দন খাঁন (১৭১১ খৃষ্টাব্দে) ও রতন খান কে (১৭১২ খৃষ্টাব্দে) চাকমা রাজগদীতে বসিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন এবং তারা এই রাজা আরাকান রাজ কর্তৃক নিযুক্ত ও স্বীকৃত বলে মন্তব্য করেছেন। চন্দন খান ও রতন খান কার ছেলে প্রথম সমস্যা। যদি তারা রাজা সান্তোয়া/সান্তোয়া (পাগলা রাজা) এর ছেলে হয়, রাজা ভুবন মোহন রায় এর চাকমা রাজ পরিবার এর মোতাবেক পিতার সাথে তাদেরকে হত্যা করা হয় (পৃষ্ঠা- ৩২)। যদি তারা পলায়ন করে প্রাণ রক্ষা করেন। সাথোয়া পাগলা রাজাকে ১৬৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দে হত্যা করা হয়। তাহলে সান্তোয়ার ছেলে (১৭১১-১৬৩৮ = ৭৩) আরো ৭৩ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকার সম্ভব নয়। বেঁচে থাকলে ও সুযোগ্য শাসক ও রাজা ধাবানা রাজ বংশের কাছে আসা বা তাদের থেকে সিংহাসন দখল করা সম্ভব নয়। আরাকান রাজ কর্তৃক স্বীকৃতি পেলেও জনগণ (মূল) তাদেরকে রাজা রূপে মেনে নেননি। যেমন ইয়াছির আরাকাত জাতি সংঘ কর্তৃক স্বীকৃত ও তার মন্ত্রী সভা কর্তৃক সরকার পরিচালিত, তবু তার পেলেটাইন রাজ্য এখনও বাস্তবে নেই। চন্দন খাঁন ও রতন খাঁন এর ভাগ্যেও এরূপ হতে পারে। তারা চাকমা রাজা নন।

চাকমাদের মুখে মুখে চাকমা রাজার ছেলে বা চাকমা রাজা মুসলমান মেয়ে বিবাহ করেছেন। সাধারণতঃ মুসলমান পুরুষ বা মেয়ে যাকে বিবাহ করবেন সে মুসলমান হয়ে যাবেন। চাকমা রাজা বা রাজার ছেলে বলে তাকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হতে হয়নি। তবে কয়েকটা শর্ত পালন সাপেক্ষে মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেন। অনেকগুলি শর্তের মধ্যে মৃত্যু হলে পোড়ানো যাবে না। কবর দিতে হবে। কবরের পশ্চিম দিকে মাথা রাখতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। অন্য কেহ চাকমা রাজা মুসলমান মেয়ে বিয়ে করেছেন কিনা জানি না, ইতিহাস পর্যালোচনা করে পাওয়া গেল যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে ধাবানা রাজার রাজপুত্র ধরম্যা মুসলমান মেয়ে বিবাহ করেছেন, সম্ভবতঃ উপরোক্ত শর্তগুলি পালন করে। কার মেয়ে বিবাহ করেছেন ইতিহাসবিদ উল্লেখ করেননি। তবু কয়েকজন লেখক লোভ সম্ভরণ করতে না পেরে মুসলমান রাজ পুরুষ সুজাউদ্দীল্লার কন্যার সাথে ধরম্যা বিয়ে দেন এবং তৎ ঔরসে

পুত্রের নাম মোগল্যা রাখেন। আর একজন লেখক বাংলার নবাব শাহ সূজার কন্যা গোল রোখ বানুর (নামটি পর্যাঙ্ক উল্লেখ করলেন) সাথে চাকমা রাজপুত্র ধরম্যার সাথে বিবাহ দিয়ে দিলেন এবং নাতিও একজন পেয়ে নাম রাখা হয় 'মোগল্যা'। মোগল বংশের নাতি। এ ব্যাপারে ছাত্র জীবন থেকে কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনার উপর আমার দারুণ আকর্ষণ ও নজর ছিল, সত্য ঘটনা উদ্ঘাটন করতে। তৎমধ্যে (১) নুর জাহান ও সম্রাট জাহাঙ্গীর এর প্রেম ও মিলন, (২) মেবারের রানী পদ্মিনী ও বাদশা আলাউদ্দিন এর ঘটনা (৩) চাকমা রাজপুত্র ধরম্যার সঙ্গে মুসলমান মেয়ে বিয়ে। ১নং ও ২নং ঘটনা কলেজে অধ্যয়ন করার সময় সমাধান পেয়েছি কিন্তু ৩নং ঘটনাটি দীর্ঘদিন আমার মনের উপর চেপে রইল। প্রায় চাকমা ইতিহাস বিষয়ক বহিঃগুলি পাঠ করে সমাধান পাইনি। এখন সমাধান দেখুন (Ref : History of Burma By Lt. General Sir Arthur P. Phayre 1883 Chapter- XVIII, Page- 178-179.) থেকে উদ্ধৃত করা হলো;

In 1652 Sanda Thudamma succeeded to the throne of Arakan. In his reign Shah Shuja fled into Arakan. The sad fate of this prince and his wife and children, has excited deep compassion.----- He engaged in war with his brothers, he was defeated by Mir Jumla, the general of Aurungzeb. Despairing of mercy from his brother, he sent his son to demand an asylum from the king of Arakan, and permission to embark for Mecca. The reply was satisfactory, and the prince with his retinue, together with his wife, sons and three daughters, proceeded from Dacca to a port on the river Megna, where they embarked in galleys.----- They travelled through a difficult country to the Naaf river; crossing which they entered Arakan, and arrived at the capital about the end of the year 1660. The prince was well received.----- The king, desirous no doubt to have a specious cause of quarrel, basely required the prince to give him in marriage one of his daughters. This demand was indignantly refused, and the king openly showed his resentment. Shah Shuja, foreseeing that force would be used, endeavoured to excite a rising in his favour among the Muhammadan population of the country. He made an attempt with his followers to seize the palace, which failed. He was then attacked by king's soldiers at his

residence and fled to the hills, but taken to prisoner, and forthwith put into sack and drowned. His sons were put to death, his wife and two of his daughters committed suicide. The remaining daughter was brought into palace, where from grief she died.

চাকমা সমাজে প্রবল জনশ্রুতি রয়েছে বা রাজা ধরম্যা কোন এক সম্রাট মোগল রমণীর পাণি গ্রহণ করেন এবং ঐ মোগল রমণীর গর্ভে রাজপুত্র মোগল্যা জন্ম গ্রহণ করেন। উপরোক্ত রিপোর্টে পরিষ্কার। শাহ সুজার মেয়ে নয়, অন্য কোন মোগল শাসন কর্তার মেয়ে ধরম্যা বিবাহ করে থাকবেন।

চাকমাদের ইতিহাস ছোট-বড় সংক্ষেপ ও বিস্তৃত প্রায় দুই ডজনের মত লেখক ইতিহাসবিদ ও গবেষক লিখালিখি ও বই প্রকাশ করেছেন, তবু বিজয়গিরি রাজার জন্মভূমি চম্পকনগর দেখে-দেখে দেখা যায় উদ্ধার করা এখনও সম্ভব হয়নি। আমার মনে হয় তারা প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছেন। টাগা-কাবা, জুম-কাবা প্রায় শেষ, শুধু জুমে আগুন দিয়ে ধান রোপন করে দিতে পারলে ফসল এসে যাবে। আশা করি, নবপ্রজন্ম বুদ্ধিজীবীরা উদ্ধার করবেন। আমরা প্রবীণরা চলে যাবার সময় হয়েছে। অনেকে প্রায় চলে গেছেন। আমার বয়সও সত্তর বৎসর পাড় হয়ে গেছে। তাই, আমিও ইতিহাসের কাছে আত্মসমর্পণ করলাম। চাকমাদের অতীত যুগ ও আরাকানী যুগ বাদ দিয়ে শুধু বঙ্গ-ভূমিতে চাকমাদের ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত দুই খণ্ডে (১) মুলিমা গঝা ধাবানা গুপ্তি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল (১৬০০-১৮৩২ খৃষ্টাব্দ) ও (২) চাকমা রাজ পরিবার (ওয়াংসা গঝা কালা কাঙারা গুপ্তি চাকমা রাজা ও রাজত্ব কাল ১৮৭৪-২০০০ ইং) সংক্ষিপ্ত ভাবে রচনা করে বুদ্ধিজীবীদের হাতে দিয়ে গেলাম। ভাল-মন্দ বিচার তাদের হাতে, পাঠকের হাতে রইল। আমরা এ রচনা ও তথ্যাবলী যদি চাকমা ইতিহাস উদ্ধারে কিছুটা সহায়ক হয়, আমার এতদিনের পরিশ্রম সার্থক হবে মনে করবো।

তারিখ : আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম
১৫ আগষ্ট/০৪

গ্রন্থকার
কুমুদ বিকাশ চাকমা।

দ্বিতীয় অধ্যায় চাকমাদের বার্মা-আরাকান ত্যাগের পটভূমি

উত্থান-পতন যেন কোন জাতির ইতিহাস ও বাস্তবতা। পৃথিবীর ইতিহাসে বহু বড় বড় জাতির উত্থান হয়েছে এবং পতনও হয়েছে। বহু বড় বড় জাতির অস্তিত্ব এখন আর পৃথিবীতে খুঁজে পাবেন না, ইতিহাসের পাতায় ব্যতীত। তাদের রেখে যাওয়া শিল্প, শিলালিপি, মুদ্রা, ভাস্কর্য্য প্রভৃতি এখন যাদুঘরেই স্থান পেয়েছে, সেই জাতির অস্তিত্ব আর পৃথিবীতে নেই। বড় হউক ছোট হউক কোন কোন জাতির অস্তিত্ব এখনও বিলিয়মান অবস্থায় বর্তমান। জাতির সূর্য্য প্রায় অস্তায়মান ডুবু ডুবু। বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বসবাসরত চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের জাতীয় ইতিহাস, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিলিয়মান প্রায় অস্তাগত। আর একটু সময় হলেই ঘোর অন্ধকার নেমে আসবে। তখন কেহ কাহাকেও চিনার, বুঝার উপায় থাকবেনা, তাদের জাতীয় অস্তিত্বও খুঁজে পাবেন না। সেই ইতিহাস থাকতেও পারে, না থাকলেও কেহ কোন অনুযোগ করবেন না। যেভাবে চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যাদের আদি বাসস্থানটুকু চম্পকনগর, বিজয়গিরি রাজার জন্ম ভূমিটা হারিয়ে গেল। শতাধিক বৎসর অনুসন্ধানেও তারা এখনও খুঁজে পায়নি, উদ্ধার করতে পারেননি তাদের জন্মস্থান। ইতিহাসের গতি প্রবাহে চাকমা তঞ্চঙ্গ্যারা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব ভারতীয় রাজ্য সমূহে বার্মা-আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস ও নিষ্কিণ হচ্ছে দূর-দূরান্তে। অতি নিকট ভবিষ্যতে অরুণাচলের চাকমাদের সাথে মিজোরামের চাকমা বা তঞ্চঙ্গ্যাদের মিজোরামের চাকমাদের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের চাকমাদের ভাষা সংস্কৃতির যোগাযোগ রাখা কঠিন হয়ে পড়বে। যেমন, আরাকানের দৈহনাক চাকমাদের সাথে বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা তঞ্চঙ্গ্যাদের প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, অপরিচিত এবং অনাত্মীয়। এক পরিবারের মানুষ রোয়াঙা চাকমা বা তঞ্চঙ্গ্যা চাকমা এবং আনক্যা চাকমা পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে হয়ে গেলাম চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা, যেন এক পিতা, দুই মাতা বৈমাত্রেয় ভাই। তাহাও কেহ কেহ স্বীকার করবেন না। এক বাপের দুই ছেলে দুই ভাই স্বীকার করতে হবে। দুই ভাই এর পৃথক (জুদা) হতে কোন বাঁধা নেই কিন্তু ঝগড়া করে পৃথক (জুদা) হলেই যত আপত্তি ও নিন্দা। বিজয়গিরি রাজার অধঃস্তন পুরুষ স্বীকার করেন কিন্তু এক জাতি স্বীকার করেন না। “এলে মইস্যাং লালসু নেই, ন এলে মইস্যাং কেলস নেই”(কেলস বা ক্ষতি আছে) একতাই বল। এভাবে অরুণাচলের চাকমারাই সর্ব প্রথম আমাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন, এখনও তারা আমাদের থেকে অনেক বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম, মিজোরাম ও ত্রিপুরার চাকমা তঞ্চঙ্গ্যারা প্রভাবান্বিত হচ্ছেন বাঙ্গালীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে এবং অরুণাচলের চাকমারা প্রভাবান্বিত হচ্ছে হিন্দি বলয়, নাগা-খামতি বলয় দ্বারা। তারা মোটেই বাংলা শব্দের সাথে পরিচিত হচ্ছেন না নব-জাতকেরা। অরুণাচলের চাকমারা সাধারণতঃ ৩টি ভাষার সাথে পরিচিত ও শিক্ষিত হয়ে উঠতেছেন-চাকমা, হিন্দি ও ইংরেজী।

এখানে অরুণাচলের এক ছেলের কথা ও ঘটনা না বলে পারলাম না। ছেলেটার সাথে আমার পরিচয় হয় ১৯৯৮ ইং সনের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে কলিকাতায় বুদ্ধগয়া তীর্থে যাওয়ার পথে। সে থাকতো শ্রদ্ধেয় বিমলতিষ্য ভাস্করের প্রতিষ্ঠান “করুণা শিশু সদনে” ছেলেদের প্রতিপালক (Caretaker) হিসাবে। তার জেঠা মহাশয় টেলিফোনে তাকে ডেকে আনেন আমাদেরকে কলিকাতার মহানগরীর দর্শনীয় স্থানগুলি দেখানোর জন্য। যথাসময়ে এসে তার কর্তব্য পালন করে বিকাল বিদায় নেন। এখানেই তার সাথে বিদায়। হঠাৎ প্রায় ৩/৪ বৎসর পর ২০০২ ইং সনে সে রাষ্ট্রাঙ্গাটি এসে হাজির। আত্মীয়-স্বজন পথ-ঘাট সব কিছুই তার অচিনা বা জানা ছিল না। সে সরাসরি অরুণাচল থেকে আইজল, দেমাগ্রী হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে হরিণা-বরকল লঞ্চে রিজার্ভ বাজার হয়ে বনরূপা বাজারে পৌঁছে। সে তো কাকেও চিনে না এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতেছে এই বাজারে কে কে চাকমা হবেন, কাকে জিজ্ঞেস করলে তার পরিচিত বাসাটা জানা যাবে। আসামে পূর্ব ভারতীয় রাজ্যগুলিতে একই চেহারা হলেও চাকমা হবেন নিশ্চয়তা নেই। কারণ আসামে একই চেহারায় বিভিন্ন উপজাতির বসবাস। তারা সাধারণতঃ কেহ কারো ভাষা বুঝেন না। আসামের মত ইহাই সংকট, কাহাকে জিজ্ঞাসা করবে? তার ভাগ্য ভাল, যাকে জিজ্ঞাসা করলো তারা চাকমা। সেইদিন আমার শালিকা বেবী চাকমা তার জ্যেষ্ঠ পুত্র উপলকে নিয়ে বনরূপা বাজারে যায়। সে সাহস করে এক ফুল বাবু স্মার্ট যুবক উপলকে তার পরিচিত জনের নাম ও বাসা জিজ্ঞেস করল। বেবীরা তাকে ব্রজেন্দ্র নাথ তালুকদারের বাসায় দিয়ে আসে। ব্রজেন্দ্র নাথ তালুকদারের এক নাতনি “করুণা শিশু সদনে” পড়াশুনা করে, সেই হিসাবে পরিচয়। সে ব্রজেন্দ্র নাথ তালুকদারের বাসায় গিয়ে প্রথমে তার স্ত্রীকে বললো, “ভেই এজ্য এই মানুষান ন অলে তমারে চুক ন ফেলুন”। পঞ্চাশ ষাট দশকের চাকমা ভাষা ও কথা। আমরা হলে ‘বেই’ না বলে দিদি বলতাম অরুণাচলে চাকমাদের ভাষায় কোন দিদি শব্দ নেই। ছেলেটার নাম মি. তানজাম চাকমা, সম্পূর্ণ স্থানীয় শব্দ, হয়তো নাগা বা খামতি। ছেলেটার পরিচয় হল, কাস্টম অফিসে এপ্রাইজার মিসেস লাকী চাকমা এর ভাসুরের ছেলে। অরুণাচলের অধিবাসী। তার পিতা প্রদীপ কুমার চাকমা, বন্দুকভাঙ্গার উদ্বাস্ত। ১৯৬৪ ইং সনে অরুণাচলে চলে যান। ১৯৫৭-৫৮ ইং সনে কানুনগো পাড়া স্কুলে অধ্যয়ন করেছেন। সেই সূত্রে পরিচয়। তিনি ২০০২ ইং সনে একবার রাষ্ট্রাঙ্গাটি বেড়াতে আসেন, আমার সঙ্গে দেখা করেন আমার বাসায়। এভাবে আমরা স্থানভেদে ভাষাগত ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বো এবং পড়তেছি।

রাজা বিজয়গিরি চম্পকনগর থেকে বিজয় অভিযানে বের হন এবং ৭ (সাত) রাজার সাত রাজ্যসহ অকসাদেশ/রোসাঙ্গ/আরাকানের উত্তরাংশ সহ বিরাট ভূ-ভাগ জয় করেন। দুই সেনানায়ক প্রধান সেনাপতি রাধামন ও দ্বিতীয় সেনাপতি কুঞ্জধনকে চাক্কাঁদাওতে (কলডাইন নদীর উজান) একত্রিত করলেন এবং বিজিত রাজ্যের শাসনের ব্যবস্থা করে দেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ইতিমধ্যে সেনা

নায়কদের ছুটি ও বিদায় দেন। অর্ধ-পথে এসে সংবাদ পান যে, চম্পক নগরে রাজা ও পিতা সাংবুদ্ধার মৃত্যু হয়েছে এবং বড় ভাই এর অবর্তমানে সিংহাসন শূন্য না রেখে ছোট ভাই উদয়গিরি রাজ সিংহাসনে বসেন। এ খবরে রাজা বিজয়গিরি খুবই মর্মান্বিত হয়ে ছোট ভাই এর ও রাজার অমর্যাদার ভয়ে দেশে না ফিরার সিদ্ধান্ত নেন। সকল সেনা নায়ক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে শত্ৰু-পরামর্শ করে বিজিত রাজ্যে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাপ্রাইকুলে দেশের রাজধানী স্থাপন করে দেশ শাসন ও প্রজা পালনের দিকে মনোনিবেশ করেন। অতীতকালে দেখা গেছে কোন সেনা নায়ক বা রাজা তার দল-বল ও সমস্ত শক্তি নিয়ে দেশ জয় ও অভিযানে বের হতেন এবং সঙ্গে মহিলা ও শিশুদেরও সাথে নিয়ে যেতেন। সেইরূপ মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খাঁ, কুবলাই খাঁ দেশ জয়ে বের হতেন চীন দেশ থেকে এবং কখন শক (কনিষ্করা) জাতিরাও বের হতেন। মহিলারা পাচকের কাজ ও অন্যান্য গৃহস্থালী কাজ সম্পন্ন করতেন। মাতৃ-জাতি হল ভাষার বাহক। শিশুরা মায়ের কাছ থেকে ভাষা শিখে। চাকমারা মাতৃ-ভাষা না হারানোর কারণ ইহা অনুমান করা যায়। যুদ্ধে চাকমা মহিলারা অনুগমন করেছেন। শুধু কতিপয় সেনা-নায়ক সৈন্য ও বিজয়গিরি রাজা অবিবাহিত ছিলেন। বিজয়গিরি রাজা নিজে এক সম্ভ্রান্ত আড়ি মেয়ে (আর্য্য সভ্যতার মেয়ে) বিবাহ করেন এবং সেনা নায়ক বা সৈন্যদের জাতীয় মেয়ে না পেলে স্থানীয় মেয়ে বিবাহ করার অনুমতি দেন। চাকমারা জাতীয় ভাষা না হারানোর কারণ খুব অল্প সংখ্যক সৈন্য বি-জাতীয় মেয়ে বিবাহ করেন বলে ধারণা জন্মে। সকল সৈন্যরা মগ মেয়ে বা স্থানীয় মেয়ে বিবাহ করলে চাকমা ভাষাটা হারিয়ে যেতো।

প্রবল প্রতিপত্তির সহিত বিজয়গিরি রাজা তার রাজ্য শাসন করেন। প্রতিবেশী কোন রাজা তার রাজ্য আক্রমণ বা গোলযোগ করার সাহস করেননি। দীর্ঘদিন রাজ্য শাসন করার পর অপুত্রক অবস্থায় রাজা বিজয়গিরি দেহ ত্যাগ করেন। তার মৃত্যুতে প্রজাবৃন্দ ও আমলারা মন্ত্রীবর শ্রীউত্তম বা সিরিস্তমাকে রাজ সিংহাসনে বরণ করেন। সিরিস্তমাও যোগ্যশাসক ও ক্ষমতা সম্পন্ন রাজা ছিলেন। এভাবে কয়েক রাজার শাসন অতিক্রান্ত হলে চাকমা রাজার শাসনে শৈথিল্য দেখা দেয় এবং ঐ সময় আরাকান রাজ শক্তিশালী হয়ে উঠেন। প্রায় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ও নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে চাকমারা আর সুখে সাপ্রাইকুলে শাসন করতে পারলেন না। প্রবল আরাকান রাজার সঙ্গে মেতে উঠতে না পেরে চাকমা রাজা মনিজগিরি উত্তর (উচ্চ) বার্মায় সরে যান এবং সেখানে নিরিবিলা রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তথায় নিজ নামে মনিজগিরি রাজধানী স্থাপন করে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিছু শক্তি সঞ্চয় করে আরাকানে হারানো রাজ্য পুনঃ উদ্ধারের চেষ্টা করেন রাজা মনিজগিরি কিন্তু ব্যর্থ হন। এভাবে কয়েক রাজার যুগ চলে যায়। রাজা বিজয় মানিক (বাক্সালী সর্দার) এর সময় চাকমারা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেন এবং সম্মিলিত বাক্সালী সৈন্যসহ বার বার আরাকান আক্রমণ করেন কিন্তু রাজ্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। এভাবে চতুর্দশ শতাব্দী রাজা অরুন যুগের আমল এসে যায়। রাজা অরুন যুগ খুবই শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আরাকান

রাজা মেজ্যাদি কয়েক বার চাকমা রাজ্য আক্রমণ করেও পরাজিত হয়ে ফেরৎ আসতে বাধ্য হন।

এভাবে কয়েকবার শক্তি পরীক্ষা করে আরাকান রাজ মেজ্যাদি বুঝতে পারলেন যে, চাকমা রাজা অরুন যুগের সাথে সম্মুখ সমরে যুদ্ধ জয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তারপর তিনি কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন ও ষড়যন্ত্রের পথ ধরতে মনস্থ করলেন। এ ব্যাপারে চাকমা রাজার দুর্বল মুহূর্ত ও সুযোগ সন্ধানেরত হলেন আরাকান রাজ এবং গুপ্তচর নিয়োগ করলেন। লামনছমী নামীয় এক গুপ্তচর যাবতীয় পথ ও সুযোগ সন্ধান দেন। এভাবে সমস্ত আয়োজন সমাপ্ত হলে মেজ্যাদি কূটবুদ্ধির মাধ্যমে যুদ্ধ অবলম্বনের জন্য সেনাপতি বুজাঙ্গা ছাইগ্রাইকে রাজা অরুন যুগকে গোপনে পর্যবেক্ষণ ও যুদ্ধ পরিকল্পনার জন্য প্রেরণ করেন।

এদিকে রাজা অরুন যুগ নিরিবিবি আপন মনে নিজ রাজ্য শাসন ও সমৃদ্ধি নিয়ে ব্যস্ত ও বিব্রত। রাজ্যের কত সুখ, কত উন্নতি, প্রজাদের মঙ্গলের দিকে রাজা সর্বদা উজ্জার ও উন্মুক্ত। চাকমা রাজার এত সুখ ও উন্নতিতে আরাকান রাজার ঈর্ষায় আর ঘুম হচ্ছে না। তাই শত্রুকে পরাজয় ও ধ্বংসের এত আয়োজন এত কূটকৌশল। এ সম্পর্কে চাকমা জাতি ও দেজ্যাওয়াদি আরেদফুং এর বর্ণনায় বলা যায় জাতির গৌরবময় অধ্যায়ের মর্যাদাসিক পতন। জাতির অতীত কর্মফলের কি করুণ পরিণতি। মনিজগিরি ছিল উচ্চ বার্মায় চাকমা রাজার রাজধানী। রাজধানীতে শত শত নর-নারীর আনন্দ কোলাহল নিয়ত বাজে, কত সুখ, কত আনন্দ প্রজারা যেন সর্ব সুখেই সুখী ও বিমোদিত। বিবর্তমান কালের প্রবাহে জগতের সব কিছু পরিবর্তন হতে বাধ্য। রাজা ও রাজধানীর পতনে জাতির জীবনে কিভাবে এক বিষাদের কালো ছায়া নেমে এলো কেহ তারা কল্পনাও করতে পারেন নি। হাজার হাজার নর-নারীর বুকের ভরা বেদনার ছবি, কত দুঃখ কত দুর্দশা, কত হাহাকার এসে গেল তারা তাহা চিন্তাও করেন নি। সেই স্মৃতি, সেই বেদনা শুধু ঐ দেশের মাটিতে নয়, এখনও চাকমাদের মনের আকাশে, হৃদয়ের বীণাতে নীরবে কেঁদে ফিরে, কি করুণ, কি হাহাকার সেই বেদনার

** (বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা প্রমুখ অনুমান করেছেন যে, বিজয়গিরি রাজার নব-চাকমা রাষ্ট্রের রাজধানী সাখাইকুলে চট্রামে মাতামুহুরী নদীর মোহনায় কোন এক স্থানে অবস্থিত ছিল এবং চাকমা রাষ্ট্রের নাম উড়িয়া রাজ্য নাম ছিল। এই অনুমান ভুল বলে প্রতীয়মান হয়। বিজয়গিরি রাজা কলডাইন নদীর উজান তার দুই সেনা নায়ক সেনাপতি রাধামোহন ও কুঞ্জধনকে আকিয়াব টাউন থেকে কলডাইন নদীর প্রায় ১০০ মাইল উজানে চাঁকাদাওতে মিলিত করেন। ইহাতে বুঝা যায়, বিজয়গিরি রাজার দুই সেনাপতি দুইদিকে আরাকানের উত্তর অঞ্চলের শহর বা এলাকাগুলি মংধু, বুসিৎ, রাসিৎ, ক্যাকের্ড, আকিয়াব ও চাঁকাদাও সব জায়গা জয় করেছিলেন এবং চাঁকাদাও এর আরো উজান কলডাইন নদীর তীরে সাখাইকুলে তার রাজধানী স্থাপন করেন। পতনের যুগেও চাকমারা সাখাইকুল থেকে সহজে উচ্চ বার্মায় চলে যেতে সক্ষম হন। মাতামুহুরী নদীর মোহনায় 'সাখাইকুল' অবস্থিত হলে চাকমারা উচ্চ বার্মায় না গিয়ে চট্রামের দিকে পাগিয়ে আসতেন সহজ পথে ও রাস্তায়। উখিয়ার পূর্ব নাম উড়িয়া। বঙ্কিম বাবু ভারতের উড়িশ্যা প্রেমী উড়িশ্যার নাম থেকে নামটা গ্রহণ করে 'উড়িয়া রাজ্য' বলার সাহস করেছেন। পূর্ববর্তী কোন লেখক উড়িয়া রাজ্যের নাম উল্লেখ করেননি। মনিজগিরি পতনের পর চাকমারা আরো উত্তর পশ্চিমে মংজাক্রেতে চলে আসেন। মংজাক্রে পতনের পর আরো উত্তর পশ্চিমে চাঁকাদাওতে স্থানান্তরিত হন। সেখানেও থাকতে না পেরে মাহু ও নাফ নদী পার হয়ে আলীকদম, টেকনাফ ও রামুতে এসে যান সহজ রাস্তায়)।

সুর, পতনের নির্মমতা, শুধু একটা মাত্র ঘটনায় একটা জাতিকে চাকমার জাতির সমৃদ্ধকে চিরতরে মহাসমুদ্রে নির্মজ্জিত হয়ে গেল, প্রায় হাজার বৎসরের কাছাকাছি হয়ে গেল, তবু জাতি, চাকমারা আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলো না। কর্মের বিপাক, ভাগ্যের পরিহাস, কাকেও দোষ দিয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার সুযোগ নেই।

১৩৩৩ খৃষ্টাব্দ। একদিন দিনের আলো শেষ হয়ে গেল, কালো রাত্রি নেমে এলো। রাজা অরুন যুগকে পরাস্ত করতেই হবে। আরাকান রাজ মেঙ্গ্যাদির দৃঢ় সংকল্প। সমস্ত আয়োজন পরিপূর্ণ। এবার কালো রাত্রিতে যুদ্ধ আরম্ভ করা হবে। রাজা মেঙ্গ্যাদি তার সুপরিকল্পনানুসারে তার প্রধান মন্ত্রী কোরংখী ও সেনাপতি বুজাঙ্গ্যা ছাইখী এর অধীনে বিরাট সৈন্য বহর ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার), বেসুবর অধীনে ১০,০০০ হাজার ক্যারে অধীনে ১০,০০০ হাজার বুজঙুর অধীনে ১০,০০০ খেচুর অধীনে ১০,০০০ সৈন্য প্রেরণ করেন। ইহাতে মেঙ্গ্যাদির যুদ্ধ জয়ের সন্দেহের অবকাশ থাকায়, জলপথে অবরুদ্ধ করার জন্য লাইচুর অধীনে ১০,০০০ হাজার পাঠানোর নির্দেশ দেন। এদিকে প্রধান মন্ত্রী কোরংখী আরো রিজার্ভ সৈন্যসহ ৩০,০০০ হাজার বাঙ্গালী কুলি নিয়ে চালির পথ অবরোধ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রইলেন। তৎসাত্কার শাসনকর্তার সন্নিহিতে ছিলেন পেগুরাজ। তিনি চাকমা রাজার মিত্র ছিলেন। তাই তিনি মেঙ্গ্যাদির অভিপ্রায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা থাকায়, পথে পেগুরাজ কে বলা হয় তারা চাকমা রাজার বর যাত্রী যাচ্ছেন। এভাবে দালার পথ যাত্রী ক্যাচুকে ও তখনিকটস্থ শান রাজাকে প্রবঞ্চনা করা হয়। তদুপরিও চাকমা রাজাকে একখানি বিনয় পত্র ও রাজ কন্যা প্রেরণের খবর বিশেষ রাজদূত ছান্দাইনামা মারফৎ প্রেরণ করা হয়। রাজা অরুন যুগ পত্র পাঠে সন্তুষ্ট হন এবং মন্ত্রী ব্রোজমনিকে রাজ কন্যাকে অভ্যর্থনা ও সম্বর্ধনা দিয়ে নিয়ে আসার জন্য প্রেরণ করেন। গুপ্তচরের মুখে চাকমা মন্ত্রীর আগমন খবর পেয়ে সেনাপতি ছাইখাই সৈন্য-বাহিনী পাহাড়ে লুকিয়ে রাখেন এবং রাজ কন্যা স্বয়ং রাজা মেঙ্গ্যাদির বোন বলে পরিচয় দেন। মনিজগিরিতে রাজা অরুন যুগ বিবাহ উৎসবে মগ্ন হলে সুযোগ বুঝে গভীর রাতে রাজা অরুন যুগ ও রাজধানী চারিদিকে আক্রমণ করা হয়। কিরূপ প্রতারণা কিরূপ ছলনা। প্রবঞ্চনামূলক যুদ্ধেও চাকমা রাজ ৩দিন ৩রাত্রি যুদ্ধ পরিচালনা ও প্রতিরোধ যুদ্ধ করেন। অগণিত সৈন্য ও নর-নারী হতাহত হলেন। রাজার সেনা নায়কেরা এই অতর্কিত আক্রমণ প্রতিহত করার আশ্রয় চেষ্টা করে কিন্তু প্রায় সকলেই পরাজিত ও ১০,০০০ হাজার চাকমা সৈন্য বন্দী হলেন। এইভাবে রাজা অরুন যুগ রাজ পরিবারের সকল সদস্য, রানী পুত্র কন্যাসহ বন্দী হলেন। মন্ত্রী ছাইখাই বিজয় উল্লাসে ৬৯৫ মণী ২রা মাঘ মাস রাজা অরুন যুগ, তিন রানী, তিন রাজপুত্র ও দুই কন্যাকে সেনাপতি রেয়ং সমভিব্যাহারে রাজধানীতে রাজা মেঙ্গ্যাদি সমীপে বন্দীদের পাঠিয়ে দেন। যুদ্ধে রাজা ও প্রজার অগণিত সম্পত্তি মগ বাহিনীর হস্তগত হয়। পরিশেষে মন্ত্রী ছাইখাই ৫৯৫ মণী ১৩ই মাঘ বিজিত রাজ্য হতে ৫০ টা

বৃহৎ হাতি, ২০ টা গয়াল, অপরিসীম স্বর্ণ ও রোপ্য এবং রাজকীয় মূল্যবান সম্পদসহ বন্দীকৃত ১০,০০০ হাজার সৈন্য নিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। এতে রাজা মেঙ্গাদি মন্ত্রী উপর অতিশয় সন্তুষ্ট হন এবং মহা-উচ্ছা-ওয়ান্ন বা মহাপ্রজ্ঞ খেতাব দিয়ে মন্ত্রীকে ভূষিত করেন। এভাবেই চাকমা রাজার রাজধানী মনিজগিরি ধ্বংস হয়ে গেল এবং চাকমাদের উদিত সূর্য্য অস্ত গেল। মনিজগিরি জনশূন্য হয়ে পড়লো।

ইহার পরবর্তীতে রাজা মেঙ্গাদি বন্দী চাকমা রাজ পরিবার এর সদস্যদের মুক্ত করে দেন এবং তার তত্ত্বাবধানে রাখেন। মনে হয় রাজা মেঙ্গাদি যুদ্ধে বিজয়ী হলেও তার প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার জন্য মানসিকভাবে দুর্বল হন এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের প্রতি কঠোর ও নির্দয় না হয়ে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও সুব্যবস্থা করেন। রাজা অরুন যুগকে ক্যামছার উপর আধিপত্য অর্পন করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র সূর্য্যজিৎ কে কিউদেজা, মধ্যম পুত্র চন্দ্রজিৎকে মিঞা এর শাসনকর্তা এবং কনিষ্ঠপুত্র শত্রুজিৎকে কংজার জলকর তহসীলদার রূপে নিয়োগ দেন। ১০,০০০ হাজার যুদ্ধ বন্দী সৈন্যদের এংখ্যং এবং ইয়াংখ্যং নামক স্থানে বসবাসের অনুমতি দেন এবং তাদের পদবী পরিবর্তন করে 'দৈংনাক' আখ্যা দেন। জ্যেষ্ঠ কন্যা চন্দ্রমুখী কে (মগের চুমি খা) মেঙ্গাদি নিজেই বিবাহ করেন ও কনিষ্ঠ কন্যাকে মন্ত্রীর পুত্র অংজাউর সাথে বিয়ে দেন। আরাকান ভ্রমণ কালে ২৬শে নভেম্বর/১৯৯৮ ইং তারিখ বুসিতং এ একজন দৈংনাক চাকমা আমাকে বলেন “দারা আমি নিজরে চাকমা কলেউ আরাকানিজউন আমারে চাকমা ন'কনদ্যা, দৈংনাক কনরে” (দাদা, আমরা নিজকে চাকমা বলেও আরকানিজরা আমাদেরকে চাকমা বলেন না, দৈংনাক বলেন)।

এভাবে উচ্চ বার্মায় চাকমা রাজা অরুন যুগের পতন রাজধানী মনিজগিরি পতন। ঐতিহাসিকরা মনিজগিরি ইরাবতী নদীর পূর্ব পাড়ে অবস্থিত বলে বর্ণনা করেছেন কিন্তু আমার চোখে দেখা ও অভিজ্ঞতা অন্যরূপ। আমরা ৩রা ডিসেম্বর/১৯৯৮ ইং মান্দালয় থেকে যেই চাকমা শহর সে গাইন (সাক+গাইন) দেখে ও ভ্রমণ করে আসলাম তাহা তো মান্দালয় শহরের উত্তরে ইরাবতী নদীর পশ্চিম উত্তরে অবস্থিত। আমার মনে হয় ঐতিহাসিকরা ঐ স্থান পরিদর্শন বা ভ্রমণ না করে অনুমানের উপর ভিত্তি করে ইরাবতী নদীর পূর্ব পাড়ে মনিজগিরি অবস্থান বর্ণনা করেছেন। সেগাইন (সাক+ গাইন = চাকমা শহর) ইহাই তো মনিজগিরি? চতুর্দশ সামরিক শক্তিতে ও রাজ্যের পরিধিতে রাজা মেঙ্গাদি হতে কোন অংশেই দুর্বল ছিল না। লক্ষাধিক সৈন্য নিয়ে ও মেঙ্গাদির বাহিনী চাকমা রাজার সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হতে সাহস করেননি, বিশ্বাস ঘাতকতা মূলক, প্রবঞ্চনা ও কূটকৌশলের মাধ্যমে চাকমা রাজাকে পরাজিত করেন। এই প্রবঞ্চনা মূলক যুদ্ধ না হলে চাকমাদের ইতিহাস ও বার্মা আরাকানের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত ও চিত্রিত হত এবং চাকমারা ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে বার্মা আরাকান ত্যাগ করতেন না। রাজা মেঙ্গাদি যেই প্রতারণা মূলক

কুটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে যুদ্ধ করেছিলেন ব্রহ্মদেশীয় ঐতিহাসিকগণ ইহার কলংক রচনা করে নিরপেক্ষতার পরিচয় প্রদান করেছেন।

এভাবে কয়েক বৎসর জীবিত থাকার পর রাজা অরুন যুগ ও রানী মৃত্যুমুখে পতিত হন। এতাদৃশ রাজকীয় সুবিধা ভোগ করার পর ৩ রাজপুত্র অধীন জীবন যাপন থেকে মুক্তির পথ অনুসন্ধানের আশায় ছিলেন। এক সময় ৭০৫ মগীতে ১৩৪৩/৪৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মেঙ্গ্যাদি পররাজ্য লোভে নিজেই লিমক্ৰ অভিযানে যান এবং রাজধানী থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। এই সুযোগে ৩ রাজপুত্র উচ্চ বার্মায় পলাইয়া যান এবং তথায় মংজাক্রতে আরোহণ পূর্বক রাজধানী স্থাপন করে জ্যেষ্ঠ রাজ কুমার সূর্য্যজিৎ সিংহাসনে আরোহন পূর্বক রাজা শাসন ও হারানো প্রজাদের একত্রিত করেন। দূরবর্তী স্থানে স্থির বিধায় মেঙ্গ্যাদি আর চাকমা রাজ্যের দিকে নজর দেন নাই। ইহার পরবর্তী সময়ে ৭২৪ মগী ১৩৬২ খৃষ্টাব্দে মধ্যম রাজ কুমার চন্দ্রজিৎ ক্যাজম রাজার নিকট থেকে ‘মংলো’ খেতাব লাভ করে প্রোম রাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হন এবং কনিষ্ঠ রাজ পুত্র শত্রুজিৎ ছাখ্যং রাজার অধীনে ৭২৫ মগীতে ১৩৬৩ খৃষ্টাব্দে ‘তারদ্যা’ উপাধি পেয়ে আমক্ৰ রাজ্যের শাসনভার লাভ করেন। অতঃপর রাজা সূর্য্যজিৎের মৃত্যু হলে ছোট রাজকুমারও দূরে অবস্থান করলে প্রজাদের আকুল আবেদনে মধ্যম রাজ কুমার চন্দ্রজিৎ মংজাক্রের সিংহাসনে আরোহন করেন। এককালে চন্দ্রজিৎ আরাকান রাজার অধীনে ঘাটের আধিপত্য পাওয়ার স্বজাতিরা তাকে ‘ঘাগত্যা রাজা’ বলতেন। ৩ রাজপুত্র পলাইয়া গেলেও মেঙ্গ্যাদি তাদের প্রতি মমতা দেখাননি বরং আক্রোশ ভাবাপন্ন হন। কয়েক বৎসর পর মেঙ্গ্যাদি মৃত্যুবরণ করেন। তার পরবর্তী সময়ে মেঙ্গ্যাদির পুত্র কমরুই বা নরম খীলা চাকমারা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করেন না অজুহাতে ‘মংজাক্র’ আক্রমণ তথায় থেকে বিতাড়ণ করে ঘাগত্যা রাজা চন্দ্রজিৎ কে কলাডাইন নদীর পাড় চাকাদাওতে বসতি করতে বাধ্য করেন। সেখানেও চাকমারা মগ রাজার অত্যাচার থেকে রেহাই পাননি। এই অশান্তি ও দুঃখের মধ্যে ঘাগত্যা রাজা চন্দ্রজিৎের মৃত্যু হয়। অতঃপর তার পুত্র রাম থংছা রাজা হন।

নতুন স্থান চাকাদাওতে আরাকানিজদের অত্যাচার উপদ্রব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বার বার যুদ্ধে পরাজয় স্থান পরিবর্তন রাজা ও প্রজাদের মনে নিদারুণ দুর্বলতা ও নৈরাশা এসে যায়। এতে দলপতি ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মনেও সংসাহস কমে যায় ও দুর্বলতা দেখা দেয়। রাজা রাম থংছা জনবল, অর্থবল, মনোবল সব হারিয়ে ম্যুমান হয়ে পড়েন এবং বৌদ্ধ শ্রমণ (মইস্যং) হন। তাই তাকে প্রজারা মইস্যং রাজা বলেন। আরাকানের রাজার সিপাহী বা কর্মচারীরা খাজানা উত্তল করতে এলে গ্রামে হাহাকার রব পড়ে যেত। পরিবারে পুরুষদেরকে উঠানে বেঁধে রেখে স্ত্রীলোকদের দিয়ে রাতারাতি মদ (এক রেত্যা মদ) তৈয়ার করে দিতে বাধ্য করতেন। এভাবে অসহনীয় বহু প্রকার অত্যাচার করা হত। পুরুষদের কানে ছিদ্র করে শিকল বা

ছোট বেত ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে যেতো এবং দাস হিসাবে বিক্রি করে দিত। সেই জন্য চাকমা পুরুষরা আর কানে ছিদ্র করতেন না। ঐ সময়ে চাকমাদের মধ্যে যোগ্যতর নেতৃত্ব দেওয়ার উপযুক্ত লোকের দারুণ অভাব দেখা দেয়। বার বার যুদ্ধে পরাজয়ে হত সর্বস্ব হারা হয়ে দেশে শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত বসবাসের সম্ভাবনা সমূলে নষ্ট হয়ে যায়। এরূপ অশান্ত পরিস্থিতিতে কি করা যায় নেতৃবৃন্দ মিলিত হয়ে আলোচনার বৈঠকে বসেন এবং আলোচনান্তে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। এ ব্যাপারে মইস্যাং রাজাকে অবহিত করলে মান মর্যাদা হানির ভয়ে মইস্যাং রাজা দেশ ত্যাগে সম্মত হননি। বিষয়টি উপলব্ধি করে প্রজা ও নেতৃবৃন্দ রাজার উপর বিরক্ত হয়ে বলেন

“এলে মইস্যাং লালস নেই, ন এলে মইস্যাং কেলস নেই,
চল বাপ ভেই, চল যেই, চম্পক নগর ফিরি যেই,
ঘরত গেলে মগে পায়, ঝারত গেলে বাঘে খায়
মগে ন পেলো বাঘে পায়, বাঘে ন পেলো মগে পায়।”

এই পরিস্থিতিতে জীবন রক্ষার তাগিদে রাজা বা নেতৃবৃন্দকেও না জানিয়ে গোপনে প্রজারা আরাকান সীমান্ত ত্যাগ করে মাতামহুরী, তৈনছড়ি, বাঘখালি প্রভৃতি এলাকায় স্থানান্তরিত হতে থাকেন। এভাবে গ্রামাঞ্চলে পরিবারের সংখ্যা কমতে থাকে। পরিশেষে সরাসরি পলাইয়া আসা বিপদজনক মনে করে রাজপুত্র ও সর্দারগণ মন্ত্রী তৈন সুরেশ্বরী ও কয়েকজন সর্দারকে নিয়ে বাংলার নবাবের কাছে অনুগ্রহ ও সাহায্যের জন্য একদল প্রতিনিধি পাঠান। ইহার ফলে তারা গৌড়ের নবাব ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (সুবেদার) এর অনুমতি লাভ করেন এবং জাতি বেঁচে থাকার একটা ক্ষীণ আশার প্রদীপ জ্বলে উঠে। হে বন্ধু, মহান গৌড়ের নবাব, তোমার আত্মার শান্তি হউক। এখনও আমাদের সেই কামনাটুকু করা উচিত। এখন বাংলার গৌড়ের নবাবের শক্তি চট্টগ্রাম পর্যন্ত তাদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। সেই সময় গৌড়ের নবাব ছিলেন জালালুদ্দীন মহাম্মদ শাহ, তিনি ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা ও চাকমাদেরকে প্রথম আলীকদম তৈনছড়িতে আসার অনুমতি দেন এবং পরবর্তীতে আরো ১১ (এগার) খানি গ্রামে টেকনাফ ও রামুতে চাকমাদেরকে বসবাসের অনুমতি দেন। এভাবে চাকমারা মহা দুর্দিনে নবাবের অনুমতি নিয়ে বঙ্গভূমিতে প্রবেশ করেন। মইস্যাং রাজা রাম খংছার ৩ (তিন) পুত্র (১) জ্যেষ্ঠ মানেকগিরি (মারেকাস) (২) দ্বিতীয় পুত্র কামেকগিরি (কদম বাংলা) (৩) কনিষ্ঠ পুত্র- রদংসা। এভাবেই চাকমাদের বাংলার আসার ক্ষেত্রটা সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় অধ্যায়
চাকমাদের বঙ্গভূমিতে আগমন ও রাজত্বকাল
১। রাজা মানেকগিরি
(১৪১৮-১৪৩৩/৩৪ খৃঃ)

আশা ভরসাই মানুষকে জীবিত রাখে, জাতিকে জীবন দান করে, সাহস শক্তি যোগায় এবং জাতিকে সজীব করে রাখে। চাকমাদের বাংলার ভূমিতে প্রবেশে গৌড়ের নবাবের অনুমতি, নবাবের প্রতিনিধি ও চট্টগ্রামের শাসনকর্তা (সুবেদার) এর সহানুভূতির খবর বার্মা-আরাকানের চাকমা রাজবাড়ীতে ও চাকমা মহলে পৌছার সাথে সাথেই খরা রৌদ্র-দীপ্ত গ্রীষ্মের তাপ-দাহনে মৃতপ্রায় বৃক্ষরাজির যেইরূপ বর্ষা আরম্ভে প্রথম ফসলা বৃষ্টিতে তেজদীপ্ত হয়ে উঠে, সেইরূপ চাকমাদের মনেও বেঁচে থাকার আশার সঞ্চার হয়। খবরটা অতি-গোপনে চাকমাদের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, মহল্লা থেকে মহল্লান্তরে পৌছে যায়। চাকমারা যেন বেঁচে থাকার নতুন ঔষধি লাভ করলেন। রাজ দরবার থেকে কবে কোন সময় কোন মুহূর্তে ঐ মহা শুভ সংবাদটি এসে যাবে, নির্মম, কঠোর হলেও বেঁচে থাকার জন্য, জাতিকে রক্ষা করার জন্য জন্ম-ভূমি মাতৃভূমিতে ত্যাগ করতে হবে। আনন্দ-বেদনায় চাকমাদের মন-প্রাণ আপ্রাণ হয়ে গেল। আঁধারে গোপনে নীরব বিহনে চাকমারা দেশ ত্যাগের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। এই যেন মহাক্ষণ এসে গেল। রাজার হুকুম দেশ ত্যাগ কর, জীবন রক্ষা কর, জাতিকে রক্ষা কর। ঐতিহাসিক প্রাণহরি তালুকদারের ভাষায় দেশ ত্যাগের বর্ণনা মন্ত্রী খৈন সুরেশ্বরী তৎকালের শাসনকর্তা (চট্টগ্রাম) হতে ১২ খানি গ্রামে বসতি করার জন্য অনুমতি লাভ করলেন এবং একদল বাঙ্গালী সৈন্যও লাভ করলেন। তারা সৈন্যসহ উপস্থিত হলে রাজপরিবার ও অন্যান্য সর্দারগণ সপরিবারে উপস্থিত প্রজাবৃন্দকে লয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হন। মগরাজ এই সংবাদ পেয়ে বাধা দেওয়ার নিমিত্তে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার মারেক্যা ও মধ্যম কুমার কদম মগ সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ করে বাধা দিতে থাকেন এবং ছোট রাজ কুমার রদংসা ও মন্ত্রী খৈন সুরেশ্বরীকে কয়েক জন সৈন্য প্রহরায় প্রজাবৃন্দসহ সকলকে নিয়ে অগ্নে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম কুমার মগ সৈন্যদের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করার সময় মধ্যম কুমার বীরগতি লাভ করেন। মগ সৈন্যরা পশ্চাদপদ হলে আর বাধা জন্মায় নাই। অতএব, নিরাপদে চট্টগ্রামের অন্তর্গত মাতামহুরী অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে বারটা স্থানে বসতি স্থাপন পূর্বক শান্তির নিশ্বাস ফেলে চাকমারা। মধ্যম কুমার কদম বাংলা মারা যাওয়াতে বৃদ্ধ মৈস্যাং রাজ (রাম থংছা) শোকে মূহ্যমান হয়ে কয়েকদিন পর দেহ ত্যাগ করেন। বৃদ্ধ রাজা মৈস্যাং রাজার মৃত্যুর পর যুবরাজ মারেক্যা কদমতলী ও আলীকদমে বসতি করে আর একটা সুন্দর স্থানে রাজধানী করে তথায় ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন এবং মানেকগিরি নাম ধারণ করে রাজধানীর নাম রাখেন মানিকপুর। পরবর্তীতে আরো প্রজা চলে আসায় চাকমারা টেকনাফ ও

রামুতে বসতি করেন নবাবের অনুমতিক্রমে। এভাবে ঘোর দুর্দিন ও বিভীষিকাময় জীবন থেকে চাকমারা খানিকটা রক্ষা পান এবং স্বাভাবিক জীবন করতে আরম্ভ করেন।

আরাকান ও বাংলার সীমান্তে বসবাসরত প্রায় সকল চাকমারা এভাবে আরাকান ত্যাগ করে বঙ্গভূমিতে চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে এসে যান কিন্তু দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল ও বার্মা সীমান্তে যারা বসবাস করতেন তারা সহসা বঙ্গভূমিতে আসতে পারেননি। রাজা প্রজাবন্দসহ আরাকান ত্যাগ করেছেন খবর পেয়ে তারা আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। তৎকালীন সময়ে রাস্তাঘাট ছিল না, দুর্গম পার্বত্য পথ অতিক্রম করে চাকমারা এ দেশে আসেন। দূরবর্তী স্থান থেকে রওনা দিয়ে তারা অগ্রগামী দলকে ধরতে পারেননি। যদিও অগ্রগামী দলের লোকেরা পথ-চিহ্ন হিসাবে গাছের ডাল ও কলা গাছের ডিগ বা আগা কেটে দিয়ে এসেছেন। ২/৩ দিনের মধ্যে ঐ কলা গাছের ডিগ অনেক পরিমাণ বের হয়েছে দেখে বহু দূরবর্তী দলকে অনুসরণের অসামর্থ্যতা বোধ করে তারা অগ্রসর না হয়ে কেহ কেহ নিজ জায়গায় ফিরে গেলেন। কেহ কেহ যার যেখানে সুবিধা সেখানেই রয়ে গেলেন। এভাবে চাকমারা দুই দলে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। যারা আরাকানে রয়ে গেলেন বা অর্ধপথে পড়ে রইলেন তারা “রোয়াঙ্যা চাকমা” নামে পরিচিত হন এবং যারা চট্টগ্রামে আসেন তারা “আনক্যা চাকমা” নামে পরিচিত হন। বলা বাহুল্য তখন আরাকানিরা চট্টগ্রামকে পশ্চিমা দেশ বা আনক্যা দেশ বলতেন। কালে আরাকানে বসবাসরত রোয়াঙ্যা চাকমাদের আরাকানিরা দৈহ্নাক চাকমা বা দৈহ্নাক নামে ডাকতে থাকেন। দৈহ্নাক অর্থ নাকি ঢালধারী বা যোদ্ধা, অন্য অর্থে সেদাম-সারা বা অর্থব। যেমন চট্টগ্রামীরা পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতি বা পাহাড়ীদের “জুম্ম-খাপ্য” বলতেন উপহাস ছলে। বর্তমানে দৈহ্নাকরা আরাকানে যথেষ্ট সংখ্যক রয়েছেন, এমনকি আরাকানের আদিবাসী হিসাবে যাদুঘরেও স্থান পেয়েছেন। আমি লেখক নিজের চোখেই দেখে এসেছি আকিয়াব যাদুঘরে। বর্তমানে ধীরে ধীরে দৈহ্নাকরা শিক্ষিত ও উন্নত হয়ে উঠতেছেন। এখন তারা সামরিক বিভাগসহ বহু সরকারী দপ্তরে চাকুরী করতেছেন। কিন্তু কথা না বললে দৈহ্নাকদের চিনার কোন উপায় নেই নামে, পোষাকে, আচারে ব্যবহারে সম্পূর্ণ আরাকানি বা বার্মিজ। জাতি হিসাবে হারিয়ে যাচ্ছেন তারা, বার্মিজ হয়ে যাচ্ছেন। আমার মনে হয় অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বা তৎপরবর্তী সময়ে বড়ুাদের মত আমরাও হয়তো সম্পূর্ণ বাঙ্গালী হয়ে যাবো।

এভাবে রাজা মারেক্যা বা মানেকগিরি কয়েক বৎসর মানিকপুরে রাজত্ব করার পর জাতিকে রক্ষা করলেন এবং সুসংহত ও শক্তিশালী করে তোলেন। এতে তিনি (রাজ্য) মগ রাজার কুনজরে পড়ে যান। একে তো প্রজাবন্দ লয়ে পলায়ে আসায় চাকমা রাজার উপর আরাকান রাজার বিরাট রাগ, ক্ষোভ ও হিংসা। প্রাণহরি তালুকদারের ভাষায় উহা বর্ণনা করা গেল “মানেকগিরি কয়েক বৎসর মানিকপুরে রাজত্ব করার পর দুঃখের বিষয় আবার আরাকান দস্যুগণ অতর্কিতে মানিকপুর আক্রমণ করে লুণ্ঠরাজ করেন এবং বহু সংখ্যক লোক হত্যা করেন। এই খব্র যুদ্ধে ছোট রাজ কুমার রদংসা প্রাণ বিসর্জন করেন। এই ঘটনার পর মানেকগিরিও অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

২। রাজা ঠৈন সুরেশ্বরী (১৪৩৩/৩৪-১৫১৫ খৃঃ)

রাজা মানেকগিরি নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে রাজ পরিবারে কেহ রাজ্য হওয়ার সদস্য না থাকায় সর্দারগণ ও প্রজাবৃন্দ আনুমানিক ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে মন্ত্রী ঠৈন সুরেশ্বরীকে রাজ্যরূপে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। রাজা ঠৈন সুরেশ্বরী মন্ত্রী পদে আসীন অবস্থায়ও অনেক দক্ষতা ও বিচক্ষণতা পরিচয় দিয়েছিলেন। তারই পরিচালনায় ও সৎ পরামর্শে রাজা মৈস্যাং বাংলার নবাবের সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেন এবং বাংলায় চাকমাদের বসবাসের অনুমতি লাভ করেন। তিনি রাজগদী লাভ করে জাতিকে আরো শক্তিশালী ও সুসংহত করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তিনি বাংলার নবাব থেকে প্রাপ্ত সমগ্র এলাকাকে ১২ (বার) টি তালুক বা প্রশাসনিক অঞ্চলে ভাগ করেন এবং প্রতিটি তালুক বা অঞ্চলে একজন দক্ষ সর্দার বা প্রশাসক নিয়োগ করেন। এই প্রশাসকের পদবীর নাম হল রোয়াজা। এই সর্দার বা রোয়াজার অধীনে শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী গঠন করেন সর্দার বা রোয়াজাদের তিনি যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পণ করেন। মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত যাবতীয় প্রশাসনিক বিচার ও রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা তাদের দেওয়া হয়। প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা বিবেচনায় তিনি মানিকপুর থেকে রাজধানী আলীকদম নিয়ে যান। তিনি মগ ও কুকী দমনের জন্য নবাব হতে পুনরায় একদল বাঙ্গালী সৈন্য সাহায্য লাভ করেন এবং উহাদের সহায়তায় কুকী ও মগদের পরাভূত করে বিতাড়িত করেন। ইহাতে আরাকানিজ রাজ মেনখারী (আলীখান) চাকমা রাজ্যের উন্নতি ও যশ সহ্য করতে না পেরে ১৪৩৫-৩৬ খৃষ্টাব্দে বিপুল সৈন্য নিয়ে চাকমা রাজ্য আক্রমণ করেন। পূর্ব সংকেত পেয়ে রাজা ঠৈন সুরেশ্বরী নবাবের সাহায্য চেয়ে পাঠান কিন্তু নবাবের সাহায্য যথা সময়ে না পৌঁছায় রাজা নিজ সামর্থ্য ও সৈন্য বাহিনী দিয়ে প্রতিরোধ ও প্রতি আক্রমণ করেন। সেই সময় রাজ্যের একজন দুর্ধর্ষ সেনাপতি ছিলেন। রণে উন্মত্ত হতো বলে তাকে রণপাগালা আখ্যা দেওয়া হয়। যিনি ১ম রণ পাগলার বংশধর বটে। তৈনছড়ি গাঙের কুলে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে রাজ্যের সেনাপতি রণ পাগলা (২য়) অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে আরাকান বাহিনীকে সন্ধি করতে বাধ্য করেন। যুদ্ধে উভয় পক্ষের মধ্যে এক সন্ধি সূত্রে সখ্যতা স্থাপিত হয়। ইহা তৈনমুড়ি গাঙের যুদ্ধ নামে পরিচিত। সন্ধিতে বাকখালী নদী উভয় রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হয় দক্ষিণ তীরে “রাজার কুল” ও উত্তর তীরে “চাকমাকুল” এখনও সেই বিজড়িত স্মৃতি বহন করতেছে উহা কক্সবাজার জেলার রামু নিকটস্থ স্থানে অবস্থিত।

এই যুদ্ধের পর মন্ত্রী ঠৈন সুরেশ্বরী নবাব হতে ‘রাজা খেতাব’ লাভ করেন। উক্ত ঘটনাটি (যুদ্ধ) রাজা ভুবন মোহন রায়, বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান, চট্টগ্রাম ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ও প্রাণহরি তালুকদার প্রভৃতি লেখকগণ উল্লেখ করেছেন। রাজ্যের নামে তৈনছড়ি ছড়া নামকরণ হয়েছে বলে জানা যায়। তার রাজত্ব কালে চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে ত্রিপুরা মহারাজা, মোগল শক্তি ও আরাকানিদের এই ত্রিশক্তির মধ্যে

শক্তির পরীক্ষা হতেছিল। চট্টগ্রাম ত্রিশক্তির পুনঃ পুনঃ হাত বদল হতেছিল। রাজা কোন পক্ষ অবলম্বন না করে নিরপেক্ষ থাকেন। তিনি নিজের জাতি শাসন, উন্নতি ও রক্ষার কাজে ব্যাপ্ত ছিলেন। রাজা খৈন সুরেশ্বরী দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। কিন্তু তার রাজত্বকাল ও তার জীবিত কাল এত দীর্ঘকাল হয়ে দাঁড়ায় যে ইহা বিসদৃশ মনে হয়। তার পুত্র জনু (২য়) যদি ১৪১৫/১৬ খৃষ্টাব্দে তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে রাজা খৈন সুরেশ্বরীর রাজত্ব দাঁড়ায় ১৫১৫-১৪৩৪ = ৮১ বৎসর তৈনছড়ি গাঙের যুদ্ধ হয় ১৪৩৫/৩৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ মেন খারী আলী খান (১৪৩৪-১৪৫৯ খৃঃ) এর আমলেই তৈনমুড়ি গাঙের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রাজা খৈন সুরেশ্বরী এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। সুতরাং, খৈন সুরেশ্বরীর রাজ্যাভিষেক ১৪৩৪/৩৫ খৃঃ এর আগে বা পিছনে নেওয়া যায় না। অতএব, খৈন সুরেশ্বরীর আয়ুষ্কাল দাঁড়ায় মন্ত্রী পদে নিযুক্তির সময় ২০ বৎসর + মানিকগিরি রাজত্বকাল ১৬ বৎসর + তার রাজত্ব কাল (১৫১৫-১৪৩৪) ৮১ বৎসর সর্বমোট ১২১ (একশত একুশ) বৎসর এই সময়কালীন তো কাকেও রাজগদীতে বসান যাচ্ছে না। মৃত লোককে বা নিঃসন্তান পিতার অবৈধ সন্তানকেও রাজাপদ দেওয়া যাচ্ছে না। রাজার কোন দস্তক পুত্রেরও সন্ধান মিলতেছে না। অলীক বা কল্পিত রাজপুত্রকে তো রাজত্ব দেওয়া যায় না। রাজপুত্রের আয়ু বা বয়স বাড়িয়ে বা কমিয়ে সিংহাসনে বসান যাচ্ছে না। অবশ্য রাজা খৈন সুরেশ্বরীর পুত্র রাজা জনু (২য়) এর রাজত্বকাল ও অতি দীর্ঘকাল পড়েছে। রাজা খৈন সুরেশ্বরীর জন্য প্রাণহরি তালুকদার তার বহি “চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস”-এ একটা মন্তব্য করে গেছেন “রাজা খৈন সুরেশ্বরী দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন”। কত বৎসর উল্লেখ করেননি। তবু ভরসা রাজা জনুর (২য়) দীর্ঘকাল রাজত্বের জন্য দুইটা সনদপত্র পাওয়া গেছে। বিরাজ মোহন দেওয়ান তার “চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত” বইয়ের ১৪২ পৃষ্ঠায় লিখেন, “রাজা জনু সুদীর্ঘকাল জীবিত থেকে রাজ্য পরিচালনা করেন। কথিত আছে তিনি একশত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করেন”। রাজা ভুবন মোহন রায় তার চাকমা রাজ ফেমেলি বহির ৯১ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেন "Janu lived to a good old age of 120 years" অবিশ্বাস্য কিছুই নয়। প্রায় ৫৫০ (৫৬৬) বৎসর আগে মানুষের আয়ু কেমন ছিল, কতছিল তাহা জানার সুযোগ নাই। অনুমান তখন মানুষের আয়ু বেশী ছিল। বর্তমানেও অনেকের আয়ু সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। আমি আমার সৌখিন মানসিকতায় পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক প্রবীন ব্যক্তি জীবিত/মৃত- এর জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করি। ১৯৯৮/৯৯ ইং সনের এক সময় আমি খাগড়াছড়ি জেলার খবংপড়িয়া গ্রামে দারোগা বাবু চন্দ্র মোহন দেওয়ানের জীবন বৃত্তান্ত তার বাড়ীতে তার সাক্ষাতে জেনে লই এবং সংগ্রহ করি তিনি বললেন যে, মেট্রিক সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ ১৮৯৫ ইং সন হলেও তিনি প্রকৃতভাবে ১৮৯০ খৃঃ জন্ম গ্রহণ করেন মহালছড়ি থানার খেয়াংঘাট মৌজার সাত-ঘরস্যা পাড়ায় এবং ১৯১৬ ইং

সনে মেট্রিক পাশ করেন। ১৯১৯/২০ ইং সনে তিনি দারোগা চাকুরীতে যোগদান করেন। মেট্রিক সার্টিফিকেট অনুযায়ী ৫৫ বৎসর বয়সে ১৯৪৯ ইং সনে তিনি পেনশনে যান। তিনি দীর্ঘতম বৎসর পেনশন ভোগ করেন প্রায় ৫১ বৎসর। ২০০১ইং সনে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেইদিনও আমি কার্য্যোপলক্ষে খাগড়াছড়ি উপস্থিত ছিলাম। একবিংশ শতাব্দীতেও দারোগা বাবু চন্দ্র মোহন দেওয়ান প্রায় ১১১ (একশত এগার) বৎসর জীবিত ছিলেন। সুতরাং, রাজা খৈন সুরেশ্বরী ও রাজা জনু (২য়) প্রায় ৫৫০ বৎসর আগে ১০০/১২০ বৎসর জীবিত থাকা বা রাজত্ব করা বিচিত্র নয়। এই সময়ে রাজাদের রাজত্ব ও রাজত্বকালের তালে-বেতালে পড়ে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চাকমা খৈন সুরেশ্বরীকে তার রাজ্যাভিষেকের প্রায় ৪৬ বৎসর (১৪৮০-১৪৩৪) পর একজন কাল্পনিক রাজা কালা খংজার পুত্র বলে রাজ সিংহাসনে বসান। আরাকানি ইতিহাস ও অন্যান্য বহির তথ্যানুযায়ী তিনি তৈনমুড়ি গাঙের যুদ্ধ (১৪৩৫/৩৬ খৃঃ সংঘটিত) পরিচালনা করেন বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে। বঙ্কিম বাবু রাজা মানেকগিরিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে মৃত রদৎসাকে ১৪১৮ খৃঃ রাজগদীতে বসান ও কাল্পনিক রাজা কালা খংজাকে ১৪৪৮ খৃঃ রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

১৫০১ ইং সনে ত্রিপুরা-রাজ রাজা ধন্যমানিক্য চট্টগ্রামস্থ সদর ঘাট হতে মগধেশ্বরী মূর্তি নিয়ে পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে স্থাপন করেন। এই সূত্রে ত্রিপুরা রাজার সাথে রাজা খৈন সুরেশ্বরীর মিলন ও বন্ধুত্ব হয়। এ ব্যাপারে চাকমা রাজা ত্রিপুরা রাজাকে সহায়তা দান করেন বলে মনে হয়। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে পরাক্রান্ত নবাব হুসেন শাহ চট্টগ্রাম আক্রমণ করে ইহার বক্ষে বিজয় পতাকা উড্ডীন করলে আরাকান রাজা গজ গজ্জাদি (ইলিয়াস খাঁ) এই সময়ে চাকমা রাজাসহ পুনঃ চট্টগ্রাম জয় করেন। করদমিত্র রাজা হিসাবে চাকমা রাজা আরাকান রাজাকে সাহায্য করতে বাধ্য হন। ইহাতে ত্রিপুরা রাজ তার সেনাপতি চরচাগকে পাঠিয়ে রোসান্ন রাজার দর্পচূর্ণ করে পুনঃ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এতদ্ দর্শনে নবাব হুসেন শাহ আবার ত্রিপুরা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এভাবে রাজা জনুর রাজত্ব প্রারম্ভেই চট্টগ্রাম বক্ষে উক্ত ত্রিশক্তির মধ্যে শক্তির পরীক্ষা ও দুর্যোগের সৃষ্টি হয়। এভাবে রাজা খৈন সুরেশ্বরী দুর্যোগের মধ্যে জীবনাবসান হয়। তিনি সারাটা জীবন দুর্যোগ ও যুদ্ধের মধ্যে কাটিয়েছিলেন। তবু তিনি নিরাশ হননি, জাতি রক্ষা ও উন্নত করার আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন। তার ধৈর্য্য, সাহস, দেশপ্রেম ও পরাক্রমে দেশ ও জাতি রক্ষা পান জাতি যতদিন বেঁচে থাকবে, তাকে স্মরণ করবে।

৩। রাজা জনু (২য়) (১৫১৬-১৫৯৮/৯৯ খৃঃ)

রাজা খৈন সুরেশ্বরী এর মৃত্যুর পর তার একমাত্র পুত্র জনু (২য়) (মগেরা বলেন চনুই) আনুমানিক ১৫১৫/১৬ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেই সময়ও চাকমাদের দুর্যোগ কেটে যায়নি। চারিদিকে রাজ্যময় ত্রিশক্তি ত্রিপুরা মহারাজা, বাংলার নবাব ও আরাকান রাজার জয় পরাজয়ের খেলা চলতেছিল। তিনি রাজা হওয়ার প্রারম্ভিক কালেই ত্রিপুরা রাজ ধন্য মানিক্য দুই সেনাপতি সয়চাগ ও রায় কদম রোয়াং রাজ্যের কিয়দংশ (উত্তরাঞ্চল) দখল করে নেন। ঐ সময় চাকমা রাজার সহিত ত্রিপুরা রাজার সখ্যতা হওয়ায় আরাকান রাজ চাকমা রাজ্য আক্রমণ করেন। রোসাঙ্গ রাজার সেনাপতি জেন্দুইজা যুদ্ধে চাকমা রাজাকে পরাভূত করেন। তৎকালে চট্টগ্রামের উত্তরাংশে মুরাছিন ছিলেন ত্রিপুরা রাজার শাসনকর্তা। আরাকান রাজার সেনাপতি চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা দিলে মুরাছিন পলাইয়া যান। কাজেই চট্টগ্রাম অতি সহজেই আরাকান রাজার হস্তগত হয়।

যুদ্ধ অবসানে আরাকান রাজ মিনবাথী (যুবক শাহ) বিজিত রাজ্য পরিদর্শন মানসে চট্টগ্রাম উপস্থিত হন এবং তিনি হস্তীতে আরোহণ করে ঢাকায় গমন করেন। চাকমা রাজা আরাকান রাজার বশ্যতা স্বীকার করে আরাকান রাজ প্রতিনিধি চট্টগ্রামের শাসনকর্তা মামাংথী মারফৎ দুইটা শ্বেত হস্তী উপঢৌকন পাঠান। আরাকান রাজ ঢাকায় অবস্থান করে ঐ উপঢৌকন প্রাপ্তির সংবাদ চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ধামাংথী থেকে পান। কিন্তু রাজা ইহার কিছু পূর্বেই সেনাপতি জেন্দুইজাকে ধামাংথী থেকে কার্যভার গ্রহণ করার জন্য চট্টগ্রাম পাঠান। জেন্দুইজা চট্টগ্রাম এসে দেখেন যে ধামাংথী পত্র সম্পূর্ণ সত্য নহে, চাকমা রাজা যে হস্তীদ্বয় উপহার পাঠিয়েছেন সেগুলি বস্ত্রতঃ শ্বেত হস্তী নহে। কালে হস্তীর পায়ে চূণ মাখিয়ে শুভ্রবর্ণ করা হয়েছে। তিনি ইহা প্রতারণামূলক মনে করে ক্রোধান্বিত হয়ে এতদ্ উপহার সহ চাকমা রাজার মন্ত্রী চতুর্দ্বয়কে বন্দী করে রাখেন। ধামাংথী বুঝিয়ে দিলেন যে, ইহা চাকমা রাজার শঠতা নহে। এদেশে শ্বেত হস্তী পাওয়া যায় না বিধায় চাকমা রাজা এরূপ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, শ্বেত হস্তী না হলে আরাকানাদীশ্বরের যথোচিত উপঢৌকন হয় না। সুতরাং ইহা মার্জনীয়। তথাপি জেন্দুইজার ক্রোধের উপশম হল না। তিনি চাকমা মন্ত্রীদের ছেড়ে দিল না। ইতিমধ্যে এই সংবাদ আরাকান রাজার নিকট পৌঁছিলে তিনি জেন্দুইজাকে ধামাংথীর হস্তে পুনঃ চট্টগ্রামের শাসনভার প্রদান করে চাকমা রাজার মন্ত্রীদেরসহ ঢাকায় তৎসমীপে যেতে আদেশ দিলেন।

জেন্দুইজা তখন ভয়ে চাকমা রাজার মন্ত্রীদের বন্ধন মুক্ত করে দিয়ে তাদেরকে বিশেষ যত্নসহকারে নিয়ে ঢাকা উপস্থিত হলেন। তথায় রাজা উভয় পক্ষের বিবরণী শুনে জেন্দুইজাকে ভর্ৎসনা করেন, তুমি রাজ বংশের লোক হয়েও পণ্ডিত ধামাংথীর

কথা শুন নাই, মূর্খের মত অহংকারে হিতাহিত শূন্য হয়ে বিচার না করে, তাহা শুন নাই। তুমি আরো কিছুদিন জ্ঞানী ব্যক্তির সঙ্গে থেকে তাহা জ্ঞান লাভ কর। অতঃপর তাকে চট্টগ্রামের মহাপত্ন্যাসের নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং চাকমা রাজার প্রতি বিশেষ সম্ভ্রম হয়ে চাকমা রাজা জনু (২য়) কে “কোংহ্রাফ্র” (সদাশয়) খেতাব প্রদান করেন। মন্ত্রীগণকেও বহু মূল্যবান পোষাকাদি দ্বারা পুরস্কৃত করে বিদায় দিলেন।

চাকমা রাজা জনুর কোন পুত্র সন্তান ছিল না, মাত্র দুই কন্যা রাজেশ্বী ও সাজেশ্বী। ইতিমধ্যে বড় কন্যা রাজেশ্বীর সাথে তদীয় সেনাপতি বুড়া বর্কোয়া (ভুত্স্যা) এর বিবাহ হয়ে যায়। আরাকান রাজ মিনবাথী বিজিত রাজ্য পরিদর্শনের পর ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পথে চট্টগ্রাম পৌছলে চাকমা রাজা জনু (২য়) তদীয় কন্যা সাজেশ্বীকে (মগেরা বলেন সাজাইংয়ু) আরাকান রাজার সাথে বিবাহ দেন। রাজা জনু নিজ কন্যার সহিত আরাকান রাজার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। পরাক্রমশালী আরাকান রাজাকে আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ করে রাজা জনু নিজের শক্তি, সম্মান ও ব্যক্তিত্ব বৃদ্ধি করেন এবং অত্র এলাকায় বিশেষ প্রভাবশালী হন, তদীয় অধিকৃত রাজ্য প্রায় স্বাধীনভাবে শাসন করতে থাকেন।

রাজা জনুর রাজত্ব কালে ত্রিশক্তি ত্রিপুরা মহারাজ, বাংলার নবাব ও আরাকান রাজার মধ্যে চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে বার বার যুদ্ধ বিদ্রোহ হলেও তিনি এই যুদ্ধের ব্যাপারে নিরপেক্ষ ছিলেন। বিশেষতঃ তার রাজ্য এলাকাটি চট্টগ্রামের উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় চট্টগ্রাম যুদ্ধক্ষেত্র থেকে অনেক দূরে স্থিত ছিল।

তার রাজত্বকাল ১৫২২, ১৫৩৬ ও ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান ও ত্রিপুরা রাজার সাথে উপর্যুপরি যুদ্ধ এবং ১৫২২ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরা রাজ দেব মানিক্য ও নহরত শাহের পুত্রের সঙ্গে একই সনে দুই বার চট্টগ্রাম হাত বদল হয়। রাজা জনুর সময় ১৫২৪ ও ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে দুইবার পাঠান শক্তি চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মদ খাঁ সুর যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে নিজেই গৌড়ের স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন। ইহাতে দিল্লীর বাদশাহের সেনাপতি হিমু তাকে ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন।

রাজা জনুর সময় হতে অথবা তৎপরবর্তী সময়ে চাকমা রাজাদের সাথে আরাকান রাজার তেমন যুদ্ধ বিদ্রোহ ঘটেনি। চাকমা রাজারা আরাকান রাজার সাথে সখ্যতা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন অথবা আরাকান রাজার করদমিত্র তাবেদার রূপে চাকমা রাজা শান্তিতে রাজত্ব করেন। দেশে তখন উন্নতি ও সমৃদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিক ও বিজাতীয় লেখকেরা এই সময়টায় মগ ও চাকমাদের একই মগ সংজ্ঞাভুক্ত করায় চাকমাদের গৌরবোজ্জ্বল কাহিনী বর্ণিত বা লিপিবদ্ধ হয়নি। শুধু পাঠান মোগল যুগে নয়, বৃটিশের রাজত্ব কালে চাকমা রাজা জান বক্স খাঁকে রানুনিয়ার মগ রাজারূপে চিত্রিত করা হয়েছে (১৭৮২-১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে)। চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে এখনও চাকমা রাজার ও চাকমাগণের বহু স্মৃতি পড়ে রয়েছে যাহা এখন

চাকমারা স্মরণ পর্যন্ত করতে পারছেন না; যেমন- রাজার কুল, চাকমাকুল, রাজার বিল, পাগলা বিল, হাঙর কুল, নাগেটেগে প্রভৃতি।

রাজা জনুর প্রধান ও শেষ কীর্তি আরাকানরাজ মিনরাজাধীর আমলে বৃদ্ধ বয়সে নব যৌবনের শক্তি নিয়ে ১৫৯৮/৯৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার পক্ষে ৩০,০০০ (ত্রিশ) হাজার সৈন্যের সেনাপতিত্ব বরণ করে পেগুরাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। এই যুদ্ধে পেগুরাজ নন্দ বাইংকে পরাজিত ও পরে হত্যা করা হয় এবং রাজার এক কন্যা ও রাজপুত্রকে বন্দী করে এনে কয়েক হাজার প্রজা সহ আরাকান রাজার সমীপে অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে আরাকান রাজা ঐ রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং রাজপুত্রকে চট্টগ্রামের গভর্নর নিযুক্ত করেন। তারই পরবর্তী বংশধর বর্তমানে বান্দরবানের বোমাং রাজ পরিবার ও রাজন্যবর্গ।

রাজা জনুর সময় দেশে কিছুটা শান্তি ছিল বলে ধারণা করা যায়। তার সময় ভেনিসের পরিব্রাজক মি. মিসিয়া ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম সহ চাকমা রাজ্য পরিভ্রমণ করেন বলে জানা যায় এবং ইংরেজ পর্যটক রালফ পীচ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে চাকমা অধিকৃত রামে রাজাকে আরাকানের অধীনে দেখতে পান। তখন টেকনাফ অবধি চাকমা রাজ্য বিস্তৃত ছিল। রামে রাজা অর্থ রামু রাজা চাকমা রাজা বলে প্রমাণ হয়।

বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা তার বহি “চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস” বইতে জনুর রাজত্বকালের ভিতর জনুর রাজত্ব সঙ্কুচিত করে আরো ৩ জন চাকমা রাজার নামে অনেকটা জোর করে ঢুকিয়েছেন। আমি এ ব্যাপারে জীবিতকালে তার সাথে আলাপ করেছিলাম। তিনি কিভাবে জ্ঞাতি গোত্রহীন, সম্মান বিহীন এ তিন রাজার নাম উপাখান, উদং ও কংহ্লা প্রকে রাজা হিসাবে ঢুকিয়ে দিলেন। বিশেষতঃ ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজা জনুকে আরাকান রাজ মিনবাহী রাজার কন্যা সাজেশীকে বিবাহ করে খুশী হয়ে তাকে “কংহ্লা প্র” খেতাব প্রদান করেন (তার বহি পৃঃ ১৫৩) এবং সেই কংহ্লাপ্র খেতাবে নতুন রাজা সাজিয়ে ১৫৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে পেগু আক্রমণ করতে পাঠালেন জনু বা কংহ্লা প্রর হয়তো বয়স একটু বেশী হতে পারে। আব্বাসীয় সম্রাট মারোয়ান (২য়) ৮০ বৎসর বয়সে দক্ষতার সাথে যুদ্ধ করে ইংল্যান্ডের রাজাকে পরাভূত করেন সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে। তিনি বাবু সুগত চাকমা এর “মোনকধা” নামক সাময়িকীতে (১৯৯১ ইং) এ প্রকাশিত চাকমাদের ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাস নামক প্রবন্ধে উল্লেখিত তথ্যানুযায়ী লিপিবদ্ধ করেছেন বলে জানান। আমি বাবু সুগত চাকমার ঐ মূল প্রবন্ধটাও পাঠ করিয়াছি। তিনি (সুগত বাবু) ও তার প্রবন্ধে নিশ্চিত হতে পারেননি উক্ত চাকমা রাজা ‘কংহ্লাপ্র’ কি নাম, নাকি উপাধি? উপাধি হলে কার উপাধি? এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য মতে একমাত্র চাকমা রাজা জনুই ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজ থেকে কংহ্লা প্র খেতাবটা পান; দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি বা রাজা কংহ্লাপ্র খেতাব পাননি। যদি একই কংহ্লা প্র বা জনু ১৫৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান রাজার

পক্ষে সেনাপতিত্ব বরণ করে পেণ্ড যুদ্ধ করতে যান তার রাজত্বের মাঝখানে চাকমা রাজা হিসাবে উপাখান ও উদং এর রাজত্ব করার কোন সুযোগ নেই। উপাখ্যান ও উদং রাজার কাজ পরিচালনা করে থাকলে উপ-রাজা বা আঞ্চলিক রাজা ছিলেন। যেমন রাজা সুখদেব রায় রাজা না হয়েও প্রজা ও বিদেশীদের নিকট রাজা ছিলেন এবং মোগল সরকার থেকে খেতাব পান। রাজা সুখদেব রায় ছিলেন রাজা সের মুস্ত খাঁ এর ভ্রাতৃপুত্র, দস্তক পুত্র ও জমিদার। রাজার মৃত্যুর আগে তার মৃত্যু হওয়াতে তিনি রাজা হতে পারেন নি। উপাখ্যান ও উদং রাজার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কোন যোগসূত্রে জানা যায়নি। ‘কংহলাগ্র’ খেতাব এর সিদ্ধান্ত ও সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে চাকমা রাজ সিংহাসনে বসান কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরো গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে উত্তরের এক সাক রাজা (সাকমাঙ) রামু পর্যন্ত জয় করেন বলে স্যার আর্থার পি ফেইরী সাহেব উল্লেখ করেছে। অনেকে ঐ সাক কি রাজা চাকমা রাজা বলে মন্তব্য করেছেন। চাকমা রাজা ঐ এলাকার রাজা হয়ে করদমিত্র রাজা হয়ে, কেন নিজ রাজ্য আবার জয় করবে? বাঙ্গালীরা বিশেষতঃ চট্টগ্রামের লোকেরা পাহাড়ীদের দেখলেই জুম্ম বলে সম্বোধন করেন। তারা সকলে পাহাড়ীদের জুম্ম বলে থাকেন। এভাবে হয়তো তারা ত্রিপুরার রাজা বিজয় মানিক্যকে সাক রাজা বলেছেন যিনি ১৫৪৬ খৃষ্টাব্দে রামু জয় করেছিলেন। সেই বিজয় মানিক্য ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে আবার একবার চট্টগ্রাম জয় করেছিলেন। তখন কিন্তু রামু পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছেন কিনা জানা যায়নি।

(১) রাখাইন বৌদ্ধ ভিক্ষু চান্দামালা লংকরা তার সংকলিত “রাখাইন রাজাওয়াং সাইক্যম” (১৯৩১ খ্রি:) গ্রন্থে উপাখ্যান ও রাজা উদং এই দুটি ব্যক্তি বা শাসকের নাম উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য যে, আরাকানী ইতিহাস ও উপরাজা বলতে সামন্ত রাজা অর্থাৎ উপ শব্দটি অধস্তন অর্থে ব্যবহারিত হয়।

(২) এ বিষয়ে Sir. A. P. Phayre তার লিখিত “History of Burma (1883)” গ্রন্থে লিখেছেন- While Meng Beng (the king of Arakan) was thus engaged an enemy had appeared from north, called in the Arakan history, the Thek or Sak king by which term the Raja of Tippera appears to be meant. He had penetrated to Ramu.

While the sieze was (1546) by Burmese king Tobinshweti agaist Arakan, the Raja of Tripura invaded Chittagong and Ramu with his wild tribeman but again victory was on the side of Arakan.

রাজা জনু পরলোক গমন করলে রাজ পরিবারে কোন পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকায় জামাতা সূত্রে বুড়া বর্কোয়া/বরবুয়া (ভুত্স্য) রাজ্যভার গ্রহণ করেন। তিনি অল্পকাল রাজত্ব করেন বলে জানা যায়। তার সময়ে দেশে মোটামুটি শান্তি বিরাজ করতেন। বড়ুয়া জাতি বা বড়ুয়া সমাজে অনেকে বুড়া বর্কোয়াকে (ভুত্স্যকে) বড়ুয়া জাতির লোক বলে দাবী করেন এবং কয়েকজন চাকমা রাজা বড়ুয়া জাতির লোক বা বংশধর বলে দাবী করেন। দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলেও বাংলাদেশের বড়ুয়া জাতির লোকেরা কোন মূল জাতি হতে এসেছেন, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন, তাহা এখনও পর্যন্ত বড়ুয়া জাতির লোকেরা বা ঐতিহাসিকগণ সঠিকভাবে প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি; এমন কি ‘বড়ুয়া’ নামটা নিয়ে পর্যন্ত এখনও একমত বা সিদ্ধান্ত হয়নি।

চাকমা রাজার সেনাপতি, জামাই পরে রাজা বুড়া বরবুয়ার/বর্কোয়ার নামটার উচ্চারণ ও অর্থ নিয়ে যতসব গোলমাল। চাকমা কথায় ‘বরবুয়া’ অর্থ বড় বা বড়টা, জ্যেষ্ঠ ইংরেজীতে যাকে Elder or Senior বলা হয়। ইহার বিপরীত চিগনুয়া অর্থ ছোট, কনিষ্ঠ ইংরেজীতে যাকে Junior or Younger বলা হয়। বুড়া বরবুয়া ছিলেন পিতার জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাই তাকে বুড়া বরবুয়া ডাকা হয়। আধুনিক লোকেরা বুড়া বরবুয়াকে বুড়া বর্কোয়া/বড়ুয়া লিখে বড়ুয়া জাতিতে রূপান্তর করার প্রয়াস পান। বড়ুয়া চাকমা কথায় কোন অর্থ নেই বা অর্থ হয় না। বরবুয়া গুণবাচক শব্দ, জাতি বাচক শব্দ নয়। ঐতিহাসিক তথ্যমতে বুড়া বরবুয়া আরাকান মগের বংশধর। তারা চাকমা জাতিতে প্রবিষ্ট হন। বুড়া বরবুয়া এর পিতা দ্বিতীয় রণপাগলা প্রথম রণপাগলার বংশধর বটে। বুড়া বরবুয়া একজন বিচক্ষণ, দক্ষ ও জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তার জ্ঞান ও দক্ষতার গুণে রাজার সেনাপতিত্ব লাভ করেন এবং পরে রাজকন্যা রাজেশ্বীকে বিবাহ করেন; এমন কি পরবর্তীতে চাকমা রাজগদীও লাভ করেন। বুড়া বরবুয়াও প্রায় তার সকল আত্মীয়রা চাকমা রাজার যাবতীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োগ পান এবং যাবতীয় রাজস্ব খাজানা থেকে মণ্ডকুফ (রেহাই) পেতেন। তারা প্রায় রাজার পক্ষ থেকে সেনাবাহিনীর কাজ করতেন। বুড়া বরবুয়া থেকে বর্কোয়া গব্বার উৎপত্তি হয়। খাজানা মণ্ডকুফের জন্য অন্যান্য গব্বার লোকেরা এমন কি মগ, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যাও এই গোষ্ঠীতে প্রবিষ্ট হন। তাই বর্কোয়া গব্বার লোক সংখ্যা সাধারণতঃ অন্যান্য গব্বার চেয়ে অধিক। সুতরাং বড়ুয়া চাকমা রাজা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। এই বুড়া বরবুয়ার বংশে মাত্র এই রাজা ছিলেন। বুড়া বরবুয়া নিজে ও তার ছেলে সাতুয়া বর্কোয়া (পাগলা রাজা) সাতুয়া বর্কোয়া (সাথোয়াই) পাগলা রাজার মৃত্যুর পর এই বংশের সমাপ্তি ঘটে। শুধু অর্থ ও নামের উচ্চারণের বিভ্রাটের জন্য এই বিতর্কতা সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য অতীত কাল থেকে বড়ুয়া জাতির লোকেরা চাকমা রাজার পাশে পাশে ছিলেন এবং এখনও দেখা যায়। শুধু বর্কোয়া গব্বার নয়, ধামাই গব্বা, লার্মা গব্বা ও অন্যান্য গব্বাতেও মগ ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা গোষ্ঠীর লোকেরা চাকমা গব্বায় প্রবিষ্ট হয়েছেন, আরাকানি মগ কেরেংগিরি ধামাই গব্বায় প্রবিষ্ট তার অধস্তন পুরুষ মতিলাল চাকমা (মতিলাল কেরানী) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং শাকেন্দু বিকাশ চাকমা, বি-কম, শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী করেন।

৪। রাজা সান্তয়া (সাথোয়াই) পাগলা রাজা (১৬০১-১৬২৪ খৃঃ)

রাজা জনুর (২য়) কোন পুত্র সন্তান ছিল না। তার মৃত্যুর পর জামাই ও সেনাপতি বুড়া বর্কোয়া/বরবুয়া কিছুকাল রাজত্ব করান্তে তারই ছেলে সান্তয়া (সাথোয়াই) রাজার নাতি ও দৌহিত্র সূত্রে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। তিনি বিদ্বান, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও প্রবল পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্য মতে তিনি আরাকানের অধীনতা পাশ ছিন্ন করেন এবং প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করেন। তার ভয়ে মগ রাজা পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকতেন। সেই সময় মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুরা চট্টগ্রাম তথা বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে লুণ্ঠরাজ করতো এবং সুযোগ পেলে নারী-পুরুষ অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে অন্য দেশে বিক্রি করে দিত। চাকমারা এদেরকে ‘মিজিলিক’ বলতো। তিনি তাদের দৌরাভ্য দমন করেন এবং রাজা সান্তয়ার ভয়ে তারা সর্বদা সন্ত্রস্ত থাকতো। এতদ্ব্যতীত তিনি একবার পর্তুগীজদের সহায়তায় চট্টগ্রাম শহর লুণ্ঠন করেছিলেন এবং চট্টগ্রামের মগ শাসন কর্তাকে আক্রমণ করেছিলেন। ইহাতে মগ শাসনকর্তা মুকুটরায় পলাইয়া যান। এভাবে তিনি তার শাসন সুদৃঢ় করেন এবং দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরে আনেন।

রাজা সান্তয়া এত জ্ঞানী শূণী নরপতি হয়েও তার বিগোয়ান্ধক নাটকও শেষ পরিণতি খুবই হৃদয় বিদারক ভাবে সমাপ্তি হয়। কথিত আছে সান্তয়া কোন এক সাধক ঋদ্ধি সম্পন্ন গুরু হতে জ্ঞান লাভ করে ধ্যান সমাধি করতেন। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে সময়ে বস্ত্র অন্তরালে গোপনে নিশ্চল অবস্থায় ধ্যান সমাধি করতেন। বিষয়টি রানীর দৃষ্টিতে এসে যায় এবং এতে রানীর বিশেষ কৌতূহল ও বিস্ময় উৎপাদন হয়। একদিন রাজা এভাবে ধ্যান সমাধি করার সময় রানী হঠাৎ পর্দা উন্টিয়ে দেখেন এবং দেখতে পান যে, রাজা অন্তরের কলিজা বের করে তাহা ধৌত করতেছেন। ইহাতে রানী ভয়ে চীৎকার করে উঠলে রাজার সমাধি ভঙ্গ হলে এ কলিজা আর স্বস্থানে সন্নিবেশিত করতে পারেননি। ফলে রাজার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। পরিণতিতে রাজা বিনা দোষে বহুলোককে শাস্তি ও হত্যা করতে আরম্ভ করেন। এতে রাজ পরিবারে ও রাজ্যে বিরাট অশান্তি ও বিশৃংখলা দেখা দেয়। রাজা তার বিশ্বস্ত মন্ত্রী দশবিজ্যা ধাবেংকে হত্যা করেন এবং তার নয়টা সন্তানকে কেটে ফেলেন। ঘটনাক্রমে একটা সন্তান বিনা ধাবেং বেঁচে যান। এই বিনা ধাবেং বুংগঝা ও রাঙী গঝার আদি বংশধর। পরিশেষে রাজার ঈদৃশ অত্যাচার সহ্য করা সম্ভব নহে বিধায় মন্ত্রী, সর্দার ও প্রজাগণ রাজাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং রাজাকে কৌশলে হত্যা করে মাটিতে পুঁতে রাখেন। প্রবাদ আছে যে, এক রাত্রির পর কবর খুঁড়ে দেখা যায় কর্তিত মস্তক দেহে জোড়া লেগেছে। তারপর তারা রাজার দেহকে সাত খন্ড করতঃ সাতটা বিভিন্ন পাহাড় ও ডোবায় পুনঃ কবর দেয়। রাজার এই হত্যাকাণ্ডে লারমা গঝার লোকেরা অংশ গ্রহণ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। উক্ত লারমা গঝায় এখনও “রাজা-কাবা” গোষ্ঠীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় এবং এখনও ঐ নামে পরিচিত।

এই রাজাকে (পাগলা) হত্যা করার ব্যাপার নিয়ে রাজ পরিবারে ও রাজ্যে বিরাট গোলমাল দেখা দেয় পাগলা রাজার দুই পুত্র চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ এবং এক কন্যা অমঙ্গলী (নাম জানা যায় নি)। এই ডামাদোলে ও গোলযোগে সর্দার ও প্রজা বিদ্রোহে পাগলারাজা সহ তার দুই সন্তান চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ নিহত হন। ভাগ্যচক্রে রানী একমাত্র কন্যা অমঙ্গলীকে (কিশোরী) নিয়ে হিল-ত্রিপুরা পলায়ন করে আত্মরক্ষা করেন। তৎকালীন সময়ে কর্ণফুলী নদীর উত্তর কূল ত্রিপুরা রাজ্যের অধীনে ছিল।

রানী তার কন্যা অমঙ্গলীকে নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ ও প্রাণ রক্ষা করেন। তথায় বয়ঃপ্রাপ্ত হলে রানী রাজকুমারী অমঙ্গলীকে কুন্তর্য্যা নামক তথাকার এক রাজ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ত্রিপুরার সঙ্গে বিবাহ দেন। কুন্তর্য্যার প্রকৃত নাম জানা যায়নি। কালে অমঙ্গলীর গর্ভে কুন্তর্য্যার ঔরসে এক পুত্র জন্মিলে তার নাম রাখা হয় পীড়াভাঙ্গা। দুভাগ্যক্রমে অল্প কালের মধ্যে কুন্তর্য্যার, অকাল মৃত্যু হলে রাজ কুমারী অমঙ্গলী ভীষণ কষ্টে ও অসুবিধায় পতিত হন। এভাবে রাজ কুমারী অমঙ্গলী স্বজাতীয় বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় কুটুম্ব হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতিকষ্টে কালাতিপাত ও দিন যাপন করতে থাকেন। কুন্তর্য্যার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বিজাতীয় আত্মীয়রা তাকে অবজ্ঞা করতে থাকেন।

পাগলা রাজাকে হত্যার পর রাজ্যে বিরাট বিশৃংখলা ও গোলযোগ চলতে থাকে। পরবর্তী কে রাজা হবেন তাই নিয়ে এত বিপদ ও গোলমাল। অমাত্যরা সকলে রাজা হতে চান। পর পর কয়েক জনকে রাজ গদীতে বসান ও বহিষ্কার করার পর কোন যোগ্য জনকে রাজা পাওয়া গেল না। দেশে বিরাট অরাজকতা ও অশান্তি চলতে থাকে। বহু নিরপরাধ ব্যক্তি নিপীড়িত, অত্যাচারিত হয়ে স্থানান্তরে চলে যেতে বাধ্য হন। অবশেষে সর্ব সাধারণ ও অমাত্যদের মধ্যে ভূতপূর্ব রাজা ও রাজপুত্রগণকে হত্যা করার জন্য অনুতাপ ও অনুশোচনা জাগে। নির্দোষ রাজরানী ও অসহায় রাজকুমারী অমঙ্গলী তাদের দ্বারা অত্যাচারিত ও প্রাণহানি আশংকায় বিদেশে পলাতে বাধ্য করা হয়েছিল। যেন ইহার ফলেই তাদের ও দেশে এতবিধ দুর্গতির কারণ হয়েছে মনে করে অনেক প্রায়চিত্ত স্বরূপ তারা রাজরানী ও রাজ কুমারী অমঙ্গলীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। পরিশেষে রাজ কুমারী অমঙ্গলীকে বৈধব্য ও অসহায় অবস্থায় জ্ঞাত হয়ে তাকে ও তার মাকে ফিরে আনা হল। অতঃপর রাজ কুমারী অমঙ্গলীকে সকলের মতামত নিয়ে মুলিমা থংজা নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হল এবং বুড়া রানীকে রাজ্যভার দেওয়া হল (১৬২৪-১৬৪০ খৃঃ) রাজকন্যা অমঙ্গলীর গর্ভে ও মুলিমা থংজার ঔরসে ধাবানা জন্মগ্রহণ করেন। ধাবানা ও পীড়াভাঙ্গা একই মাতার সন্তান বলে উভয়ে সহোদর ভাই ছিলেন। মুলিমা থংজা এর নামে মুলিমা গঝা। ধাবানার নামে ধাবানা গোষ্ঠী উৎপত্তি হয় এবং পীড়াভাঙ্গার নামে ধামাই গঝার পীড়াভাঙ্গা গোষ্ঠী উৎপত্তি হয়। রাজকন্যা পুত্রগণের বয়োপ্রাপ্তির পূর্ব পর্যন্ত রানী রাজ্য পরিচালনা করেন। রানীকে কাউয়া রানী বলা হত। রানীর আসল নাম জানা যায় নি।

চতুর্থ অধ্যায় ৫। রাজা ধাবানা (১৬৪০-১৬৬০ খৃষ্টাব্দ)

রাজকুমারী অমঙ্গলীর স্বামী মুলিমা থংজা মুলিমা গঝা ও ওদের গর্ভে ও ঔরসে জন্ম ধাবানার নামে চাকমাদের মুলিমা গঝা ধাবানা গোষ্ঠীর উৎপত্তি। এই ধাবানা গোষ্ঠীর রাজারা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ প্রায় ২০০ (দুইশত) বৎসর এর অধিক সময় গৌরবের সহিত চাকমা রাজ্য শাসন করেন। এই বংশে ১৪ (চৌদ্দ) জন রাজা রাজত্ব করেন। তারা ৩ (তিন) বৃহৎ শাস্তিচুক্তির পাশাপাশি সুলতানী শাসন (নবাব), মোগল আমল ও বৃটিশ সরকার আমল পর্যন্ত দেশ শাসন করেন। তাহা ছাড়াও আরাকান রাজ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র সব সময় চাকমা রাজ্যের উপর প্রভুত্ব চালাতে উৎসুক ছিলেন।

রানী কাটুয়া রানী বেশ কয়েক বৎসর রাজত্ব করার পর বার্ষিক্যাবস্থায় উপনিত হলে এবং রাজপুত্র ধাবানাও কিশোর বয়স পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করলে অমাত্যগণ ও প্রজাবৃন্দ রাজকুমারী অমঙ্গলীর পুত্র ধাবানাকে রাজ সিংহাসনে বসাতে চাকমাদের এক ঐতিহাসিক কিম্বদন্তি রয়েছে। কথিত আছে এক সময় রাজ্যের অমাত্যবর্গ ও দলপতিরা মিলিত হয়ে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। তাদের সভায় সাব্যস্ত হয় যে, তাদের মনোনীত ৫ জনের মধ্যে যিনি কোন বাধা-বিঘ্ন নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে শুভলগ্নে অতি প্রত্যুষে দরবার সিংহাসনে বসতে সক্ষম হবেন, তাকে রাজা অভিষিক্ত করা হবে। যথা সময়ে দরবারে একখানা রাজাসন ও অপর ৪ খানা বসার আসন তৈয়ার করা হয়। উক্ত প্রস্তাবে ধূর্য্যা, কুর্য্যা, পীড়া ভান্সা, ধাবানা ও নেন্দাবকে নেওয়া হল। প্রজাগণ জাগ্রত থেকে সারারাত্রি দরবার রাখার ও পাহারা দেয়। সর্বাত্মে ধূর্য্যা রাত্রিশেষে মাথায় পাগড়ি বেঁধে দরবার ভবনে উপস্থিত হয়ে দেখেন যে, সিংহাসন খালি। সকল আসনই খালি আছে। তার অগ্রে কেহ আসেননি। সুতরাং তিনি রাজাসনে বসে পড়েন। তারপর রাত্রিশেষে ভোরের আভাস পেয়ে পীড়াভান্সা দরবারে এসে উপস্থিত হন। তিনি তার আগে কে এসে সিংহাসনে বসে পড়েছেন চিনতে পারেননি। তিনি আসনে বসবার সময় পিঁড়ির ঠিক স্থানে না বসে পিঁড়ির কাচাতে (একাংশে) বসার দরুণ চিৎ হয়ে পড়ে যান। পরে তিনি উঠে বসেন। তার প্রকাণ্ড শরীর ছিল। এইসব প্রজারা পাহাড়ায় সব লক্ষ্য করতেছিল। তারপর ধাবানা গিয়ে উপস্থিত হন এবং পিঁড়িতে বসেন। এইরূপে পরপর সকলেই দরবারে উপস্থিত হয়ে পিঁড়িতে বসেন। রাত্রি প্রভাত হল। ধূর্য্যার মাথায় পাগড়িখানা চিত্রিত অবস্থায় দেখা যাচ্ছিল। পরিষ্কার প্রভাত হলে সকলেই দেখল, ধূর্য্যার মাথার পাগড়িখানা স্ত্রীলোকের বুক বাঁধনী কাপড় খাদি কাপড়। পরিতাপের বিষয় ধূর্য্যা নিদ্রা হতে চেতন প্রাপ্ত হলে উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ততার দরুণ অন্ধকারে তার স্ত্রীর বুক বাঁধনী খাদি

কাপড়টি তাড়াতাড়ি মাথায় বেঁধে গিয়েছিলেন। সুতরাং দরবারে সমালোচনা হয় যে, ধূর্য্যার যাত্রা খারাপ হয়েছে। ধূর্য্যা সর্বাত্মে উপস্থিত হয়ে রাজ্যসনে বসতে সক্ষম হলেও জীলোকের কাপড় মাথায় তোলাতে দোষনীয় হয়েছে। পীড়াভাঙ্গার যাত্রাও ভাল হয়নি। তিনি পিঁড়িতে বসতে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল। সুতরাং উভয়কে রাজা করা যায় না। সুতরাং সর্ব সম্মতিক্রমে ধাবানাকেই রাজা মনোনীত করা হল। ধূর্য্যাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ দেওয়া হল এবং পীড়াভাঙ্গা, কুয়্যা ও নেন্দাবকেও অন্যান্য পদে মন্ত্রী দেওয়া হল।

কাটুয়া রানী পরে পাগলা রাজার একমাত্র জীবিত কন্যা অমঙ্গলীর ছেলে ধাবানাকে আনুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা করা হল। তিনি প্রজারঞ্জক রাজা ছিলেন এবং সকল জাতির প্রতি সমান ব্যবহার করতেন। তার সময় প্রজারা অনেকটা সুখে ছিলেন। রাজা ধাবানা উপযুক্ত ও ক্ষমতা সম্পন্ন রাজা ছিলেন। তার সময়কাল সুরেশ্বরী নামে এক যোদ্ধা ও সেনাপতি ছিলেন। তিনি তাকে দিয়ে রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী গড়ে তোলেন। রাজা ধাবানার সময়ও আরাকান ও মোগলদের যুদ্ধ স্থগিত হয় নাই। একে অপরের উপর হামলা, আক্রমণ ও যুদ্ধ ঘোষণা চলতেছিল। এ সময় চাকমারা ভূমি চাষে মনোযোগ দিলেও এই অশান্তির সময় বিস্তৃতি লাভ করে নাই। চাকমারা চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে পাগলাবিল, রাজা বিল আবাদ করেছিলেন কিন্তু দুর্খোগের দরুণ বহুলোক পাহাড়ের অভ্যন্তরে নিরাপদে স্থানে গিয়ে জুমচাষ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ধাবানার পুত্র ধরম্যা মুসলমান মেয়ে পাণি গ্রহণ করেছেন বলে জনশ্রুতি আছে। ঐতিহাসিক ও লেখকগণ কেহ কেহ সম্রাট আওরঙ্গজেবের ভাই বাংলার সুবা (গভর্নর) শাহ সুজার মেয়েকে বিবাহ করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন। ইহা ভুল প্রমাণিত হয়েছে বার্মা আরাকানের তৎকালীন প্রশাসক লেঃ কর্ণেল আর্থার পি প্রেরী রিপোর্ট মূলে। তিনি রিপোর্ট করেছেন যে, শাহ সুজা তার স্ত্রী, ৩ কন্যা ও ২ পুত্র সহ ঢাকা থেকে পলায়নের পথে রওনা দিয়ে তারা আরাকান রাজার রাজধানী ত্রোহং/ব্রডিক (পাখরী কিন্না) এ সকলে নিরাপদে পৌঁছেন, দুর্ঘটনা মূলক অবস্থায় পড়ে সেখানে শাহ সুজার ৩ কন্যাসহ সকলে সেখানে মৃত্যু হয়। বিস্তারিত তথ্য এই বই এর “প্রাক-কথন” উপস্থাপনের দ্রষ্টব্য দেখতে পারেন। তবে ধরম্যা অন্য কোন একজন সম্ভ্রান্ত মোগল রমণী বিয়ে করেছেন- ধারণা করা যায়। ধরম্যার ছেলের নাম মোগল্যা রাখা হয় এবং পরবর্তীতে চাকমা মেয়েদের নামে শেষে বিবি বা বি সংযোজন করা হয়। এই রীতি এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাহা ছাড়া আগে চাকমা মেয়ের মৃত্যু হলে দাহ করা হতো না এবং পশ্চিম মাথা রেখে কবর দেওয়া হতো। এইগুলি ঐ মহিলারই বিবাহের সময় শর্তাবলী।

মুলিমা গঝা ধাবানা শুস্তি চাকমা রাজা ও রাজতুকাল
(১৬৪০ - ১৮৩২ ইং সন)

ক্রঃ নং	রাজাগণের নাম	পূর্ববর্তী রাজার সঙ্গে সম্পর্ক	রাজতুকাল	রাজধানী	মন্তব্য
১.	রাজা ধাবানা রাজা	নাতি ও দৌহিত্র	১৬৪০ - ১৬৬০ খ্রীঃ	মানিকপুর, আলীকদম	১ম রাজা এই শুস্তির
২.	রাজা ধরম্যা	ছেলে	১৬৬০- ১৬৮৪ খ্রীঃ	ঐ	২য় রাজ
৩.	রাজা মোগল্যা	ছেলে	১৬৮৪ - ১৭১২ খ্রীঃ	ঐ	মোগল্যার পুত্র : (১) সুভল খাঁ (২) জালাল খাঁ (৩) ফতে খাঁ
৪.	রাজা সুভল খাঁ	ছেলে	১৭১৩ - ১৭১৪ খ্রীঃ	সুখ-বিলাস ও রোয়াং (মানিকপুর)	
৫.	রাজা জালাল খাঁ	ভাই	১৭১৫ - ১৭২৫ খ্রীঃ	ঐ	জালাল খাঁ এর ছেলে সের জব্বর খাঁ
৬.	রাজা ফতে খাঁ	ভাই	১৭২৫ - ১৭৩৫ খ্রীঃ	সুখ-বিলাস ও রাজানগর	ফতে খাঁ এর ৩ পুত্র (১) সেজ্জর্ন খাঁ (২) সের মুস্ত খাঁ (৩) ওর মুস্ত খাঁ
৭.	রাজা সেজ্জর্ন খাঁ	ছেলে	১৭৩৫ - ১৭৩৭ খ্রীঃ	ঐ	সুখ দেব রায় ওর মুস্ত খাঁ এর ছেলে
৮.	রাজা সেরমুস্ত খাঁ	ভাই	১৭৩৭ - ১৭৫৮ খ্রীঃ	মানিকপুর রোয়াং ও সুখ বিলাস	
৯.	রাজা সের জব্বর খাঁ	পিতার ভাই-পো	১৭৫৮ - ১৭৬৫ খ্রীঃ	সুখ-বিলাস ও রাজানগর	জালাল খাঁ এর ছেলে
১০.	রাজা সের দৌলত খাঁ	ছেলে	১৭৬৫ - ১৭৮২ খ্রীঃ	সুখ-বিলাস ও রাজানগর	জালাল খাঁ এর ছেলে
১১.	রাজা জান বক্স খাঁ	ছেলে	১৭৮২ - ১৭৯৭ খ্রীঃ	সুখ-বিলাস ও রাজানগর	জান বক্স খাঁ এর ৪ পুত্র (১) টকর খাঁ (২) জব্বর খাঁ (৩) দোল পেদা (৪) ছলা জব্বর

ক্রঃ নং	রাজাগণের নাম	পূর্ববর্তী রাজার সঙ্গে সম্পর্ক	রাজত্বকাল	রাজধানী	মন্তব্য
১২.	রাজা টক্কর খাঁ	ছেলে	১৭৯৮ - ১৮০১ খ্রীঃ	রাজা নগর ও রাস্তামাটি	
১৩.	রাজা জক্কর খাঁ	ভাই	১৮০১ - ১৮৩২ খ্রীঃ	রাজা নগর ও রাস্তামাটি	
১৪.	রাজা ধরম বক্স খাঁ	ছেলে	১৮১২ - ১৮৩২ খ্রীঃ	ঐ	একমাত্র কন্যা মেনকা ওরফে চিকনবি

৬। রাজা ধরম্যা (১৬৬১-১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ)

রাজা ধাবানার মৃত্যুর পর তার পুত্র ধরম্যা আনুমানিক ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তার রাজত্ব কালেই বাংলার নবাব সুবেদার সায়েস্তা খাঁর পুত্র মোগল সেনাপতি বুজুস উমেদ খান আরাকান রাজ শক্তিকে পরাভূত করে ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামসহ দক্ষিণে শঙ্খ নদী পাড় পর্যন্ত জয় ও দখল করেন। মোগল শক্তিকে মজবুত করার লক্ষ্যে শঙ্খ নদী পাড়ে স্থায়ী গ্যারিসন স্থাপন করা হয়। ইহার পর আরাকান রাজা আর চট্টগ্রাম দখল করতে পারেননি। চিরতরে চট্টগ্রামকে হারান। মোগল কর্তৃপক্ষ সেখানে স্থায়ীভাবে “দুই-হাজারী” পদ মর্যাদায় সৈন্য ও সেনা বাহিনী নিয়োগ করেন। সেই “দুই-হাজারী” থেকে দোহাজারী নামটা হয়। তৎপরবর্তী দক্ষিণ অংশে চাকমা রাজার দখলে ছিল এবং তথায় চাকমা প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতেন। চাকমা জাতি ইতিহাসে দুইটা শীল মোহর রাজকীয় চিহ্ন সূচক সিংহধ্বজায় প্রকাশ আছে। তৎকালে সাধারণ হনুমান ধ্বজ, সিংহধ্বজ, সূর্য্যবান, চন্দ্রবান প্রভৃতি চিহ্ন ক্ষিত চাপগুলি স্বাধীন রাজারা ব্যবহার করতেন। ঐ দুইটা শীল মোহর রাজা ধরম্যার বলে জানা যায়। রেভেনিউ বোর্ডের পত্রে অনেকটা তাহাও প্রমাণ করে।

এক সময় মোগলের এক যুদ্ধে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলের রামু দুর্গ দখল করেন কিন্তু বর্ষাকাল আগমনের সুযোগে চাকমারা পুনঃ তাহা অধিকার করেন। পরবর্তীতে চাকমা রাজার সঙ্গে সখ্যতা সৃষ্টি হওয়ায় চাকমা রাজার মোগলের আর অনেক দিন সংঘর্ষ হয়নি। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম মোগল ও আরাকান রাজার যুদ্ধটা আসলে চাকমা রাজা ও মোগলের সাথে যুদ্ধ হয়। চাকমা রাজা তখন আরাকান রাজার করদ মিত্র বা তাবেদারী রাজা ছিলেন। আরাকান রাজা অনেক দূরে মোহং এ থাকতেন। সীমান্তে করদ মিত্র রাজা হিসাবে চাকমা রাজাকে সব মোকাবেলা করতে হয়। তখন রাজা মোগল্যাই রাজত্ব করতেন এবং মোগলের সাথে এখন কোন গোলমাল হয়নি। তিনি নিরিবিলা রাজত্ব করে যান।

৭। রাজা সুভল খাঁ (১৭১৩-১৭১৪ খৃষ্টাব্দ)

রাজা মোগল্যার মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুভল খাঁ ১৭১৩ খৃঃ রাজ গদীতে আরোহন করেন, তখন আরাকানে মহাদণ্ডবো নামক এক সামন্ত প্রাসাদ রক্ষীদের দমন করে আরাকানের সিংহাসন দখল করেন এবং ১৭১১ খৃষ্টাব্দে চন্দ্র উজিরা নাম ধারণ করে সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি রাজপদ লাভ করে উত্তরাভিমুখে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করতে থাকেন। চাকমা রাজা সুভল খাঁ তার বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। আরাকানের সেনা নায়ক হারিও উত্তরাভিমুখে অভিযানে যোগদান করেন এবং সন্দীপ, হাতিয়া ও চট্টগ্রাম লুণ্ঠন করেন। এতে চন্দ্র উজিরা হারিও এর কার্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বোমাং উপাধি দেন। তিনি চাকমা রাজা সুভল কে স্থল পথে চট্টগ্রাম আক্রমণ করতে আদেশ দেন। রাজা সুভল খাঁ তদীয় ভ্রাতা ফতে খাঁ ও সেনাপতি কালু খাঁ কে মোগলের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ফতে খাঁ ও কালু খাঁ অতর্কিতে মোগল সেনাকে আক্রমণ করে দুইটা কামান হস্তগত করেন। উহার মধ্যে একটা ‘ফতে খাঁ কামানটি’ এখনও রাঙ্গামাটি রাজ কাছারীর সম্মুখে জাতির গৌরব বিস্তার করে পড়ে রয়েছে সসম্মানে। অপরটা নাকি কালু খাঁ কামানটি ব্রিটিশ সরকার নেমে নেওয়ার সময় লঞ্চ থেকে কর্ণফুলী নদীতে পড়ে যায়। আর উদ্ধার করা যায়নি। রাজপুত্র ফতে খাঁ ও সেনাপতি কালু খাঁ এর নামে কামানগুলির নাম রাখা হয়। রাজা সুভল খাঁ মাত্র দুই বৎসর কাল রাজত্ব করে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এখানে একটা প্রসঙ্গ ও বিতর্কিত বিষয় আলোচনা করা হল। বাবু বক্ষিম চন্দ্র চাকমা কর্তৃক উদ্ভাষিত তার বহি “চাকমা জাতি সমসাময়িক ইতিহাস” এর ১৯৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত। চাকমা রাজাদের সম্পর্কে কানুনগো দণ্ডরে রক্ষিত মূল পার্সী দলিল হতে ইংরেজীতে অনুবাদকৃত জন বুলায় দ্বারা চট্টগ্রামের তদানিন্তন কালেক্টর মি. জেমস আর উইন কর্তৃক ২৯ শে মার্চ ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার কমিটি অব রেভেনিউ এর কাছে প্রেরিত এবং ৬ই মে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে গৃহীত দলিল মতে পাহাড়ীর অন্যান্য আদিবাসী ও চাকমাগণ কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম চাকমা রাজার উপাধি “তৈইন খান” (১৭১১ খৃষ্টাব্দে) তিনি গভর্নমেন্টকে কোন খাজানা দিতেন না, তার পুত্র রতন খাঁ ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। তার পুত্র কুতুব ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন। তার পুত্র জুল্লীল খাঁ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ে এ পর্য্যন্ত চাকমা রাজ বংশের যত ইতিহাস পাওয়া গিয়েছে, তাতে মুলিমা গবা ধাবানা গোষ্ঠীর রাজা মোগল্যা ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭১২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত, রাজা সুভল খাঁ ১৭১৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ এবং রাজা জালাল খাঁ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চাকমা রাজা হিসাবে রাজত্ব করতে দেখা যায় বা ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। বাবু সুপ্রিয় তালুকদার তার বিরচিত “চম্পকনগর সন্ধানে বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি” বহি পৃষ্ঠা ৭১-৭৮ তে তিনিও উক্ত বিষয়টি প্রাপ্ত দলিল এর কপিসহ উপস্থাপন করেছেন।

তাতেও উক্ত ৩ জন চাকমা রাজা চন্দন খাঁ (১৭১১ খৃঃ) রতন খাঁ (১৭১২ খৃঃ) ও কুন্তুয়া (১৭১৩-১৭১৪ খৃঃ) কে চাকমা রাজা হিসাবে দেখান হয়েছে। অপরাপর চাকমা রাজাদের নাম ও সময়কাল প্রায় কমবেশী মিল আছে। বাবু সুপ্রিয় তালুকদার এর বহিতে মুলিমা গঝা ধাবানা গোষ্ঠীর ৩ জন রাজা, ধাবানা গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা রাজা ধাবানাসহ ধরম্যা ও মোগল্যার নাম সম্পূর্ণ বাদ পড়েছে অথচ পরবর্তী ধাবানা গোষ্ঠীর রাজাগুলি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। পিতা বা প্রতিষ্ঠাতাকে বাদ দিয়ে ছেলে, নাতি বা তৎপরবর্তী বংশধরেরা কোথেকে আসছেন, চাকমা ইতিহাসে পাগলা রাজার বিদায় ও ধাবানা রাজ বংশের উৎপত্তির একটা বিরাট স্মরণীয় ঘটনা। তাদের ঘটনা বা ইতিহাস বাদ দিলে চাকমা ইতিহাস লিখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রায় ৩১১ বৎসর আগে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ফার্সি ডকুমেন্ট হতে সংগ্রহ ও ইংরেজীতে অনুবাদকৃত ব্রিটিশ আমলের জুলন্ত দলিল আমার মত ক্ষুদ্রে লেখকের প্রত্যাখান করা সম্ভব নয়। তবে আলোচনা পর্যালোচনা করতে বোধ হয় বাধা নেই। আশা, সুধী সমাজ ভুল ভ্রান্তি হলে ক্ষমা করবেন।

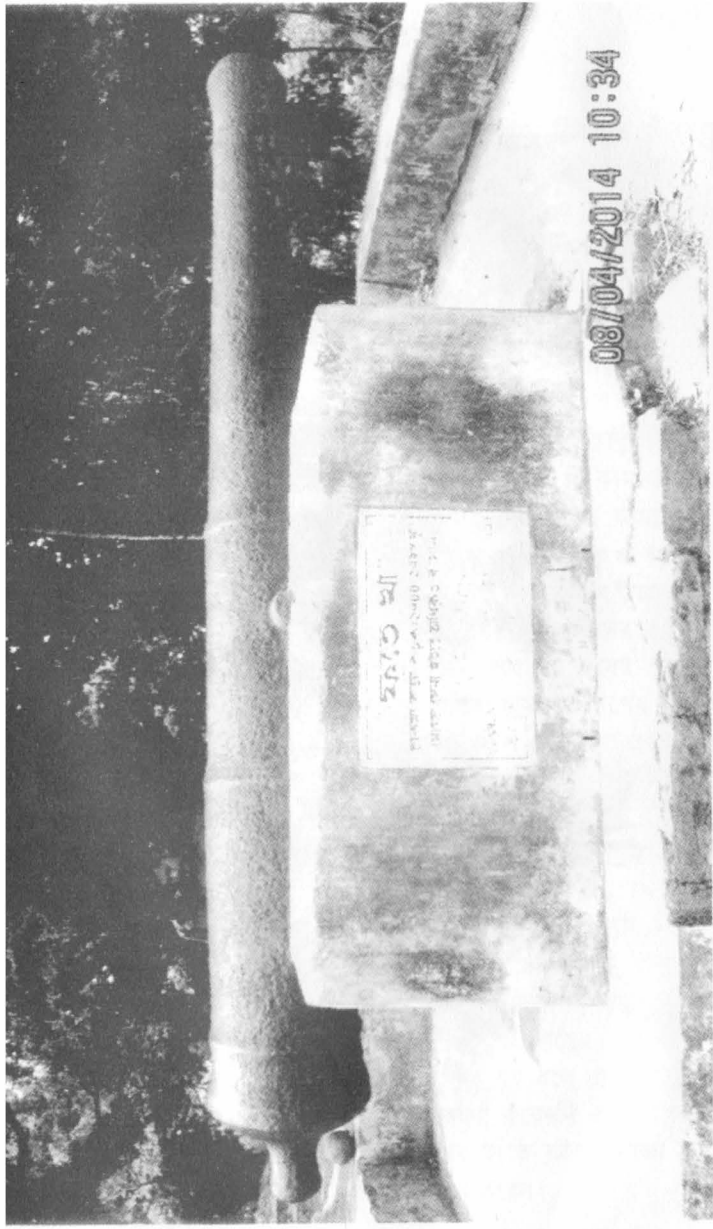
পাগলা রাজা সাওয়া (সাথোয়াই) কে তার পাগলামির জন্য তার দুই পুত্র চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ সহ হত্যা করা হয়েছে বলে রাজা ভুবন মোহন রায়, বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান মহোদয় মত প্রকাশ করেছেন। কুন্তুয়া রাজ কন্যা অমঙ্গলীর স্বামী হন, তিনি ও একপুত্র পেয়ে অকালে মৃত্যু বরণ করেন। কাটুয়া রানীও মেয়ে লোক। ঐ তিন জন রাজা পুরুষ মানুষ এবং পরম্পর পিতা, পুত্র ও নাতি। তাদের বংশ পরিচয়ও নেই। মৃত লোক পাগলা রাজার ছেলে চন্দন খাঁ, রতন খাঁকেও জীবিত করা যায় না। যদি অলৌকিক ভাবে জীবনে বেঁচে থাকেন এবং পরবর্তীতে মোগল সরকার বা আরাকান রাজা অনুগ্রহ পেয়ে চাকমা রাজা হিসাবে মনোনীত হন, সুপ্রতিষ্ঠিত ধাবানা রাজার বংশধরকে বিতাড়িত করে চাকমা রাজার সিংহাসন দখল করতে পারেননি। তাই আমার চাকমা রাজার হিসাব ও তালিকা থেকে উক্ত ৩ জন রাজাকে বাদ দিতে বাধ্য হলাম।

এ ব্যাপারে বাবু বক্শিম চন্দ্র চাকমা তার বহি “চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস” বই এর পৃষ্ঠা ১৯৫ তে বর্ণিত ও উপস্থাপিত বক্তব্যটি অনুধাবন যোগ্য। তিনি (বক্শিম) লিখেছেন- ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি রাঙ্গামাটি ডিপুটি কমিশনার অফিস সহকারী হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন। তিনি অফিসে বলাবলি করতে শুনতে পান যে, বিলাত হতে কোন এক সাহেব তৎকালীন ডিপুটি কমিশনার লেঃ কর্ণেল জি, এল হাইও সাহেব থেকে পুরাতন চাকমা রাজাদের নাম চাওয়া হয়েছে। ডিপুটি কমিশনার তার জেলা অফিসের কানুনগো দপ্তর হতে পুরাতন রেকর্ডপত্র চেয়ে নামগুলি তাড়াতাড়ি সরবরাহ করতে আদেশ দেন। তখন নগেন্দ্র লাল চাকমা জেলা জরিপ কানুনগো ছিলেন। তিনি তাড়াহুড়ার মধ্যে চাকমা রাজাদের সঠিক নাম সরবরাহ করতে পারছিলেন না। সেই অবস্থায় কানুনগো বাবু সত্য মিথ্যা রাজ বংশের পুরাতন কয়েকজনের নাম সরবরাহ করেই চাকুরী রক্ষা করেন। মনে হয় উক্ত চন্দন খাঁ, রতন খাঁ ও কুন্তুয়া নামগুলি তারই দ্বারা সরবরাহকৃত ভুল তথ্য। পরবর্তীতে এই ভুল তথ্যটি হয়তো বিলাতে গিয়ে ডকুমেন্টারী করে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

৮। রাজা জালাল খাঁ

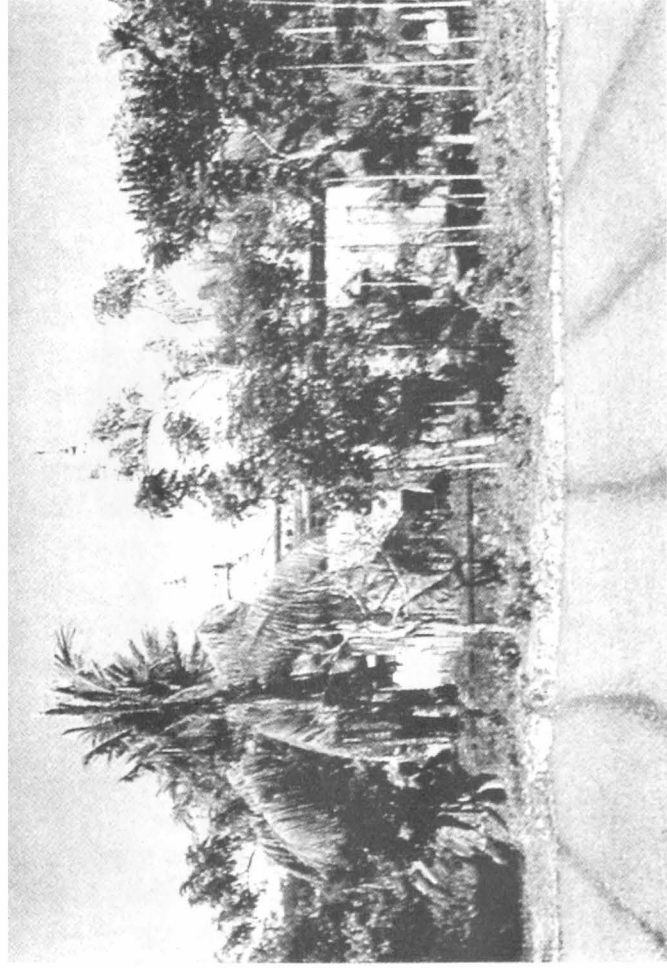
(১৭১৫-১৭২৫ খৃষ্টাব্দ)

রাজা সুভল খাঁ মাত্র প্রায় দুই বৎসর রাজত্ব করেন। তাহার মৃত্যুর পর তার ভাই জালাল খাঁ রাজা হন এবং মোগলের সাথে সর্ব প্রথম ১১ (এগার) মন কার্পাস চুক্তি বা প্রথম শান্তিচুক্তি করেন ১৭১৫ খ্রিঃ। ইহা প্রথম কার্পাস চুক্তি বা প্রথম শান্তিচুক্তি। এ চুক্তির ফলে দেশে শান্তি সৃষ্টি হয় এবং দেশে নিয়মিত আমদানী রপ্তানী আরম্ভ হয়। তিনি বিনোদ চৌধুরী নামক এক ব্যক্তির মাধ্যমে মোগল সরকারের প্রতিনিধি কাছে ১১ (এগার) মন কার্পাস বাণিজ্য শুদ্ধ হিসাবে প্রদান করতেন। ইহার বিপরীতে চাকমা রাজ্যে গুকটি, লবণ, তামাক, গুড়, কাপড়, রং প্রভৃতি দ্রব্য সরবরাহ করা হত। চাকমা রাজ্য থেকে গাছ, বাঁশ, শন, মধু, বেত, হাতির দাঁত প্রভৃতি বনজ দ্রব্য চালান হত। এভাবে তিনি প্রায় ১০ বৎসর দেশ শাসন করেন। পরবর্তীতে রাজা মোগল সরকারের বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন অনুভূত হলে বা বাণিজ্য শুদ্ধ দিতে বন্ধ করলে মোগল কর্মকর্তা দেওয়ান কিশান চাঁদ তার রাজধানী আক্রমণ ও ধ্বংস করে দেন। ইহাতে রাজা জালাল খাঁ ১৭২৪/২৫ খৃষ্টাব্দে আরাকানে পলায়ন করেন। তাই মনে হয়, চাকমা রাজা মোগল সরকারকে শুদ্ধ দিলেও আরাকানের করদ মিত্র রাজা ছিলেন। তাই তিনি তথায় আশ্রয় পান। তিনি আর রাজ্য উদ্ধার করতে পারেননি এবং আরাকানে তার মৃত্যু হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ সিরাজ উদ্দীন সাহেব তার আবিষ্কৃত ও সংরক্ষিত তথ্যে বলেছেন- The Raja (Jalal Khan) also paid his tribute of cotton through Benode Chowdhury but afterwards being rebellious Dewan Kishan Chand on the part of the Subedar made an attack upon his Capital destroyed and put to flight to Raja who made his escape to Aracan where he afterwards died" এভাবে জালাল খাঁ মোগলের সাথে শান্তিচুক্তি করার পর প্রায় ১০ বৎসর দেশ নিরিবিলা শাসন করেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারেননি। মোগল সরকারের কুনজরে পড়ে যান এবং মোগল সরকার তাকে সুখে থাকতে দেননি এবং তার রাজধানী, বাসস্থান ধ্বংস করেন। ইহা প্রথম কার্পাস চুক্তি বা প্রথম শান্তিচুক্তি বৃহৎশক্তির সাথে মোকাবেলা করার কৌশল বা বেঁচে থাকার পথ। জাতি তার চেষ্টা ও অবদান ভুলবে না।



08/04/2014 10:34

চাকমা রাজবাহীর ঐতিহ্যবাহী কামান (সপ্তদশ শতকে যুদ্ধে বিজিত কামান “ফতে খা”)



রাজানগরে অবস্থিত চাকমা রাজবাড়ি নিকটস্থ বৌদ্ধ মন্দির।

৯। রাজা ফতে খাঁ (১৭২৫ - ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ)

রাজা জালাল খাঁ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করতঃ আরাকানে নির্বাচিত জীবনকালে মৃত্যুবরণ করলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ফতে খাঁ আনুমানিক ১৭২৫/২৬ খৃষ্টাব্দে রাজ গদীতে আসীন হন। তিনি রাজকুমার থাকাকালীন সময়ে ও তার স্বজাতি ও প্রজাবৃন্দকে “বৈঁচে থাকার তাগিদে যুদ্ধ বিদ্যায় প্রশিক্ষণ দেন এবং সুশিক্ষিত করে তোলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আরাকানে নির্বাচন কালে মৃত্যুর পর ফতে খাঁ হিংসাহন লাভ করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন এবং নিজ রাজ্যে রামু এসে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তিনি তার বড় ভাই সুভল খাঁ এর রাজত্ব কালে সেনাপতি কালু খাঁ সহ অতর্কিত আক্রমণ করে মোগল বাহিনী থেকে দুইটা কামান হস্তগত করেন। তাহা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত কামানগুলি তাদের নামে ফতে খাঁ ও কালু খাঁ নামকরণ হয়। উক্ত কামানের মধ্যে এখনও রাঙ্গামাটি রাজবাড়ীতে ‘ফতে খাঁ কামানটি’ চাকমা জাতির গৌরব বহন করিতেছে। পরবর্তীতে রাজা সের দৌলত খাঁ আমলে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে চাকমারা চাকমা ইংরেজ যুদ্ধে প্রতিরক্ষা ও প্রতিরোধ যুদ্ধে ব্যবহার করেন বলে জানা গেছে। ঐ স্থানের নাম কাণ্ডাই নদী কিয়ৎ উজান বর্তমান কাণ্ডাই বাঁধের তলায় পড়ে আছে। স্মৃতি হারিয়ে গেছে। ফতে খাঁনের ৩ পুত্র (১) সেজ্জন খাঁ (২) সের মুস্তা খাঁ (৩) ওর মুস্তা খাঁ। তিনি প্রায় ১০ বৎসর রাজ্য শাসন করেন। ঘটনা বহুল যুগে তার শাসন, কিন্তু তার শাসন আমলের বিশেষ কিছু জানা যায়নি। পারসী অক্ষরে ফতে খাঁ উৎকীর্ণ তার একটা সীল মোহর পাওয়া গিয়াছে। রাজা ফতে খাঁ এর রাজত্বকালে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মহাকালের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে রয়েছে। পরে হয়তো ভাবী ইতিহাসবিদগণ, গবেষকরা উদ্ঘাটন করবেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম চাকমাদের ইতিহাস লিখা ও বর্ণনা করা আরম্ভ করেন তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক থমাস হার্বাট লুইন। এখন প্রায় ১৩৫/৩৬ বৎসর পেরিয়ে গেল। পরবর্তী লেখকগণের হাতে আরো অনেক কিছু নতুন নতুন ঘটনা আবিষ্কার হয়েছে। যেমন, রাজা সুখদেব রায় রাজা ছিলেন না, রাজ কুমার, দত্তক পুত্র ও জমিদার ছিলেন। রাজা সের জব্বর খাঁকে মাটির তলা থেকে তুলে আনা হয়েছে। তৈনমুড়ি গাঙের যুদ্ধ রাজা খৈন সুরেশ্বরী ও আরাকান রাজ মেন খারী আমলে সংঘটিত হয় বলে জানা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। চাকমাদের ইতিহাস কেহ সঠিকভাবে গবেষণা করেননি এবং এখনও কেহ গবেষণার ক্ষেত্রে নামেননি। এ দায়িত্বটা প্রজন্ম এর হাতে রইল। রাজা ফতে খাঁ আনুমানিক ১৭৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে মৃত্যুবরণ করেন।

১০। রাজা সের মুস্ত খাঁ (১৭৩৭ - ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ)

রাজা ফতে খাঁর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র সের্জ্জন খাঁ রাজা হন। তিনি মাত্র অল্পকাল ১৭৩৫-১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে বিশেষ কোন ঘটনা বা যুদ্ধ বিদ্রোহ জানা যায়নি। তিনি মোটামুটি নিরিবিলি কয়েকটা বৎসর রাজত্ব করে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

রাজা সের্জ্জন খানের মৃত্যুর পর রাজা সের মুস্ত খাঁ ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্য সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের তথ্যানুযায়ী দেখা যায়। তিনি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান থেকে রোয়াং এসে রাজগদী দখল করেন। ইহাতে বুঝা যায়, চাকমা রাজ্যকেই রোয়াং বলা হত এবং আরাকানের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বোধ হয় তখনও চাকমা রাজ্য আরাকানের করদ মিত্র বা আরাকানের প্রভাবাধীন রাজ্য ছিল। দুই রাজ্যে অবাধ চলা চলছিল। রাজা সের মুস্ত খাঁ একজন বিচক্ষণ জ্ঞানী গুণী প্রতিভাবান রাজা ছিলেন। তিনি শুধু আরাকান রাজ্যের সঙ্গে নয়, মোগল সরকারের সাথেও বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থা গড়ে তুলেন। তিনি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে মোগল বাদশার প্রতিনিধির সঙ্গে দ্বিতীয় কার্পাস চুক্তি বা শান্তিচুক্তি করেন (১৭৩৭ খৃঃ) এর চুক্তিতে তিনি মোগল সরকারকে ১০১ (একশত এক) মন কার্পাস দিতে স্বীকৃত হন এবং দুই দেশের অবাধ বাণিজ্য চলাচল অব্যাহত রাখেন। তিনি শুধু মোগল সরকারের সাথে চুক্তি করেননি। তিনি চট্টগ্রামের উত্তরাঞ্চলে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া কোদলা মৌজার অতিরিক্ত খাজানা দেওয়ার প্রতিশ্রুতিতে বিরাট অঞ্চল বন্দোবস্তী নেন। তিনি অপূত্রক বিধায় ভ্রাতৃপুত্র সুখদেবকে (ওরমুস্ত খানের পুত্র) দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করে ঐ বন্দোবস্তীকৃত জমি ও জমিদারীর তাকে কার্যভার অর্পণ করেন। ইহা সুখদেব তরফ নামে পরিচিত ছিল। সুখদেব উক্ত স্থানে “সুখ বিলাস” নামে একটা সুরম্য বাস ভবন নির্মাণ করে তথায় কার্যালয় পরিচালনা করতে থাকেন। পরবর্তীতে রাজা সেরমুস্ত খাঁ এর দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত হয়। সুখদেব সেখানে রাজ্যের মত জমিদারী ও রাজ্য শাসন করতে থাকেন। প্রজারা ও বিদেশীরা সুখদেবকে রাজা বলেই মনে করেন এবং সম্মান প্রদর্শন করতেন। তৎকালীন নবাব সরকারের সহিত চাকমা রাজ্যের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে লিপ্ত থাকতেন। তার কার্য্য কলাপে সন্তুষ্ট হয়ে নবাব সরকার তাকে ‘রায়’ উপাধিতে ভূষিত করেন। তখন চাকমা রাজ্যের প্রজাগণ ধীরে ধীরে দক্ষিণাঞ্চল রোয়াং রামু থেকে উত্তর দিকে সরে আসতে ও নতুন জায়গায় বসতি করতে আরম্ভ করেন। সে সময় নবাব সরকার চট্টগ্রামে ভূমি বন্দোবস্তী দিতে আরম্ভ করলে চাকমাদের নেতৃস্থানীয় ও প্রধান ব্যক্তিগণ ভূমি বন্দোবস্তী নিতে থাকেন। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে ও চট্টগ্রাম জেলায় বহু তরফ চাকমাদের নামে ছিল। ১২০০ মঘীর জরিপে ঐ জমিগুলি চাকমাদের নামে রেকর্ডকৃত ছিল। বৃটিশ সরকার ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনিয়া রাজানগর থেকে রাজ্যমাটি স্থানান্তর করার আদেশ

দিলে চাকমা রাজা রাজ্যমাটি এসে বসবাস করতে বাধ্য হন এবং চাকমা প্রজাগণও পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সব তরফ বা জমি বিক্রি করে আসেন অথবা পরিত্যাগ করে আসেন। এভাবে চাকমারা চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ জমি হারিয়ে ফেলেন। রাজা সের মুস্ত খাঁর সুখদেব রায়কে রাজা অভিষিক্ত করার ইচ্ছা ছিল এবং তিনি সেভাবে সুখদেব রায়কে গড়ে তোলেন এবং ক্ষমতা ও সুখ সুবিধা অর্পণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার জীবদ্দশায় ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে সুখদেব রায় মৃত্যুবরণ করেন। তারপর তিনি ব্যবস্থাপক রাজারাম চৌধুরীর মারফৎ রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের জমি-জমা তদারক করার ব্যবস্থা করেন এবং সের জব্বর খাঁর অপর একপুত্র নুরুল্লা খাঁনকে ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে কোদলায় সুখদেব তরফের শাসনভার দেন।

রাজা সের মুস্ত খাঁর সময় চট্টগ্রাম জেলার প্রায় সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল তার অধিকারে ছিল। অধিকন্তু তিনি অতিরিক্ত পৃথক খাজানা দেওয়ার শর্তে চট্টগ্রামের সুবেদার থেকে রাজনুনিয়ার কোদলায় পুনঃ জমি বন্দোবস্তী নেন। তার সময়ও আরাকানের অত্যাচার মগদের অত্যাচার বন্ধ হয় নাই। কথিত আছে, এক সময় আরাকানিরা চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে হানাদিয়া বহু পাহাড়ী ও বাঙ্গালী বন্দী করে নিয়ে যায়। ইহার জন্য সের মুস্ত খাঁ মোগলের মিত্রতা কামনা করেন। এ সময় বহু চাকমা পরিবার মগদের অত্যাচারে চট্টগ্রামের গভীর পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করতে বাধ্য হন। বৃটিশ কোম্পানীর নথি পত্র অনুযায়ী রাজা সেরমুস্ত খাঁ এর রাজ্য সীমানা নিম্নরূপ ছিল বলে জানা যায়।

সেরমুস্ত খাঁর রাজ্য সীমা :

উত্তরে- ফেনী নদী, ত্রিপুরা রাজ্য।

দক্ষিণে- শঙ্খ নদীর মধ্যবর্তী স্থান

পূর্বে- কুকী রাজ্য, লুসাই হিল, পহনছড়ি মোন।

পশ্চিমে- নিজামপুর রোড, সীতাকুন্ড গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড।

রাজা সের মুস্ত খাঁর আমল চাকমা রাজ্যে একটা গৌরবোজ্জ্বল যুগ। তিনি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমা রাজ্য শাসন করেন। তিনি মোগল আমলের শেষ রাজা। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজদৌল্লাহ পরাজিত ও নিহত হলে ধীরে ধীরে বাংলার শাসন ও রাজ্য বৃটিশরা দখল করে নেন। রাজা সের মুস্ত খাঁর আমলে প্রজারা ও দেশবাসী মোটামুটি সুখ শান্তিতে বসবাস করেছিলেন। তিনি প্রায় বিশ বৎসরের অধিক রাজ্য শাসন করেন এবং প্রায় স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। দেশবাসীকে গভীর শোক সাগরে ভাসিয়ে রাজা সেরমুস্ত খাঁ ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

চট্টগ্রাম বিজয়ের পর মোগল ফৌজদার (শাসন কর্তা) এর নাম ১৬৬৬ খৃঃ থেকে ১৭৬১ খৃঃ পর্যন্ত (সূত্র- চট্টগ্রাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার ১৯০৮ ইং) পৃষ্ঠা- ৮৬

ক্রঃনং	ফৌজদারের নাম	শাসন কাল	স্থান পদবী	মন্তব্য
১।	নবাব বুজুর্গ উমেদ খাঁন	১৬৬৬-১৬৬৯ খৃঃ	১ম ফৌজদার	
২।	ফৌজদার আজগর খাঁন নাজিম সমি (আবদুদ্বাহ বেগ)	১৬৬৯-১৬৭১ খৃঃ	২য় ফৌজদার	
৩।	ফৌজদার রশিদ খাঁন	১৬৭২-১৬৭৩ খৃঃ	৩য় ফৌজদার	
৪।	ফৌজদার বুজুর্গ উমেদ খাঁন	১৬৭৪-১৬৭৭ খৃঃ	৪র্থ ফৌজদার	২য় মেয়াদে
৫।	ফৌজদার ফরহাদ খাঁন	১৬৭৮-১৬৭৯ খৃঃ	৫ম ফৌজদার	
৬।	ফৌজদার জাকির খাঁন	১৬৮০-১৬৮৭ খৃঃ	৬ষ্ঠ ফৌজদার	
৭।	ফৌজদার মুজাফর খাঁন	১৬৮৮- ০ খৃঃ	৭ম ফৌজদার	
৮।	ফৌজদার ফিদাই খাঁন	১৬৮৯-১৬৯৬ খৃঃ	৮ম ফৌজদার	
৯।	ফৌজদার নুরুদ্বাহ খাঁন	১৬৯৪-০ খৃঃ	৯ম ফৌজদার	
১০।	ফৌজদার ইয়াকুব খাঁন	১৬৯৫-১৬৯৭ খৃঃ	১০ম ফৌজদার	
১১।	ফৌজদার একুইদত খাঁন	১৬৯৮-১৬৯৯ খৃঃ	১১শ ফৌজদার	
১২।	ফৌজদার রহমত উল্লাহ খাঁন	১৭০০-১৭০৬ খৃঃ	১২শ ফৌজদার	
১৩।	ফৌজদার বসরত খাঁন	১৭০৭-১৭০৮ খৃঃ	১৩শ ফৌজদার	
১৪।	ফৌজদার মীর মহম্মদ রফি সুবলত খাঁন	১৭০৯-১৭১০ খৃঃ	১৪শ ফৌজদার	
১৫।	ফৌজদার শাহওয়াদী খাঁন	১৭১১-১৭১২ খৃঃ	১৫শ ফৌজদার	
১৬।	নায়েব মীর হাদী (ওয়াজহ) ফৌজদার	১৭১২-০ খৃঃ	১৬শ ফৌজদার	
১৭।	ফৌজদার ওয়ালী রেজা	১৭১২-১৭২৩ খৃঃ	১৭শ ফৌজদার	
১৮।	নায়েব মিজা বকর ফৌজদার	১৭২৬-১৭২৭ খৃঃ	১৮শ ফৌজদার	
১৯।	ফৌজদার ফিদার খাঁন	১৭২৮-১৮৩৫ খৃঃ	১৯শ ফৌজদার	
২০।	ফৌজদার হোসেন মুহাম্মদ খাঁন	১৭৩৫-১৭৩৬ খৃঃ	২০শ ফৌজদার	
২১।	ফৌজদার জুলকদর খাঁন	১৭৩৬-১৭৩৮ খৃঃ	২১তম ফৌজদার	
২২।	ফৌজদার মুহাম্মদ রেজা খাঁন	১৭৩৮-১৭৩৯ খৃঃ	২২তম ফৌজদার	
২৩।	ফৌজদার সিরাজুউদ্দিন খাঁন	১৭৪০-১৭৪১ খৃঃ	২৩তম ফৌজদার	
২৪।	ফৌজদার মীর আফজল খাঁন	১৭৪১-১৭৪৩ খৃঃ	২৪তম ফৌজদার	
২৫।	ফৌজদার হোসেন কুলি খাঁন	১৭৪৩-১৭৫১ খৃঃ	২৫তম ফৌজদার	
২৬।	ফৌজদার আগা বোয়াকরী খাঁন (আগা মাদেক)	১৭৫১-১৭৫৬ খৃঃ	২৬তম ফৌজদার	
২৭।	ফৌজদার মাহাসিং	১৭৫৬- ০ খৃঃ	২৭তম ফৌজদার	
২৮।	ফৌজদার আগা মুহাম্মদ নিজাম	১৭৫৭-০ খৃঃ	২৮তম ফৌজদার	
২৯।	ফৌজদার মুহাম্মদ রেজা খাঁন	১৭৫৭-১৭৬১	২৯তম ফৌজদার	২য় মেয়াদে

তার আমলেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে মি. হেনরী ভেরেলস্ট মুহাম্মদ রেজা খাঁন থেকে ৫ই জানুয়ারী ১৭৬১ ইং তারিখ মোগলের থেকে চট্টগ্রামের শাসন ভার গ্রহণ করেন।

১১। রাজা সের জব্বর খাঁ

(১৭৫৮-১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ)

রাজা সেরমুস্ত খাঁ নিঃসন্তান অবস্থার মারা গেলে এবং তার দত্তক পুত্র ভাবী রাজা সুখদেব রায়ও রাজার জীবদ্দশায় পরলোকগমন করলে রাজার পিতার ভ্রাতৃপুত্র সের জব্বর খাঁ (জালাল খাঁর পুত্র) ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা রাজ সিংহাসনে বসেন। (চাকমারা তাকে ভুলেই গেছেন এবং ইতিহাসের পাতা ও তালিকা থেকে বাদই দিয়েছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর অধ্যাপক ডঃ সিরাজ উদ্দীন সাহেব তার পিএইচডি ডিগ্রীর থেসিস রচনা ও গবেষণা করতে তাকে মাটির নীচে থেকে উদ্ধার করে জীবন্ত করে তোলেন।) তার আমলেই বৃটিশের কুট কৌশলে ধীরে ধীরে বাংলাকে গ্রাস করতে থাকেন এবং বাংলার শাসন নিজ হাতে নিতে থাকেন। তার সময় মীর কাসিম ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ১৭ই সেপ্টেম্বর বাংলার নবাবী পদ লাভ করেন এবং তার সময় চট্টগ্রাম অঞ্চল ইংরেজ কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন দেওয়ান দত্তরটা। সঙ্গত কারণে মোগলের করদমিত্র রাজ্য চাকমা রাজার দেশটিও ইংরেজ কোম্পানীর আওতায় চলে যায়। সের জব্বর খাঁ তার রাজত্বের প্রথম ভাগে মাত্র এক বৎসর নবাব সরকারকে কার্ণাস শুদ্ধ প্রদান করে পূর্ববর্তী কার্ণাস চুক্তি অনুযায়ী বাংলার দেশের শাসন ক্ষমতা নিয়ে নবাবের সাথে ইংরেজ কোম্পানীর দন্দ চলতে থাকার সুযোগে চাকমা রাজা শুদ্ধ বদ্ধ করে দেন। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার সুযোগে তিনি প্রায় স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তিনি রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করেন। তার সময়ে রোয়াং রামু থেকে সুখ বিলাস রাজধানী স্থানান্তরিত করা হয়। ইংরেজরা চট্টগ্রামের দেওয়ানী লাভ করায় রাজা সের জব্বর খাঁ এর রাজত্ব কালে বৃটিশ কোম্পানীর পক্ষ মি. হেনরী ভেরেলষ্ট চট্টগ্রামের নবাব নায়েব মোহাম্মদ রেজা খাঁন থেকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের ৫ই জানুয়ারী চট্টগ্রামের কার্যভার গ্রহণ করেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করলেও তখন শুধু চট্টগ্রাম শহর ও উহার পার্শ্ববর্তী সামান্য অংশটুকুর উপর তাদের শাসন ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ ছিল। চট্টগ্রামের অপরাপর অঞ্চল ও পার্বত্য এলাকা সম্পূর্ণ চাকমা রাজার অধীনে ছিল। তার আমলে মোগলের পক্ষ থেকে বা বৃটিশ এর পক্ষ থেকে কোন আক্রমণ বা যুদ্ধ পরিস্থিতি করা হয়নি। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে অনেক নিরিবিবিলিতে রাজা সের জব্বর খাঁ পরলোক গমন করেন। তিনি বৃটিশ আমলে প্রথম চাকমা রাজা। এ বিধায় H. J. S Cotton সাহেব Revenue History of Chittagong (1880) গ্রন্থে মন্তব্য করেন, (1) The annual confirmatory of the grant, under the seal of Mir Cassim Ally Khan selforth that the thana of Islamabad or Chittagong is granted to the English Company of their expences and the monthly maintenace of five hundred Europeans foot and eight

thousand sepays which are to be entertained for the protection of the royal dominions. (2) Mr. Henry Verelst afterwards Governor of Bengal was the first of Chittagong He took formal change from Nabab Mohammed Reza Cawn at Islamabad on the 5th January 1761.

ইংরেজরা যখন চট্টগ্রামের শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন এই অঞ্চলে চাকমাদের রাজা ছিলেন সের জব্বর খাঁ (১৭৫৮-১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ) Hunter সাহেবের Stetishcal Account of Bengal Vol- VI থেকে এ অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রতি ইংরেজদের মনোভাব নিম্নরূপ ছিল বলে জানা যায়

"In 1829 Mr. Halhead the commissioner stated the hill tribes were not British subject but merely tributories and that we recognised no right on our part to interfere with their internal arrangement.

১২। রাজা সের দৌলত খাঁ

(১৭৬৫-১৭৮২ খৃঃ)

রাজা সের জব্বার খাঁর মৃত্যুর পর তৎপুত্র সের দৌলত খাঁ ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার শাসন কাল খুবই সংকটময় ও দুর্ঘোণের ভিতর দিয়ে চলে। ইতিমধ্যে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পলাশী যুদ্ধের পর ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ৭ সাত বৎসরে বেশ শক্তিশালী ও সুসংহত হয়ে উঠে। হায়নার মত শিকার সম্মুখে রেখে বৃটিশ সরকার কতক্ষণ চুপ করে বসে থাকবে? বৃটিশ সরকারের কাছে চাকমা রাজ্যটিও হায়নার শিকারের মত হয়ে এতদিন রইল। ছলে, বলে, কৌশলে এই পার্বত্য রাজ্যটি দখল করতেই হবে। সাবধান, খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে।

বৃটিশ সরকার ১৭৬০ থেকে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত চাকমা রাজ্যের উপর হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ করলেও তারপর এই নীতি পরিবর্তন করতে থাকেন। বিশেষতঃ লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খৃষ্টাব্দ) ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে গভর্নর হয়ে আসলে এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল হিসাবে পদোন্নতি ও নিযুক্তি পেলে তিনি ক্ষমতায় প্রায় অন্ধ হয়ে যান এবং সম্পূর্ণ পর-রাজ্য দখলের নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। তার সভা পরিষদ (কাউন্সিল অব গভর্নর জেনারেল) ও নিম্ন অধীনস্থ কর্মকর্তাদের এই পরিবর্তিত নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দেন। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস ৩টা নীতির উপর বেশী জোর দেন (১) বিতর্কিত কার্পাস মহল বা কার্পাস চুক্তি (২) চাকমা রাজ্যের সম্পদ আহরণ বা শোষণ (৩) চাকমা রাজ্যে অনধিকার প্রবেশ/অনুপ্রবেশ প্রেরণ। তিনি এই নীতি খুবই সুস্বভাবে ও কূটনৈতিক ভাবে বাস্তবায়নের পথ বেচে নেন।

কার্পাস চাকমা রাজ্যের মূল্যবান ফসল এবং প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন হয়। এই কার্পাস তাকে আহরণ করতে হবে। পূর্ববর্তী কার্পাস চুক্তি অনুযায়ী চাকমা রাজা মোগল সরকারকে দেয়া পরিমাণ শুদ্ধ বৃটিশ সরকারকেও দিয়ে আসতে থাকেন। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ইহা বাণিজ্য শুদ্ধ হিসাবে বিবেচনা না করে রাজস্ব হিসাবে দাবী তুলেন এবং পরিমাণ বাড়াতে চান। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চাকমা রাজ্য থেকে বিনানুমতিতে কাঠুরিয়া পাঠিয়ে গাছ কাটা ও চালান দিতে চান এবং শিকারী পাঠিয়ে হাতি শিকার ও হাতিদন্ত আহরণ আরম্ভ করে দেয়।

অধ্যাপক ডঃ সিরাজ উদ্দিন কর্তৃক উদঘাটিত ও চট্টগ্রাম কানুনগো দপ্তরে সংরক্ষিত তথ্য নিম্নরূপ :

"Zullel Khan (the Chakma Raja 1715 to 1724) made the following request to the Subehdars aforesaid that as the following articles of provision dryfish, salt, kedjeres polts tobacco, goore kids, ducks fowls, cloths of black dyes etc. to

were not procured in the jooms, he prayed that the beparies of the lowlands might be permitted to traffick with the joomeahs in the aforementioned articles for which permission he engaged voluntarily to tribute of cotton to Government.

১৭৬১ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী হাতে সমর্পণ করার সময় নির্দিষ্ট কোন সীমানা না থাকায় এবং চাকমা রাজ্য ও ব্রিটিশ অংশের কোন সীমা রেখা বা লাইন না থাকার সুযোগে সীমানায় বসবাসরত বাঙ্গালী ব্রিটিশ প্রজাদের চাকমা রাজ্যে নিয়মিত অনুপ্রবেশ ও বে-দখল নিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ থেকে উৎসাহিত করা হয়। এইরূপ ঘটনা ফটিকছড়ি হালদা এলাকায় ও রাঙ্গুনিয়া এলাকায় বেশি পরিলক্ষিত হতে থাকে নোয়া আবাদ চিহ্নিতকরণের নামে। এভাবে রাঙ্গুনিয়া ও ফটিকছড়িতে নিয়মিত ঘটনা সংঘটিত হলে চাকমা রাজ্য ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে মত বিরোধ ও সংঘর্ষের সূচনা হয়। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কালেক্টর মি. বেটলী রাঙ্গুনিয়ায় চাকমা রাজার দেওয়ান রনু খানের সঙ্গে বার্ষিক ৫০১/মণ কার্পাস দেওয়ার এক চুক্তিতে উপনীত হন তৃতীয় পক্ষের মারফৎ। মি. বেটলীর ইচ্ছা খাস মহল দখল করা ও রাজস্ব বাড়ানো। তিনি কার্পাস মহলকে নগদ জমায় পরিণত করে এবং রাঙ্গুনিয়া উপর ১১,৭৪১/- টাকা রাজস্ব ধার্য করেন। এতে রাঙ্গুনিয়া সরাসরি ব্রিটিশ কালেক্টর এর নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। সেই বৎসরই মি. বেটলী চট্টগ্রাম চাকলাদারী প্রথা চালু করে সমগ্র চট্টগ্রামকে ৯টি চাকলাদারে বিভক্ত করেন। রাঙ্গুনিয়াও একটা চাকলাদারে পরিণত হল যদিও সেখানে দেওয়ান রনু খাঁন রয়েছেন ঐ এলাকার রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে। মি. বেটলী ধ্যাং পাহাড়ের চাকলাদার দুর্গারাম চৌধুরীকে রাঙ্গুনিয়ার চাকলাদার নিয়োগ দেন এবং সকল প্রজাকে নগদ টাকায় রাজস্ব পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। এভাবে রাঙ্গুনিয়া থেকে বহু চাকমা ও পাহাড়ী রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারায় উচ্ছেদ হতে বাধ্য হন এবং পাহাড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেন। বাঙ্গালীরা তাদের জায়গা জমি দখল করে নেন। বাঙ্গালীদেরকে সরকারী সৈন্যরা পাহারা ও রক্ষা করতে থাকেন। তৎকালীন সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃক নিযুক্ত জমিদারেরা রাঙ্গুনিয়ার ঐ পরিত্যক্ত জায়গা জমি ভাগা-ভাগি করে নেন। জমিদারেরা প্রজাদেরকে প্রথমতঃ কয়েক বৎসর জমি আবাদের জন্য বিনা রাজস্বে জমি বিতরণ করেন এবং চাকমা ও পাহাড়ীরা ছেড়ে দেওয়া জমিগুলি দখল করে নেন।

এই পরিস্থিতিতে চাকমা রাজার টনক নড়ে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মত তার কোন স্থায়ী বাহিনী বা সৈন্য সামন্ত নেই। পরিস্থিতি দিন দিন অবনতির দিকে যেতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় মানুষ, জনগণ পাহাড়ীরা, চাকমা রাজার প্রজারা আর নির্জীব হয়ে বসে থাকতে পারলেন না। দেওয়ান রনু খাঁন, দেওয়ান জুনু খাঁন, রাজ কুমার জান বক্স খাঁ, রাজকুমার টব্বর খাঁ, দেওয়ান কানু খাঁন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের

নেতৃত্বে শত শত চাকমা ও পাহাড়ী যুবক স্বেচ্ছায় রাজার সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন এবং যুদ্ধ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে থাকেন। তারা বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে ও অনুপ্রবেশকারী জমিদার ও বাঙ্গালী প্রজাদের চাকমা রাজ্য থেকে বিতাড়ণের দৃঢ় সংকল্প করেন। এতে চাকমা রাজার মনে কিছুটা সাহস এসে যায়।

দেওয়ান এভাবে কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে রাজা সের দৌলত খাঁনকে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে শুদ্ধ প্রদান বন্ধ করতে পরামর্শ দেন। অবশ্য রাঙ্গুনিয়া থেকে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার পাহাড়ীদের থেকে কোন রাজস্ব আদায় করতে পারেন নি। নব-নিযুক্ত চাকলাদার দুর্গারাম চৌধুরীও কোন রাজস্ব আদায় করতে পারেননি। এমন কি তখন তার রাঙ্গুনিয়াতে আসাও নিরাপত্তার অভাব ছিল। রনু খাঁন শুধু রাজস্ব পরিশোধ বন্ধ করেননি। তিনি তার বাহিনী দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের ঘরবাড়ী ভেঙ্গে দেন। ধান-চাউল, গরু-ছাগল জন্ম করেন। বৃটিশ সরকার ও নতুন জমিদারদের দেওয়া পাট্টা দলিল, রেকর্ডপত্র জন্ম ও ছিঁড়ে ফেলে দেন এবং তার পরিবর্তে যাহারা আত্মসমর্পণকারী তাদেরকে চাকমা রাজার নতুন পাট্টা দলিল বিতরণ করেন। তাদের থেকে বর্ধিত হারে রাজস্ব আদায় করেন।

চট্টগ্রামের পার্বত্য রাজ্যের অবস্থার অবনতি দেখে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ১১৩০ মঘীতে চাকমা রাজা ও রনু খানের বিরুদ্ধে বৃটিশ প্রতিনিধি ফ্রান্সিস এর অনুরোধে মেজর এলকার ও ক্যাপ্টেন লেন এর নেতৃত্বে ২২তম সিপাহী ব্যাটালিয়নকে যুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইতিপূর্বেও কয়েকটা সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে অবস্থা কিছুই উন্নতি হয়নি। ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে এই সংঘর্ষ ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

তখনকার দিনে কর্ণফুলী ব্যতীত চাকমা রাজ্যে প্রবেশের কোন জলপথ বা স্থল পথ ছিল না। যথা সময়ে খবর পেয়ে রনু খান তার বিরাট বাহিনী নিয়ে শিলক উপনদীর মোহনা হতে কিছু দূরে বেতাগীর নিকটস্থ কর্ণফুলী নদীর তীরে “কিন্লামরং” নামক স্থানে প্রতিরোধ ও বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন। বৃটিশ বাহিনী বড় বড় ডিঙ্গি নৌকায় চড়ে অগ্রসর হতে থাকেন। কর্ণফুলী নদীতে বাঁশের চালী (ভেলা) ও চরকা কল দিয়ে এমনভাবে প্রতিরোধ ও কৌশল অবলম্বন করা হয় যে, বাঁশের চালীতে ব্যতীত কোথাও ডাকায় নৌকা ডিঙ্গি ভিড়ানোর স্থান নেই, যেই নৌকাগুলি বাঁশের চালীতে ভিড়াবে দূর থেকে লম্বা লম্বা (হাজার গজ লম্বা) বেত, কেলেত, গলা (বড় বেত) ও ধনুকুশ দড়ি দিয়ে পাতানো ‘চরকা কল’ জোরে ও তাৎক্ষণিক ভাবে ঘুরিয়ে বাঁশের চালী ঐ নৌকায় ফেলা হয় অথবা ডুবন্ত অবস্থায় পাতানো বেত দড়িতে আটকিয়ে ফেলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঐ নৌকা ডুবে যায় এবং বৃটিশ সৈন্য ও সিপাহীরা নদীতে পড়ে যায় ও নিরুপায় ভাবে সাঁতার কাটতে থাকে। তখন চাকমা সৈন্যরা সহজেই তাদেরকে কাবু করতে পারেন, হত্যা করতে পারেন বা পরাজিত বন্দী করতে পারেন। এই যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী শোষণীয় ভাবে পরাজিত হন এবং জীবিতরা পলায়ন

করে জীবন রক্ষা করেন। এই যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং পরাজিত হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এই যুদ্ধটার বিস্তারিত বিবরণ কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নি, শুধু অভিযান ব্যর্থ হয়েছে, মন্তব্য করেছেন। দেওয়ান ও সেনাপতি রনু খাঁন এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেন। ইহা চাকমাদের চাকমা রাজা ও দেওয়ান রনু খাঁনের বিরূপ সাফল্য। এই যুদ্ধে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে চাকমারা কিছুটা আশার আলো দেখেন। ইহা চাকমাদের একটা বিরূপ বিজয় এবং জাতীয় বিজয়।

ইহার পরবর্তী সময়ে ছোট খাটো হামলা হলেও বৃটিশের পক্ষ থেকে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বড় যুদ্ধ হয়নি। অবশ্য বৃটিশ সরকার তবু চাকমা রাজা ও রনু খাঁ দেওয়ানকে পরাভূত করার জন্য সব সময় রাজা ও দেওয়ানকে ব্যাতিভ্রম ও ব্যাপৃত রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযান চালিয়ে এবং পরোয়ানা জারি করে। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে/১১৪২ মঘীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আবার ক্যান্টেন মি. ও. টরমার এর নেতৃত্বে এক বিরূপ বাহিনী নিয়ে চাকমা রাজ্য আক্রমণ করেন। গোয়েন্দা মারফৎ এবারও রনু খাঁ দেওয়ান আক্রমণের খবর আগাম পেয়ে যান এবং পূর্বের একই পদ্ধতি ও রণ কৌশল নিয়ে দুর্দান্ত প্রায় উল্লঙ্গ কুকী বাহিনী সহ বিরূপ বাহিনী নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করেন ঐ কিল্লা মরং স্থানে। এবারও বৃটিশ বাহিনী শোষণীয় ভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। এবার চাকমা বাহিনী বৃটিশ বাহিনীকে অনেক দূর পর্য্যন্ত পশ্চাৎ তাড়া করেন। এই দুই যুদ্ধে বৃটিশের অভিযান প্রতিহত ও যুদ্ধে জয় চাকমাদের চাকমা রাজার ও সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ানের স্মরণীয় সাফল্য। যুগে যুগে এই মহাবীরকে জাতীয় বীরকে দেওয়ান রনু খাঁকে চাকমারা দেশপ্রেমিকারা স্মরণ করবেন, বৃটিশ সরকার এই যুদ্ধের কথা বিস্তারিত বিবরণ দেননি, শুধু অভিযান ব্যর্থ বলেই মন্তব্য শেষ করেন। ক্যান্টেন লুইন এই যুদ্ধদ্বয়ের কথা ও বিদ্রোহ স্বীকার করেন এবং স্বয়ং বোর্ডেও ইহা রেকর্ড করেছেন বলে লুইন স্বীকার করেছেন।

রনু খাঁ দেওয়ান চাকমা রাজার প্রধান সেনাপতি ও সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি রাজা সের দৌলত খাঁ এর জামাইও বটে। সেনাপতি রনু খাঁর ব্যবহৃত রেশমী কাপড়ের ইজর (পেন্টুলুন) উচ্চতা ৪ ফুট ২.৫ ইঞ্চি এবং কোমরের বেট্টনী ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি ও একখানা তলোয়ার পাওয়া গিয়াছে বলে জানা যায়। ১৯৭৭ ইং সনের আগে, মুক্তিযুদ্ধের আগে রাজামাটি প্রদর্শনী মেলায় ঐ তলোয়ার খানা আমি স্বচক্ষে দেখেছি হাতল চাড়া প্রায় ৪/৫ ফুট লম্বা এবং ৩/৪ কেজি ওজন হবে (অনুমান)। শুনেছি, মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজবাড়ীর অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। ঐ তলোয়ারটি আছে কিনা জানি না। রাজা সের দৌলত খাঁ প্রায় ১৬/১৭ বৎসর কঠিন সংগ্রাম এর ভিতর জীবন কাটিয়ে অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জাতি ও দেশকে রক্ষা করার চেষ্টা করে অতৃপ্ত হৃদয়ে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

ইতিহাসের গতিধারা ও পরবর্তীতে ইতিহাস প্রসঙ্গ আলোচনার সুবিধার্থে অধ্যাপক ড. এ, এম সিরাজ উদ্দীন সাহেবের একটা মূল্যবান তথ্য এখানে সন্নিবেশিত করা হল : The greatest of the Magh Zamindar was Sher Daulat Khan the recognised Chief of Chittagong Hill Tracts and with his son Jan Baksh Khan for years a thorn in the flesh of the company. The founder of the family fortunes was Shermast Khan who in 1737 AD emigrated from Arakan to Chittagong and obtained permission from Zul Oudar Khan. Then fowzdar of Chittgong to settle with his dependents in the hills of Rangunia. He received a grant of waste land in mouza Kodalah from the Fauzdar, cleared and cultivated it with the assistances of his followers and registered it as a Zamindar in the name of his son Sukdev Roy. Sukdev Roy died during his life time. As a result after Sher Musta Khan death in 1758 A.D. Sher Jabbar Khan his cousin succeeded to the Zamindari and the chiefship. Sher Jabbar Khan was succeeded by his son Sher Daulat Khan in 1765 A. D. Sher Daulat Khan died in 1782 but his outrages were caried to new height by his son Zan Boksh Khan and his lieutenant Ranu, Doolaib, Chooree, Konnoo and Thothang (Ref. the Revenue Administration of the East India company in Chittagong. P- 197)

১৩। রাজা জান বকস খাঁ

(১৭৮২-১৭৯৮ খৃষ্টাব্দ)

বৃটিশের সাথে চরম বিরোধ ও যুদ্ধাবস্থার মধ্যে রাজা সের দৌলত খাঁ এর মৃত্যু হলে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা জান বকস খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। সিংহাসনে আরোহন করে তিনিও পিতার মত যে কোন মূল্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। ইহাও তার স্মরণ আছে যে, যুবরাজ অবস্থায় তিনি পিতা ও সেনাপতি রনু খাঁনের সঙ্গে ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন এবং বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করেছিলেন। এদিকে বৃটিশরাও বসে নেই। তারা প্রতিবৎসর ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ও ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে বার বার চাকমা রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন এবং চাকমা রাজ্যের ও পাহাড়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করেন। রাজা জান বকস খাঁনের ৪ পুত্র সন্তান (১) টক্কর খাঁ (২) জক্কর খাঁ (৩) দোলপেটা ও (৪) ছলা জক্কর (সুরাসুরি)।

বৃটিশেরা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধ ও আক্রমণে এক নতুন কৌশল অবলম্বন করেন। তখন চাকমা রাজ্যের রাজধানী ছিল “সুখ বিলাস” এবং রাজা নগরে ছিল খামার বাড়ী অস্থায়ী বাসস্থান। রাজধানী সুখ বিলাস কর্ণফুলী নদীর তীর থেকে প্রায় ৮/১০ মাইল দক্ষিণ কূলে অভ্যন্তরে, দুর্গম এলাকায় অবস্থিত। বৃটিশরা মতলব করলেন যে, যদি সরাসরি স্থল পথে রাজবাড়ী ও সুখ-বিলাস আক্রমণ করা যায়, তবে ইহা জয় করতে সহজ হবে। কিন্তু চিন্তা হল এই দুর্গম জায়গার পথ-ঘাট না চিনে কিভাবে তথায় যাওয়া যায় এবং আক্রমণ করা যায়? পৃথিবীতে বিশ্বাস ঘাতক বিভীষণ ও মীরজাফর এর অভাব নেই এবং ভবিষ্যতেও অভাব হবে না। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এইরূপ বিশ্বাসঘাতক ও পথ প্রদর্শক অনুসন্ধানের উদ্যোগ করলেন। কয়েক দিনের মধ্যে একজন দক্ষ নিপুন “বিশ্বাস-ঘাতক” পাওয়া গেল সুদূর রামগড় মানিকছড়ি এলাকায় লক্ষীছড়িতে। লক্ষীছড়ির নিবাসী রামমনি দোভাষীর পুত্র জয়মনি দোভাষী এ কাজে দক্ষ লোক। জয়মনি দোভাষী সুখ বিলাস রাজধানীর চতুর্দিকের সকল রাস্তা সম্বন্ধে তার নখ-দর্পনে। জয় মনি দোভাষীর পুত্র জগৎ চন্দ্র দোভাষী লক্ষীছড়ি থানার কুমারী ও চম্পাতলী দুই মৌজার হেডম্যান হন। জগৎ চন্দ্র দোভাষীর পুত্র সাধন কুমর দোভাষীর জ্যেষ্ঠপুত্র এবং তার দ্বিতীয় পুত্র রমেন্দ্র ত্রিপুরা পুলিশ বিভাগে সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর হিসাবে (এ, এস, আই) চাকুরী করেন। এখন তারা দোভাষী না লিখে ত্রিপুরা লিখেন। আসলে তারা নাকি রিয়াং ত্রিপুরা। আমি ১৯৬৩-৬৪ সনে নানিয়ারচর থানার এসিসটেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার হিসাবে চাকুরী কালীন সময়ে উক্ত দারোগা রমেন্দ্র ত্রিপুরাকে সাক্ষাৎ পাই এবং আলাপ হয়। তখনও ঐ পদে ছিলেন, সম্ভবত প্রাথমিক পর্যায়ে রমেন্দ্র বাবু পুলিশ সেপাই হিসাবে চাকুরীতে যোগদান করেন পরে পদোন্নতি হয়। এখন জীবিত না মৃত জানি না, ৬ই মে, ২০০৫ ইং সাল।

উপরোক্ত জয়মনি দোভাষী, বৃটিশ সরকার থেকে উৎকোষ গ্রহণ করে বৃটিশ বাহিনীকে স্থল পথে ভাগলজুরি, সরফ ভাটা, পদুয়া হয়ে চাকমা রাজবাড়ী সুখ বিলাস এর পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। ভাগ্যিস রাজা জান বক্স খাঁ নিজ গোয়েন্দা মারফত আগাম আক্রমণের খবরটা পেয়ে যান এবং রাজ পরিবারের সদস্যদের সহ কিছু হালকা জিনিসপত্র নিয়ে দুর্গম এলাকা রাজানগর খামার বাড়ীতে গিয়ে আশ্রয় নেন। এদিকে বৃটিশ বাহিনী বিনা বাধায় সুখ বিলাস ও রাজবাড়ী দখল করে প্রায় ধ্বংস করে দেন। তারপর ইহার চারিদিকে এলাকাস্থ যাবতীয় ঘর-বাড়ী ও বসতি লুটপাট করে সৈন্য বাহিনী চট্টগ্রাম ফিরে যায় ও বিজয়ের বার্তা তথায় পৌছে দেন। সফল অভিযানের জন্য জয়মনি দোভাষীকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং পরবর্তীতে তার বংশধরেরা দুইটি মৌজার হেডম্যানশীপ পান (১৯০০ ইং সনে)।

তখনও রনু খাঁ দেওয়ান রাজার প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী ছিলেন। সেনাপতি রনু খার পরামর্শ জান বক্স খাঁ বৃটিশ কোম্পানীকে শুদ্ধ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। বৃটিশরাও রনু খাঁ ও তার অনুগামীদের অসুবিধায় ফেলার জন্য যাবতীয় আমদানী রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং চট্টগ্রামের ইংরেজ অধিকৃত হাট বাজারে পাহাড়ীদের যাতায়াত ও বনজ দ্রব্যাদি রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতেও রাজা জান বক্স খাঁ দমিত না হয়ে পুনঃ যুদ্ধ করার জন্য নিজে চেঙ্গি উপত্যকায় মহাপ্রহর দুর্গ নির্মাণ পূর্বক তথায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তৎভগ্নিপতি ও সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ানকে ইচ্ছামতি মুখে, অপর সেনাপতি জুনু দেওয়ানকে ধুরং খালে, সেনাপতি নারান দেওয়ানকে রাঙ্গামাটি নিকটস্থ হাজারীবাগে দুর্গ নির্মাণ করে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রেখে বৃটিশ বাহিনী আক্রমণের সম্ভাব্য রাস্তা ও অঞ্চল সুরক্ষিত করতে নির্দেশ দেন। সেই ভাবেই সব প্রস্তুত হয়ে উঠে। রাজা জান বক্স খাঁ সেনাপতি রনু খাঁ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বৃটিশের সম্ভাব্য হামলা থেকে রেহাই পাবার জন্য বাসস্থান ও রাজধানী ত্যাগ করে ছদ্মবেশে অবস্থান নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে ও আয়োজনে প্রায় পথ পার্শ্বস্থ গ্রাম থেকে লোকজন সরিয়ে দিল। এইভাবে সুখ বিলাস পতনের পর প্রায় দুই বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলছিল। দেশে নানা সমস্যা দেখা দেয়। চাষ-আবাদ এমন কি নিকটস্থ স্থানে জুম চাষ পর্যন্ত প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। জুমিয়ারা, প্রজারা গভীর অভ্যন্তরে জুম চাষ করতে থাকেন। এদিকে নিম্ন অঞ্চল বৃটিশের এলাকা থেকে সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আসা বন্ধ। শুধু চোরা চালানে ও গোপন পথে সামান্যতম দ্রব্যাদি আনা হয়। দেশে হাহাকার অবস্থা। তবু চাকমাদের, পাহাড়ীদের মনোবল ভাঙ্গে নাই, তারা জীবন দিয়ে যুদ্ধ করবে, দেশ উদ্ধার করবে।

দেশের পরিস্থিতি থমথমে ভাব। কখন কোথা দিয়ে বৃটিশ বাহিনী এসে গেল, আক্রমণ করল, যুদ্ধ বেঁধে গেল। সকলে শারীরিক ও মানসিক ভাবে প্রস্তুত।

ইতিমধ্যে এক অপূর্ব ঘটনা ঘটে গেল। এক জায়গায় বৃটিশ বাহিনী আসতেছে শুনে সকলেই দিক-বিদিক শূন্যভাবে দৌড় ও পলায়ন করতে থাকে লোকজন। ঐ স্থানে তাৎক্ষণিক ভাবে রাজা জান বক্স খাঁ ছদ্মবেশে উপস্থিত ছিলেন। তথায় এক গর্ভবতী স্ত্রীলোক পলায়ন করার সময় শারীরিক ক্রেশ সহ্য করতে না পেরে দুঃখে ও অবসাদে রাজাকে উল্লেখ করে গালি ও অভিশাপ প্রদান করেন “সেদাম সারা রাজা নাদি কিয়া ন মরোগৈ” (অপদার্থ রাজা কেন আত্মহত্যা করেনা) রাজা স্ত্রীলোকটির কথা শুনে, দুঃখ কষ্ট দেখে বিচলিত হন এবং মনে দারুণ আঘাত পান। ইহাতে রাজার মনের অবস্থা বিরাট পরিবর্তন ঘটে। তিনি নীরবে ঐ স্থান পরিত্যাগ করেন। তিনি আস্তানায় গিয়ে সকল নেতৃবৃন্দকে নিয়ে এক জরুরী বৈঠক ও মন্ত্রী সভা ডাকেন। ঐ সভায় তিনি দেশের পরিস্থিতি, জনগণ ও প্রজাগণের দুঃখ কষ্টের কথা বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন এবং বৃটিশের কাছে আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব দেন। একমাত্র রনু খাঁ দেওয়ান ব্যতীত সকলে সর্ব সম্মতিক্রমে আত্ম-সমর্পণের সিদ্ধান্তে ভোট দেন। সভা ভঙ্গ হল এবং নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ গন্তব্যে চলে যান।

এদিকে বৃটিশ কর্তৃপক্ষও বুঝে দেখল যে, চাকমা রাজ্য অবরোধ করে তাদের বিশেষ কোন লাভ হল না, আর্থিক বা বৈষয়িক। ইতিমধ্যে চাকমা বাহিনী পচাৎ অপসারণ ও বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হওয়ার শক্তি সঞ্চয় করতে না পারলেও তারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে হঠাৎ যেখানে যেই সুযোগ গেরিলা পদ্ধতিতে আক্রমণ করে দেন। বৃটিশ জমিদার, প্রজা, রায়ত সম্মুখে পড়লেই আক্রমণ অপহরণ, বন্দী ও হত্যা করা হয় এবং বৃটিশ বাহিনীকেও একই পদ্ধতিতে আক্রমণ করা হয়। এভাবে সারা চট্টগ্রাম, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

বৃটিশ বাহিনীরা চাকমা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গ্যারিসন বসান ও চেক পোস্ট স্থাপন করেন। এতে আক্রমণ ও বিদ্রোহের মাত্রা কিছু কমলেও বৃটিশ সরকার আর্থিকভাবে দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চাকমা ও উপজাতি এলাকা থেকে কোন রাজস্ব পাওয়া যায়নি। এমনকি উর্বর ক্ষেত্র রাঙ্গুনিয়া ও হালদা এলাকাতেও চাষ-আবাদ ব্যাহত হয়েছে। এতে সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের ভার অনেক বেড়ে যায়। আবাদী ও খামার এলাকার প্রায় জমি অনাবাদী পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই পরিস্থিতিতে চাকমা রাজা ও গভর্নর জেনারেলের মধ্যে একটা আলোচনা বৈঠক বসার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় উভয় পক্ষ থেকে।

Statishcal account of Bengal, Page- 117 Vol- VI এ জান বক্স খাঁ ও তার সময়ে যে রিপোর্ট পাওয়া যায় তাহা নিম্নরূপ : "In 1784 on Jan Baksh Khan, greatly disturbed the peace of the bourder and the collector submitted and elaborate plan for excluding him from all communication with low country, the Calcatta

authorised an usual recommended moderation they pointed out the advantage it first security the person of the depredator and ordered the collector to consider and report whether the hill peoploe might not be induced by lenient policy to become peacable be subject and cultivators of the lowland.

ইত্যাৱসৱে গভৰ্ণৰ জেনাৱেল ওয়াৱেন হেস্টিংস ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে বিলাত চলে যান এৱং তৎপৰিৱৰ্তে ১৭৮৫-৮৬ খৃষ্টাব্দে লৰ্ড জন ম্যাক গভৰ্ণৰ জেনাৱেল হয়ে এসে যোগদান কৱেন এৱং ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লৰ্ড কৰ্ণওয়ালিস (১৭৮৬-১৭৯৩) নতুন গভৰ্ণৰ জেনাৱেল হিসাবে যোগদান কৱেন। ৰাজা জান বকস খাঁ গভৰ্ণৰ জেনাৱেল লৰ্ড কৰ্ণওয়ালিস এৱ আমন্ত্ৰণে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দেৰ কলিকাতায় যান। সেখানে গভৰ্ণৰ জেনাৱেলৰ সাথে ৰাজাৰ বৈঠক হয় এৱং আলোচনান্তে উভয় পক্ষৰ শান্তি স্থাপনাৰ্থে চাকমা ৰাজ্য থেকে ব্ৰিটিশ বাহিনী প্রত্যাহাৰ কৱে নিতে সিদ্ধান্ত হয়। উভয় পক্ষ লড়াই/যুদ্ধ বন্ধ কৱাৰ স্বীকৃতি দেন এৱং সন্ধিৰ চুক্তি সম্পাদন কৱতে ৰাজী হন। এভাবে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে চাকমা ৰাজা জান বকস খাঁ ও গভৰ্ণৰ জেনাৱেল লৰ্ড কৰ্ণওয়ালিস এৱ মধ্যে ৩য় কাৰ্পাস চুক্তি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। শান্তি চুক্তিৰ বিষয় বা শৰ্ত্তগুলি নিম্নৰূপ বলে জানা যায় :

- (১) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী/ব্ৰিটিশ সৱকাৰ ৰাজা জান বকস খাঁনকে চাকমা ৰাজা হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন।
- (২) সিদ্ধান্ত হল যে, ৰাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব চাকমা ৰাজাৰ হাতে থাকবে।
- (৩) ব্ৰিটিশ সৱকাৰ উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন সংৰক্ষণ কৱবেন এৱং নিম্ন অঞ্চল ব্ৰিটিশ এলাকা থেকে লোক অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ থাকবে।
- (৪) চুক্তি মোতাবেক ৰাজা জান বকস খাঁ ৰাজ্যে আইন শৃংখলা শান্তি ৰাখতে বাধ্য থাকবেন।
- (৫) ব্ৰিটিশ বাহিনী চাকমা ৰাজ্যে অবস্থান কৱবেন চাকমাদেৱকে বা উপজাতিদেৱকে ভয়ভীতি প্রদৰ্শন কৱাৰ জন্য নয় বৱং তাদেৱ দায়িত্ব হবে জমি জমা ৰক্ষা কৱা ও হিংস্ৰ পাৰ্বত্য উপজাতীয় লোকদেৱ থেকে ৰক্ষা কৱা।
- (৬) চাকমা ৰাজ্য থেকে বাৰ্ষিক ৫০১ মন কাৰ্পাস/তুলা ব্ৰিটিশ সৱকাৰকে বাণিজ্য শুদ্ধ হিসাবে দিতে হবে।

মহামান্য গভৰ্ণৰ জেনাৱেল চাকমা ৰাজাৰ যাবতীয় অপৰাধ ক্ষমা কৱেন এৱং ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দ পৰ্য্যন্ত সমস্ত খাজানা মওকুফ কৱে দেন। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ স্বনামধন্য জমিদাৰ ঘোষাল পৰিৱাৰ ৰাজাকে এ কাজে অত্যন্ত সাহায্য কৱেছিলেন। দেশে এবাৰ কিছুতা শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পাহাড়ীৱা নিয়মিত সৰ্বত্র হাতে বাজাৱে যাতায়াত শুৰু কৱেন। আৱাৰ আমদানী ৰপ্তানী আৱম্ভ হয়ে যায়। দেশেৰ মানুহ কিছুতা আশাৰ আলো দেখতে পান এৱং স্বস্তিৰ নিশ্বাস ফেলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা সুখ বিলাস থেকে রাজধানী রাঙ্গুনিয়া রাজানগরে স্থানান্তর করেন। এই সময় বহু চাকমা কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড় হতে উত্তর পাড়ে পাহাড়তলী, পোমরা, গুজরা, মরিয়ম নগর, সৈয়দবাড়ী, ঘাটচেক, নজরটিলা, মঙ্গলহিল, ধামাইহিল, সোনাইছড়ি প্রভৃতি স্থানে এসে বসতি স্থাপন করতে থাকেন।

রাজা জান বকস খাঁ ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশের সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করলেও নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ান তো শান্তিচুক্তির কাছেও নেই, পক্ষেও নেই। তিনি এই শান্তিচুক্তিকে প্রত্যাখান করেন এবং আত্মগোপনে চলে যান আবার যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য। রাজ পরিবারের সদস্যদের অবশ্য আগেই নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। রাঙ্গামাটি নিকটস্থ হাজারী বাগ দুর্গের পাশে অস্থায়ী রাজবাড়ী তৈয়ার করা হয়েছিল। শান্তির সময় রাজ পরিবারের সদস্যরা রাজধানীতে এসে অবস্থান করেন এবং দুর্খোগের সময় রাঙ্গামাটিতে অস্থায়ী রাজবাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও পরবর্তীতে বৃটিশ সরকার উহার যথাযথ মর্যাদা দেন নাই। সরকারের রাজস্ব বাড়ানোর জন্য নানা ফন্ডি ফিকির তোলেন। সরকার ইজারা প্রথা রহিত করেন এবং কর স্বরূপ কার্পাস আদায় করে কর্মচারী মারফৎ তাহা বিক্রি করে ঢাকায় ট্রেজারীতে জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে কার্পাস এর পরিবর্তে অংকে নগদ কর পরিশোধের সুপারিশ করেন। পরবর্তী বৎসর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী তারিখে ১৮১৫/- টাকা রাজা জান বকস খাঁর উপর কর ধার্য করা হয়। বৃটিশ বাহিনী চাকমা রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসে রইল। প্রত্যাহারের কোন লক্ষণ নেই। বৃটিশ জমিদারদের প্রজা ও রায় কর্তৃক পাহাড়ীদের দখলকৃত জমি-জমা আর ফেরৎ পাওয়া গেল না। পাহাড়ীরা উচ্ছেদ হয়ে নিজ জায়গায় ফিরে আসতে পারলেন না। পাহাড়ীরা, চাকমা রাজার প্রজারা বাধ্য হয়ে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে অভ্যন্তরে বসতি করেন। এভাবে বহু পাহাড়ী রাঙ্গুনিয়া, রাউজান, ফটিকছড়ি থেকে নিজস্ব জমি-জমা হারিয়ে ফেলেন।

১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হলেও ইহাকে প্রকৃত শান্তিচুক্তি বলা যায় না বরং ইহা গভর্নর জেনারেল ও রাজা জান বকস খাঁ এর মধ্যে যুদ্ধ বিরতি বা সামরিক যুদ্ধ সমাপ্তি বলা যায়। জানা যায় এই শান্তিচুক্তি নিয়মিত ভাবে নিষ্পত্তি হয়নি এবং গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলে অনুমোদন করা হয়নি। শুধু গভর্নর জেনারেলের ব্যক্তি মাত্তিক সম্পাদন করা হয়েছে। চুক্তিতে চাকমা রাজ্যের যতটুকু স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করা হয়েছে, তাহা রক্ষা করা হয়নি। চুক্তির পরে চাকমা রাজার পূর্ববর্তী ক্ষমতা ও সম্মান দেওয়া হয়নি এবং রাজার নিরাপত্তার ব্যবস্থাও স্বাভাবিক ভাবে রাজ সিংহাসনের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়নি। চাকমা রাজার সীমানা পূর্বাবস্থায় আনা হয়নি। চাকমা রাজা, প্রায় রাঙ্গুনিয়া রাজানগর রাজবাড়ী হতে উৎখাত

হয়ে রইলেন। চাকমা রাজ্যের সুবিধাজনক স্থান থেকে কোন বৃটিশ বাহিনী প্রত্যাহার করা হয়নি। এভাবে বৃটিশরা শান্তিচুক্তি করলেও চুক্তির মর্যাদা রাখেন নাই এবং চাকমা রাজ্যটি দখল করার পায়তারা করতে থাকেন। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী প্রথা চালু করেন কিন্তু কোন পাহাড়ী এ ফাঁদে পা দেননি। একমাত্র রাজ্যটিতে ১০৫ নং জীবতলী মৌজায় “ধূল্যাছড়ি মুৎসুদী লাট” (৪০০ একর) ও কাণ্ডাই এ ওয়াল্লায় রমনীমোহন লাট (প্রায় ৫০০/৬০০ একর) চা-বাগান লাট ব্যতীত কেহ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী প্রথায় জমি ক্রয় করেননি। উভয় জমিদার বাঙ্গালী, একজন বড়ুয়া বৌদ্ধ ও অপরজন হিন্দু বাঙ্গালী। ইহা পাহাড়ীদের চাকমা রাজ্যের উপর শ্রদ্ধা ও সম্মানের নিদর্শন।

এইরূপ চরম পরিণতি ও অবস্থায়ও রাজা জান বকস খাঁ সারা বিবাদমান সময়ে আক্রমণাত্মক শত্রু বৃটিশের বিরুদ্ধে অদমিত ভাবে যুদ্ধ করে যান। এই স্মরণীয় শ্রদ্ধাবান বিশ্বাস ভাজন যোদ্ধা শুধু সিংহাসন এর জন্য যুদ্ধ করেননি দেশ, জাতিকে ভালবেসে দেশপ্রেম নিয়ে নিজ কর্তব্য পালন করেছেন। তার জ্ঞান ও গুণ সবার কাছে নমস্য ছিল। তিনি একজন ন্যায় পরায়ন, উৎসর্গ প্রাণ, প্রজা রক্ষক শাসক ও রাজা ছিলেন। তিনি একজন অদম্য সাহসী, নজীরবিহীন দেশপ্রেমিক। প্রতিভাবান শক্তিশালী এবং আজীবন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে যোদ্ধা ছিলেন। কি করুণ পরিণতি! এই মহান নেতা, রাজা, যোদ্ধা রাজা জান বকস খাঁ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্বাচিত অবস্থায় অজ্ঞাত স্থানে মৃত্যুবরণ করেন। অনেকে তার মৃত্যু মহাশ্রম দুর্গে হয় বলে ধারণা করেন।

দেওয়ান রনু খাঁন কখনও বৃটিশের কাছে নতি স্বীকার করেন নি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৭৯৫-৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বৃটিশের সাথে এক যুদ্ধে, শেষ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে জঙ্গলে পলায়ন করেন। মনের দুঃখে ও অবসাদে জীবন যুদ্ধে বৃটিশের সাথে যুদ্ধে এভাবে পরাজিত হয়ে মহাবীর, জাতীয় বীর রনু খাঁ দেওয়ান সম্ভবতঃ ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে দোহাজারী জঙ্গলে বিষ পান করে জীবন বিসর্জন দেন। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তার দুই পুত্র চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ হাজারী বাগ এলাকায় বসবাস করতেন। পরে বোধ হয় কাণ্ডাই নদীর মুখে স্থানান্তরিত হন। ঐ কাণ্ডাই এলাকা থেকে তাদের অধঃস্তন পুরুষ গোপীনাথ দেওয়ান ধরম বকস খাঁ এর একমাত্র রাজকন্যা মেনকা/চিকনবিকে বিবাহ করেন।

১৪। রাজা টব্বর খাঁ (১৭৯৮ - ১৮০১ খৃষ্টাব্দ)

রাজা জান বকস খাঁন এর অজ্ঞাত স্থানে মৃত্যু হলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তার জ্যেষ্ঠপুত্র টব্বর খাঁ সিংহাসনে বসেন। তিনি স্বল্পকাল মাত্র রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে তিনি রাজধানী রাজা নগরে এক বিরাট সাগর দীঘি খনন করেন। সেই দীঘিটি নাকি এখনও বর্তমানে রয়েছে। তিনিও তার পিতার মত অদম্য সাহস বুকে নিয়ে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি তার রাজ্যে বৃটিশের আধিপত্য স্বীকার করেননি। তিনি বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে নিতে দৃঢ় সংকল্প হন। বৃটিশের সাথে এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি আত্মগোপনে যান। সম্ভবতঃ মহাশ্রম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রাজা টব্বর খাঁনের রাজত্ব কালে তার রাজ্যে ফ্রান্সিস বুকাননের ভ্রমণও খুবই চিত্তাকর্ষক ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশ্ব পর্যটক, মার্কো পলো ও ইবনে বতুতা যেদেশে গেছেন, সেই দেশকে উজ্জ্বল করে বর্ণনা করেছেন। যাহা পরবর্তীতে সেই দেশের প্রাণবন্ত বর্ণনা ও তথ্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। রাজা টব্বর খাঁনের রাজত্বে সেই বুকাননের ভ্রমণও খুবই তথ্যপূর্ণ তথ্য সম্পদে পরিণত হয়েছে। ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ নোয়াখালীর লক্ষ্মীপুর থেকে রওনা দিয়ে ফেনী, মিরসরাই, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম হয়ে বার্মা সীমান্ত নাফ নদীর জল পর্যন্ত স্পর্শ করে আসেন এবং সেখান থেকে ফিরে বান্দরবান ভ্রমণ করার পর কর্ণফুলী নদীর উজান ২৬/০৪/১৭৯৮ তারিখ টব্বর খাঁনের রাজ্যে চাকমা রাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি রাজার রাজধানী রাজানগর রাজ বাড়ীতে যাননি। তবে ইহা কর্ণফুলী নদীর উত্তর পাড়ে প্রায় ১০/১২ মাইল অভ্যন্তরে অবস্থিত বলে শুনেছেন। তিনি কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত গ্রাম গুজরা পোমরা, মরিয়ম নগর, সৈয়দ বাড়ী, ঘাটচেক, নজরটিলা, কদমতলী, শিলক, কোদলা প্রভৃতি গ্রামগুলিতে কিছু সংখ্যক চাকমা বসতি দেখতে পান। তারপর তিনি রাম পাহাড় সীতা পাহাড় এলাকায় পৌঁছেন। সীতা পাহাড়ের পাদদেশে এক শীর্ণ স্রোতস্বিনীতে সীতা ঘাটে হিন্দু তীর্থ যাত্রীদের পূজা করতে দেখেন। তিনি বড় চাকমা পাড়া চিৎমরমে পৌঁছেন ২৭/০৪/১৭৯৮ তারিখ। তিনি তথায় বহু চাকমা পরিবার বসতি দেখতে পান। সেখানে তিনি রাজা টব্বর খাঁ এর একটা ফাঁড়ি/টোল অফিস দেখতে পান। ঐ টোল অফিসে আমদানী রপ্তানী জাত দ্রব্যের উপর টোল টেক্স আদায় করতে দেখেন। ওখানে এখনও ফরেস্ট অফিসের একটা টোল অফিস রয়েছে। ঐ চিৎমরম গ্রামে এখন আর কোন চাকমা পরিবার নেই। চাকমারা কোন কারণে ঐ স্থান ত্যাগ করে গেলে মগ/মার্মারা বসতি করেন। এখন ঐ স্থানে মগ/মার্মারা আছেন এবং ওখানে একটা সুন্দর বৌদ্ধ বিহার রয়েছে, যাহা পবিত্র চিৎমরম বিহার নামে পরিচিত। ঐ বিহারে বৌদ্ধ পূর্ণিমাগুলিতে শত শত তীর্থ যাত্রীর সমাগম হয় এখনও। তারপর তিনি কাণ্ডাই নদীর মুখে আসেন। সেখানেও বিরাট চাকমা বসতি ও গ্রাম

দেখতে পান। তথায় তন্যা গোজা তালুক এর লোকেরা বসবাস করতেন। পরবর্তীতে ১৮৮০/৮১ খৃঃ বৃটিশ সরকার ঐ এলাকা রিজার্ভ ফরেস্ট করলে চাকমারা উচ্ছেদ হন। সেখান থেকে তিনি রাইংখ্যং মুখে চলে আসেন। সেখানেও চাকমা বসতি দেখতে পান। তিনি তথায় নেমে গ্রামের লোককে (চাকমা) জিজ্ঞাস করেন, তোমরা কোথেকে এসেছ? তারা হান্সরকুল ও আরাকান থেকে এসেছেন বলে জানান। হান্সরকুল দক্ষিণ চট্টগ্রামে আরাকান সীমান্তে অবস্থিত। রাইংখ্যং মুখে আল্যাচান লস্কর (চাকমা) নামে এক নেতৃস্থানীয় লোকের সাথে সাক্ষাৎ হয়। নেতা আল্যাচান লস্কর বলেছেন যে, রাইংখ্যং উপ নদীর এক সপ্তাহ উজান গেলে কুকী বা বনযোগীদের বাসস্থান পাওয়া যায়। ঐ নেতার বহু গ্রামের প্রজা ছিল যারা তাকে খাজানা দিতেন। রাইংখ্যং মুখের এক বাঁক উপরে ধূল্যাছড়ি গ্রামেও তিনি চাকমা বসতি দেখেন। তারপর তিনি কুর্যাবাঁক পৌছেন। কুর্যাবাঁক ছড়াটি ন' ভান্সা রাম পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। ওখানে একটি হ্রদ বা ঢেবা ছিল যেখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। তিনি মানিকছড়ি মুখে কনক (কানু খান) দেওয়ানের পুরাতন বাসভিটাটি দেখতে পান, যিনি চাকমা রাজার একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন এবং ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন, বৃটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন। সেখান থেকে মগবান হয়ে রাজমাটি পৌছেন বিকাল বেলা। মগবান একটা হ্রদ ও কর্ণফুলী নদীর বাঁক। ওখানে তখন প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। কর্ণফুলী বাঁধ নির্মাণ আগ পর্যন্ত মগবান হ্রদ ঐ এলাকায় মাছ সরবরাহ করতো। তিনি রাজমাটিতে কর্ণফুলী নদীর পূর্ব পাড়ে চাকমা রাজার অস্থায়ী বাসভবন দেখতে পান। রাজ পরিবারের নিরাপত্তার জন্য রাজারা এই কুটি নির্মাণ করেন। তিনি রাজ বাড়ীতে যান কিন্তু রাজা টব্বর খানের দেখা পাননি, তখন রাজা অন্যত্র ছিলেন। ফ্রান্সিস বুকাননের ভাষায় রাজ বাড়ী বর্ণনা করা গেল-

This his principal residence is for from being a large building yet it contains the whole of his family except a few Bengalee servants who have huts in the neighbourhood. A large square enclosure made of mats and called a fort contains a numbers of huts raised and posts like the other country. None of them are great dimensions like house of Kangla Prue. Two huts are roofed like common thatched bungalows used by European in Bengal and are the peculiar dwellings of the Mang or Prince and of his brother Zubbaka. The Raja not being at home I did no go to his fort as found that my looking in at a gate alarmed to woman who to squall and were joined by numerous band of pigs. There is hardly any cultivation in the neighbourhood. But about a begah ground has attempted to tenderd up by plough.

তিনি তথায় এক ভিক্ষু (সম্ভবতঃ চাকমা) নাগাল পান যিনি তাকে বলেন যে, চাকমারা সাধারণতঃ এখন রোয়াং (আরাকান) এর ভাষা ভুলে গেছেন কিন্তু এখন যারা আরাকানে চাকমা (Sak-meo) আছেন, তাদের ভাষা আরাকানি। ভিক্ষু কর্তৃক প্রদর্শিত বইটি আরাকানি ভাষায় লিখা। তাদের ধর্ম আরাকানীদের মত একইরূপ। তিনি আরো বলেন যে, তাদের যাজকেরা দুই শ্রেণী শ্রমণ ও মৈস্যাং। মৈস্যাংরা পদবীতে বড়। বাঙ্গালী তাদেরকে রাউলী বলে। এখানকার অদিবাসীদের চাকমা (Sak-meo) বলা হয় এবং আরাকানে বসবাসরতদের মৈস্যাং সাক বলা হয় বলে ভিক্ষু মহোদয় উল্লেখ করেন।

২৯ শে এপ্রিল ১৭৯৮ তারিখ প্রায় সকাল ৮ টায় তিনি নদীর উজান রওনা দেন। রাজ্যমাটিতে নদীর প্রশস্ততা প্রায় ৫০ গজ জোয়ার ভাটা হয় প্রায় ঘণ্টায় ১ মাইল বেগে। ইহার প্রায় ১ মাইল উপরে (উজান) রনু খাঁ দেওয়ানের দুই ছেলে চন্দন খাঁ ও রন্তন খাঁ বসবাস করেন। ২/৩ বৎসর আগে অর্থাৎ প্রায় ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে রনু খাঁ দেওয়ান দোহাজারী জঙ্গলে বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন বলে তিনি জানান। সকাল ৯ টায় তারা চেঙ্গি নদী মুখে পৌছেন। চেঙ্গি নদীতে ছোট নৌকা দিয়ে ৫/৬ দিনের উজান যাওয়া যায়। চেঙ্গি নদীর অধিবাসীরা চাকমা। রাজা টক্সর খাঁ তথায় বসবাস করেন বলে তিনি অনুমান করেন। সকাল ১০ টায় তারা কাইন্দা পৌছেন। তথায়ও চাকমারা জুম চাষ করেন। কিছু উজান পাহাড়ের পাদদেশে বসন্ত নামে একটি গ্রাম রয়েছে যেখানে রাজা টক্সর খানের একজন সম্ভ্রান্ত প্রভাবশালী দেওয়ান পরিবার বাস করেন তার নাম শরৎ খাঁ দেওয়ান, তারপর তারা হাত্যা-হাতনী (Elephant Rock) পৌছান। ইহার বাম পার্শ্বে সিলার ডাক গ্রাম। বিকাল ৩ টায় তারা সুবলং মুখে পৌছান যেখানে শরৎ দেওয়ানের বাসস্থান যিনিও একজন সম্ভ্রান্ত দেওয়ানের পরিবার। ইহার পর তারা কাচালং মুখে পৌছেন। সেখানে একটা বিরাট চাকমা গ্রাম ও বসতি ছিল। তথায় পৌছে চাকমারা ইউরোপিয়ান মানুষ দেখার জন্য দলে দলে জড় হতে থাকে। চাকমারা দেখতে মার্মাদের মত এবং খুবই হাস্যোজ্জ্বল। সাধারণতঃ পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে সুন্দর বলে ফ্রান্সিস বুকানন মন্তব্য করেন। তারা প্রায় চাকমা খাছে বাংলা বলেন। তারা অন্যান্য উপজাতিদের (লুসাই, পাংখো প্রভৃতি) ভাষা বুঝেনা বলে জানান। সাধারণতঃ চাকমারা কিছু কিছু বাংলা পড়তে পারেন কিন্তু মৈস্যাংরা (ভিক্ষু) আরাকানি ভাষা ও বই ব্যবহার করেন। চাকমারা আরাকানীদের মত মৈস্যাংদের সম্মান করেন না বা জানেন না। চাকমারা মৈস্যাং ব্যতীত দেবতাদের (হিন্দু) ও পূজা করার দরুণ এইরূপ হয়েছে বলে বুকানন মনে করেন। চাকমারা ভূত-বৈদ্য বিশ্বাস করেন এবং অনেক বৈদ্য মহিলা জানা যায়। এই মহিলা ভূত-বৈদ্যরা নাচেন, গান করেন ও তন্ত্র মন্ত্র করেন। তারা ভূত ও দেবতাদের সাহায্যে অনেক কিছু করতে পারেন বলে চাকমারা বিশ্বাস করেন। কাচালং উজান নদীর পথে ৩/৪ দিনের পথ যাওয়া যায়। ঐ কাচালং নদী দিয়ে কুকী/লুসাইরা এসে লুটপাট

করেন এবং খুব দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করেন। তারা (কুকীরা) চেঙ্গি, কাচালং ও ফেনী নদীর উপত্যকায় বসবাস করেন। এখানে মাটি উর্বর কিন্তু সেভাবে চাষ আবাদ করা হয় না। সঠিক ভাবে চাষ করলে উৎপাদন ও ফসল বেড়ে যেতো।

৩০ শে এপ্রিল ১৭৯৮ ইং তারিখ তারা বরকল পৌছেন। তথায় বরকল জল প্রপাত রয়েছে এবং সুন্দর সুন্দর সুউচ্চ পর্বতমালা রয়েছে। সেখান থেকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়। সেখানেও একদল চাকমা নাগাল পেয়েছেন তারা। ঐ চাকমারা রাজ বাড়ী রাজ্যমাটি থেকে জুম চাষ করতে গেছে। চাষ শেষ হলে ফসল উঠলে তারা আবার খামার বাড়ী নিজ গ্রামে ফিরে আসবেন বলে তারা জানান। এভাবে ফ্রান্সিস বুকানন চাকমা রাজ্য ভ্রমণ করে ৪/৫/১৭৯৮ তারিখ আবার চট্টগ্রাম ফিরে যান। মনে হয়, তিনি শুধু মাটি জরিপ, ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে বেড়াতে আসেন নি। তিনি চাকমা রাজা টক্বর খাঁ ও রাজার সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ানের সন্ধানে এই পথে আসেন। এক টিলে দুই পাখী। রাজা টক্বর খাঁনের সাথে দেখা না হলেও তার অস্থায়ী রাজ বাড়ীর খোঁজ পান এবং রনু খাঁ দেওয়ানের ছেলেদয় চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ র খোঁজ পান। সম্ভবতঃ ঐখান থেকেই রনু খাঁ দেওয়ানের মৃত্যু সংবাদ পান এবং রাজা টক্বর খাঁ মহাপ্রম দুর্গে অবস্থান করেন বলে জানতে পারেন।

উন্নততর বৃটিশ বাহিনীর সাথে এভাবে অনেক যুদ্ধ করে। প্রতি পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্ট কাল ব্যাপি যুদ্ধ করে সংগ্রামী বীর দেশ প্রেমিক সন্তান রাজা টক্বর খাঁ আনুমানিক ১৮০১ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চাকমাদের গৌরব পূর্ণ যুদ্ধ, সংগ্রাম ও উদ্যম চিরতরে শেষ হয়ে যায়। এরপর চাকমারা ও চাকমা রাজা বৃটিশের বিরুদ্ধে আর যুদ্ধ করার সাহস পায়নি।

১৫। রাজা জব্বর খাঁ (১৮০১-১৮১১ খৃষ্টাব্দ)

রাজা টব্বর খাঁনের মৃত্যুর পর ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তার ছোট ভাই জব্বর খাঁ রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি প্রায় ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। তার রাজত্বকালে কোন যুদ্ধ বিদ্রোহ শুনা যায়নি। তিনি বৃটিশ কর্তৃপক্ষের সাথে এক রাজনৈতিক সমাধান ও বুঝা পড়ায় এসে অনেকটা নিরিবিলি রাজত্ব করে যান। তার সময় শ্রী শ্রী জয় কালি জয় নারায়ণ জব্বর খাঁ নামে ১১৬৩ মধ্যে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পার্সীতে উৎকীর্ণ একটা সীল মোহর পাওয়া গেছে। তিনি হিন্দু ভাবাপন্ন ও কালী ভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। তিনি হিন্দুর মত ভোজন করতেন এবং আচার ব্যবহার ও চলা ফিরায় হিন্দুর মত ছিলেন।

বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যটি সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করার যাবতীয় কৌশল অবলম্বন করেন। তৎকালীন বৃটিশ সরকারের “তৈলপী-বাহক” জাতি হিন্দুদের এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ ব্যবহার করেন। তোষামোদকারী বড় বড় পরিবার ও জমিদারের লোকেরা রাজ বাড়ীতে ও রাজকার্যে ঢুকে পড়েন। তাদের পরামর্শ ছাড়া রাজা বাহাদুর কিছুই করতেন না। চাকমারা আদিতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও মোগল শাসনের সময় মুসলমান ভাব ধারা গ্রহণ করেন। ১১ (এগার) জন চাকমা রাজা ‘খাঁ’ উপাধি গ্রহণ করেছেন রাজা সুভল খাঁ (১৭১৩-১৮৩৪) থেকে রাজা ধরম বকস খাঁ (১৮১২-১৮৩২ খৃঃ) পর্যন্ত। রাজা জব্বর খাঁ মুসলমানী নাম ধারণ করলেও আচারে ও বিশ্বাসে হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তার পুত্র ধরম বকস খাঁও পিতার ন্যায় হিন্দু ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কথিত আছে, রাজ্যমাটি চট্টগ্রাম মহাসড়কের উপর রানীর হাট বাজার এর পার্শ্বে গাবতলী দক্ষিণে মধ্য ঘাগড়ার অন্তর্গত ‘কালীপুরে’ এক কালী মন্দির ছিল। জনশ্রুতি তথায় রানী কালিন্দী রানী প্রতি বৎসর ন্যূনতম একজন মনুষ্য বলি দিতেন। সম্ভবতঃ ঐ কালী মন্দিরটি রাজা জব্বর খাঁ প্রতিষ্ঠা করে মনুষ্য বলি প্রথা সৃষ্টি করেন।

বৃটিশ সরকার যত সব ষড়যন্ত্র করে চাকমা রাজাকে আরো শোষণীয় পর্যায়ে আনার জন্য রাজবাড়ীতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ঢুকিয়ে দেন। তাই, চাকমা রাজা জব্বর খাঁ বৃটিশের সাথে এক রাজনৈতিক সমাধান, বৃটিশের আনুগত্য স্বীকার এবং অনেকটা ভৌগোলিক অধিকার ছেড়ে দিয়েও নিজের প্রাণটুকুও রক্ষা করতে পারলেন না। প্রবাদ আছে, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের ফলে তার আত্মীয়রা পূর্ব পুরুষগণের নবাব প্রদত্ত সনদপত্র, তাম্রলিপি, রাজকীয় দলিল পত্রাদি গোপন করে ফেলেন এবং আত্মীয়গণের ষড়যন্ত্রে রাজা জব্বর খাঁ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। তার অকাল মৃত্যুতে রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র বিশৃংখলা দেখা দেয়, রাজগদী নিয়ে রাজ পরিবারে ঘোরতর কলহ ও বিবাদ সৃষ্টি হয়। এই সুবর্ণ সুযোগটা বৃটিশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লয়ে অপেক্ষা করতে ছিলেন। কি করলে তা লাভের ভাগটা বেশী হবে। এভাবে একজন নিরীহ, সরল রাজার প্রাণ হরণ করা এবং রাজার রাজত্ব এর অকালে যবনিকায় পতন হল।

১৬। রাজা ধরম বকস খাঁ

(১৮১২-১৮৩২ খৃঃ)

রাজা ধরম বকস খাঁ এর রাজত্ব ও রাজত্বকাল খুবই সংকটময় বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে আরম্ভ হয়। এ ব্যাপারে তার আপন পিতৃব্য দোলপেটার যথেষ্ট হাত ও ষড়যন্ত্র ছিল বলে অনেকের মতামত। পিতৃব্য কাকা দোলপেটা সিংহাসন অধিকার করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। সিংহাসন আরোহণে ব্যর্থ হয়ে দোলপেটা রাজা ধরম বকস খাঁ এর নামে নানা অরুচি কুরুচি নিন্দা সূচক গাল-গল্প ও কিষদন্তি মূলক প্রচারণা প্রচার করতে থাকেন। যেই গল্পগুলি রাজা ধরম বকস খাঁ এর মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত রচিত ও প্রকাশিত হয় বলে জনশ্রুতি। তার রাজত্ব ও রাজা সম্পর্কে এইরূপ বহু জনশ্রুতি ও কিষদন্তি মূলক ঘটনার অবতারণা দেখা যায়। নিম্নে এইরূপ কয়েকটা জনশ্রুতি ও কিষদন্তি মূলক ঘটনা আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হল।

(১) প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে রাজা জব্বর খাঁ ১৮১১ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার পর রানী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। তার নাম রাখা হয় ধরম বকস খাঁ। ইহাতে রাজার অমাত্যগণ ও প্রজাগণ তাকে রাজপুত্র বলে কেহই বিশ্বাস করলেন না, অবৈধ সন্তান, ১৮ মাসের মধ্যে বলতে থাকেন। রাজ পরিবারের সদস্যরা কেহ রাজপুত্র বলে মেনে নিতে পারলেন না। বিধবা রানী এই শিশুপুত্রকে নিয়ে বড়ই নিরাশ্রয়ে অবস্থায় পতিত হন। পিতৃব্য দোলপেটা নিজের স্বার্থ সিদ্ধির মানসে কৌশলে একদিন, রাজপুত্রকে এক বড় গাং পাড়ে নিয়ে যান। তখন তার বয়স মাত্র ২ বৎসর। নদীর পাড়ে নেয়ার সময় বালকটিকে আকাশের মেঘ ছায়া দিত। বালকটিকে বলি দেওয়ার জন্য মায়ের বুকে থেকে পৃথক করে এক জঙ্গলে রাখা হলে অতিভয়ংকর এক অড়াবতী সাপ (তলইবনার মত বড়) এসে বালকটির উপর ফনা বিস্তার করে ছায়া দিতে থাকেন। দৃশ্যটি দেখে সকলে প্রাণ লয়ে গ্রামে পলায়ন করেন এবং মনে করেন যে, এতক্ষণে অড়াবতী সাপ বালক ও তার মাকে গিলে ফেলেছে। এই সংবাদ রানীর এক ধর্মতঃ পুত্র ক্যাথলি রোয়াজা খবর পেয়ে ধরম বকস খাঁ ও তার মা প্রেমাকে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আশ্রয় দেন এবং গোপনে প্রতিপালন করতে থাকেন।

একদিন ক্ষেতে কাজ করার সময় রানী প্রেমা বালক ধরম বকস খাঁ কে সামান্য বস্ত্রের উপর শুইয়া রাখেন। বালকটি ঘুমিয়ে পড়ে। এসময় এক অড়াবতী সাপ এসে বালককে ফনা বিস্তার করে ছায়া দিতে থাকেন। হঠাৎ রোয়াজা মহাশয় তথায় এসে দৃশ্যটি দেখে বিস্মিত হন এবং বালকটির কপালে কিছু মঙ্গল অনুমান করে বালক ও তার মাকে বাড়ীতে নিয়ে যান এবং বড়ই আদর যত্ন করতে থাকেন। রানী বিষয়টি দেখে ভয় পেয়ে যান। আবার বুঝি তার ছেলেটাকে বলি দেওয়ার পায়তারা চলতেছে। রোয়াজা মহাশয় ব্যাপারটা রানীকে খুলে বলেন এবং ভবিষ্যতে বালকটি রাজা বা মন্ত্রী হলে কিছু সুখ সুবিধা প্রার্থনা করেন। রানী নীরবে সব অঙ্গীকার করেন।

এ অবস্থায় দেশে গোলমাল ও অশান্তি অবস্থায় (১) ফাকসা গোজা নেতা বিদ্যাধর দেওয়ান (২) চেগে গোজা নেতা লক্ষী বরণ দেওয়ান (৩) ধামাই গোজা নেতা বজ্রলোচন দেওয়ান ও (৪) বর্কোয়া গোজা নেতা নাক ধবা দেওয়ান এই চারি অমাত্য ৫ বৎসর কাটিয়ে দেন। শূন্য রাজ সিংহাসন পূরণ করার লক্ষ্যে পুরাতন আদি নীতি রীতি অনুসারে সকল প্রজাবৃন্দ ও অমাত্যগণ এক সিংহাসন তৈয়ার করতঃ এক হাতিকে অশুর চন্দন নানা সাজে সজ্জিত করে সাত তীর্থ জলে গুটি করে নতুন রাজার সন্মানে হাতিকে ছেড়ে দেন। সেই হাতি নাবালক ধরম বকস খাঁকে প্রণাম করে মাথায় তুলে সিংহাসনে বসালে রাজ সভায় সকলে ধরম বকস খাঁকে রাজা বলে মেনে নেন। ধরম বকস খাঁ এর বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত উক্ত চারি অমাত্য ধরম বকস খাঁ এর নামে ৯ বৎসর রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করেন। এভাবে তারা প্রায় ১৬ বৎসর দেশ শাসন করেন। কিন্তু তাদের রাজ্য পরিচালনার সরকারী অনুমোদন পাওয়া যায়নি এবং ঐ চারি অমাত্যের বংশধরেরা এখন কোথায় জানা যায়নি। (তথ্য সূত্র- স্বধর্ম পথে- আঙু ফুলচান কার্বারী ১৯-৩১ খৃঃ)

(২) জনশ্রুতি অমাত্যরা কিছুতেই ধরম বকস খাঁকে রাজা রূপে মেনে নিতে পারছেন না। রাজাকে হত্যা করার তারা আর এক কৌশল অবলম্বন করেন। তারা রাজাকে এক প্রস্তাব দেন, কর্তা মহাশয়, রাজগিরি করতে হলে রাজার মত চলতে হবে। আদিকালে রাজারা রাজ্যাভিষেক এর পর মৃগয়া শিকার করতে যান। আপনারও সেইরূপ মৃগয়া যাওয়া দরকার। রাজা রাজী হয়ে যান। তারা রাজাকে মৃগয়ায় নেওয়ার ছলে কাউখালী শেষ সীমান্ত লক্ষীছড়ির এক দুর্গম জঙ্গলে নিয়ে যান। উদ্দেশ্য সেখানে রাজাকে বলি দেওয়া হবে। রাজাকে বলি দেওয়ার সব আয়োজন শেষ। এমন সময়ে তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ অমাত্য প্রতিবাদ করেন যে, রাজাকে হত্যা করে কেন তারা হাত কালি করবেন। পাপ কর্ম করবেন, রাজাকে তার পুণ্যানুযায়ী রাজভোগ ও রাজ্য শাসন করতে দিন। এতে সকলের মনে মানসিক পরিবর্তন এসে যায় এবং রাজাকে হত্যা করা হল না কিন্তু তারা রাজাকে অতিভোজন করিয়ে অঘোর ঘুমে জঙ্গলে একা রেখে সকলে পালিয়ে আসেন। বিকাল বেলা সূর্য্য ডুবন্ত অবস্থায় রাজা ঘুম থেকে উঠে দেখে তার সঙ্গীরা কেহ নেই। তিনি প্রমাদ গুনলেন তারা কোথায় গেল? এমন সময় জঙ্গলের এক বিরাট বন্য হাতি তাকে তাড়িয়ে আসে এবং তাকে ধরে ফেলে। তিনি তো জীবনে বাঁচার আশা ছেড়ে দেন। হাতিটা তাকে পিঠে তুলে সোজা রাজবাড়ী রাজানগর এসে হাজির। সেই হাতি নাকি আর জঙ্গলে ফিরে যায়নি, রাজবাড়ীতে রাজার খেতমতে রয়ে যায়। হাতিটা রাজার পোষ্য হয়ে চিরকাল রাজার সঙ্গে থেকে যায়। ঐ হাতিটা রাজাকে এদিকে ওদিকে রাজ্য পরিদর্শনে নিয়ে যেতেন। (সূত্র- বাবার থেকে প্রাপ্ত জনশ্রুতি)।

(৩) ধরম বকস খাঁ রাজত্বকালে পর্তুগীজরা বৃটিশের কাছে রাজনৈতিক ভাবে পরাজয় ও আত্মসমর্পণ করলেও তারা বৃটিশের অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রাম, বাংলার ও ভারতে বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা বাণিজ্য করতেন। চট্টগ্রাম শহরে পর্তুগীজদের একজন এইরূপ বাণিজ্যিক গভর্ণর অবস্থান করতেন তাদের ব্যবসা পরিচালনার জন্য পর্তুগীজ গভর্ণর মহোদয় ও রাজা ধরম বকস খাঁ এর মধ্যে গভীর পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে উঠে। সেই সময় ঐ পর্তুগীজ গভর্ণর বসবাস করতেন প্রাক্তন চট্টগ্রাম কমিশনার ভবন লাল কুঠিতে। ঐ লাল কুঠি পর্তুগীজদের নির্মিত বাস ভবন। রাজা ধরম বকস খাঁ ও পর্তুগীজ গভর্ণর মহোদয় প্রায় এক সঙ্গে বসতেন খেলাধুলা করতেন ও গল্প শুভব করতেন। একদিন এভাবে উভয়ে আমোদ প্রমোদ করার সময় তাদের এক খেলা হল- তারা কেন একটা আজব খেলা খেলে দেখেন না? খেলাটা হল পর্তুগীজ গভর্ণর মহোদয়ের ছিল একটা বিরাট আরবীয় ঘোড়া এবং রাজা ধরম বকস খাঁ এর ছিল তার ধরে আনা পোষ্য হাতিটা। একদিন রাজা ও গভর্ণর এর মধ্যে বাজি হল যে ঘোড়া ও হাতির দৌড়ে যদি ঘোড়াটা জিতে ধরম বকস খাঁ এর রাজ্যে পর্তুগীজরা বিনা শুদ্ধ ব্যবসা করবেন, যদি হাতিটা জিতে ঐ লাল কুঠিটা ধরম বকস খাঁ পাবেন। দৌড় খেলায় সামান্যের জন্য হাতির জয় হয়। সেই থেকে লাল কুঠিটা ধরম বকস খাঁ এর দখলে এসে যায়। বৃটিশ সরকার ঐ ভবনটা অধিগ্রহণ করে রাজাকে ভাড়া দিতেন, পরে ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেন সরকার। আমি ঐ লাল কুঠির বা কমিশনার ভবনের প্রাক্তনে গিয়েছি, ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ ইং সনে বহুবার, কিন্তু ভিতরে ঢুকিনি। স্বনামধন্য রাজ বংশের লোক হেডম্যান ও বাজার চৌধুরী মি. চিরঞ্জীব রায় মহোদয় আমাকে বলেছেন যে, আমার বক্তব্য সঠিক হতে পারে? তিনি নিজে ঐ লাল কুঠিতে ভিতরে ঢুকেছেন। তিনিও লক্ষ্য করেছেন যে, চট্টগ্রামের কোন বিস্তিৎ এর সাথে ইহার নির্মাণ কৌশল মিল নেই। আসলে উহা পর্তুগীজ স্থাপত্যে তৈয়ারী হতে পারে। অন্য স্থানে এই ভবনটি আরাকান থেকে আগত তঞ্চঙ্গ্যারা নির্মাণ করে রাজাকে উপহার দেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। পূর্বোক্ত ঘটনা বাস্তব হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। তঞ্চঙ্গ্যারা এদেশে এসে কবে ভবন নির্মাণ করবে? এতে অনেক সময়ের প্রয়োজন (সূত্র- বাবার থেকে প্রাপ্ত জনশ্রুতি)।

(৪) জনশ্রুতি রাজা জব্বর খাঁ স্বজনের ষড়যন্ত্রে নিহত হলে নাবালক শিশু পুত্রকে নিয়ে রানী প্রেমা শিশুর নিরাপত্তার জন্য গোপনে রাজবাড়ী ত্যাগ করেন এবং দূরবর্তী এক মগ রোয়াজার বাড়ীতে ছদ্মবেশে পরিচয় না দিয়ে রোয়াজার চাকরানী বা ক্ষেত খামারের কাজে নিযুক্ত হন। এভাবে শিশুপুত্রকে বাঁচিয়ে রাখার ও বড় করার মানসে জীবনে দুঃখকে বরণ করে নেন। ধীরে ধীরে শিশুপুত্র ধরম বকস খাঁ বড় হতে থাকেন এবং কৈশোরে পা দেন। ইতিমধ্যে দেশে বাড়ীতে খবর হল যে, রাজবাড়ীতে নতুন রাজার রাজ্যাভিষেক এর আয়োজন করা হয়েছে। রাজ সিংহাসন বসিয়ে সভা মন্ডপ তৈয়ার করা হয়েছে, প্রতিদিন সকাল বিকাল জয়ধ্বনি ও ঢোল ঢোলক বাজিয়ে সভা মঞ্চ গরম ও মাতিয়ে রাখা হয়েছে। এভাবে ৭দিন পর্যন্ত সভামঞ্চ করা হবে।

সাত দিনের মধ্যেও কোন দেব-দূত প্রেরিত রাজা না আসলে অমাত্যের মধ্যে একজনকে রাজা অভিষিক্ত করা হবে। এদিকে কিশোর ধরম বকস খাঁও খবরটা শুনে রাজ সভা দেখার জন্য উৎসুক হন কিন্তু তার মাতা তাকে কোথাও যেতে দেবেন না যদি তাকে চিনে ফেলে, মেরে ফেলবে। শেষদিন ধরম বকস খাঁ মাকে ফাঁকি দিয়ে বিকাল বেলা বেরিয়ে পড়েন রাজসভা দেখার জন্য। কোন দিন কোথাও যাননি পথ-ঘাট কিছুই চিনেন না। অগত্যা রাজসভার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে যান। অনেকদূরে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলেন, কোন দিকে যাবেন দিশা পাচ্ছেন না, এমন সময় ঘোড়ার পিঠে চড়া এক লোক হাতে একটা কিসের পুটলি নিয়ে তার সম্মুখে এসে হাজির। তাকে ঐ লোক জিজ্ঞেস করেন, ভাই কোথায় যাবেন? ধরম বকস খাঁ মনে মনে ভাবেন এই বেটা রাস্তা চিনে নাকি? তিনি লোকটিকে রাজসভায় যাওয়ার কথা বলেন। ঐ লোকটাও একই পথের পথিক বলে জানান এবং এক সঙ্গে যাওয়ার প্রস্তাব দেন। কতক্ষণে পায়ে হাঁটার পর ঐ লোকটা প্রস্তাব করার কথা বলে জঙ্গলে ঢুকে যায়। ফিরে আসার খবর নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন লোকটি আসতেছে না, তখন ধরম বকস খাঁ ঐ লোকটি রেখে যাওয়া পুটলিটি খুলে দেখেন উহাতে রাজকীয় পোষাক রয়েছে। তখনই তার একটু খেয়াল হল যে দেব-দূত তাকে রাজা হওয়ার জন্য এই পোষাক প্রেরণ করেছেন? তিনি ঐ পোষাক পরিধান করে 'সত্যক্রিয়া করেন হে ভগবান, হে দেবদূত যদি এই পোষাক আমার জন্য এসে থাকে, আমি যেন সেই রাজসভা মঞ্চে গিয়ে হাজির হই। এ বলে তিনি সেই পোষাক পরিধান করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসেন। ঘোড়া এক দৌড়ে খানিকক্ষণ সময়ের মধ্যে তাকে রাজানগরে রাজবাড়ীর সভামঞ্চে হাজির হয়। অমাত্যগণ, প্রজাবৃন্দ রাজাকে দূর থেকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে আসতে দেখে আগ বাড়িয়ে সভা মঞ্চে নিয়ে আসেন এবং যথারীতিতে ধরম বকস খাঁকে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। পরদিন খবরাখবরে জানাজানি হয়ে দেখা গেল যে নতুন রাজা আর কেহ নয়, আঠার মাসের ধরম বকস খাঁকে তারা রাজ্যাভিষেক করেছেন। এভাবে ধরম বকস খাঁ রাজা হয়ে যান। (সূত্র বাবার থেকে প্রাপ্ত জনশ্রুতি)

এ পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকবৃন্দ শ্রী সতীশ চন্দ্র ঘোষ, রাজা ভুবন মোহন রায়, বাবু মাধব চন্দ্র চাকমা, বাবু বিরাজ মোহন দেওয়ান, বাবু প্রানহরি তালুকদার মহোদয়ের রিপোর্ট ও তথ্যানুযায়ী রাজা ধরম বকস খাঁ সম্বন্ধে এত জনশ্রুতি, কিম্বদন্তি ও বিতর্কিত বিষয় থাকলেও তারা সকলেই ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরম বকস খাঁকে রাজ্যাভিষেক দেখিয়েছেন এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ হয়েছে বলে লিপিবদ্ধ করেছেন। শুধু বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা তার বইয়ে এ ধরম বকস খাঁকে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেক দেখিয়ে সকল চাকমাদেরকে ইতিহাস পাঠকদেরকে বিতর্কিত করে তুলেন এবং নিজেও মহা ফাঁপরে পড়েছেন। পেন্টুলুনের কাপড় কোনদিকে মিল হচ্ছে না, পায়ের দিকেও না, কোমরের দিকেও না?

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে রাজা হরিশ্চন্দ্রের জন্ম (প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী)

১৮৪০ খৃষ্টাব্দে গোপীনাথ দেওয়ানের সাথে রাজকন্যা মেনকা/চিকনবির বিয়ে মেনে নিতে হয়। বিয়ের সময় মেনকার বয়স ন্যূনতম ১৩/১৪ বৎসর ধরতে হয়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে মেনকার জন্ম ধরতে হবে। তার মা হারিবির সাথে রাজার বিয়ে কমপক্ষে এক বৎসর আগে।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে হারিবির বিয়ে। তার আগে আটকবির সাথে রাজার বিয়ে। ন্যূনতম দুই বৎসর আগে।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আটকবির সাথে রাজার বিয়ে ন্যূনতম ৩ বৎসর আগে কালিন্দী রানীর সাথে রাজার বিয়ে (উভয়ে কিশোর)

১৮২০ খৃষ্টাব্দে কালিন্দী রানীর সাথে রাজার বিয়ে ধরতে হয় (আগেও হতে পারে)। তখন রাজার বয়স কত? যদি ১৬ বৎসর ধরা হয়।

১৮০৪ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরম বকস খাঁ এর জন্ম ধরতে হয় (১৭৯৬ খৃঃ)। বক্শিম বাবুর লিখা ও বই মতে ধরম বকস খাঁ এর রাজ্যাভিষেক বিয়ে ও জন্ম কোনটাই মিল করা যাচ্ছে না? এদিকে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজা জব্বর খাঁ এর মৃত্যুর পর ধরম বকস খাঁ ১৮ মাস্যা হলে ১৮১১+১ বৎসর = ১৮১২ খৃষ্টাব্দে তার জন্ম। সুতরাং ১৮১২+১৬ = ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেক। অথচ বক্শিম বাবু ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে রাজার রাজ্যাভিষেক ধার্য্য করেন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষেক হয়ে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যু হলে তার রাজত্বকাল দাঁড়ায় মাত্র ৫ বৎসর। ঐ সময়ে ৩ রানীকে বিয়ে করা, মেনকার জন্ম, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে মেনকাকে বিয়ে দেওয়া যায় না।

ফ্রান্সিস বুকানন ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে এপ্রিল/২৯শে এপ্রিল রাঙ্গামাটিতে চাকমা রাজার অস্থায়ী রাজবাড়ীতে রাজা, যুবরাজ ও রাজার ভাই জব্বর খাঁ সহ রাজ পরিবারের সদস্যবৃন্দের থাকার রাজবাড়ী দেখতে যান। সেই দিন রাজা টব্বর খাঁ বাড়ীতে ছিলেন না। যুবরাজ ও জব্বর খাঁ উপস্থিত থাকতে পারেন। টব্বর খাঁ নিঃসন্তান। সেই যুবরাজ কে? নিশ্চয় জব্বর খানের ছেলে ৪/৫ বৎসরের বালক ধরম বকস খাঁ হবেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে সেই বালক ধরম বকস খাঁ এর বয়স কত দাঁড়ায় ৪+৩ বৎসর টব্বর খানের রাজত্ব + ১১ বৎসর জব্বর খানের রাজত্ব ১৮ বৎসর অর্থাৎ তখন ধরম বকস খানের বয়স ১৮/১৯ বৎসর (ফ্রান্সিস বুকানন পৃষ্ঠা- ৯৯)।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে তার পিতার মৃত্যু সময় ধরম বকস খাঁ মায়ের পেটে থাকলে তার রাজ সিংহাসন দখল করার বা পাওয়ার কোন সুযোগ থাকার কথা নয়। তিনি কৈশোর পার হয়ে যৌবনে পদার্পণ করায় বৃটিশ সরকার তার পক্ষে ছিলেন এবং কিছু অমাত্যও তার পক্ষে ছিল। উভয়ের সহায়তায় তিনি প্রতিকূল অবস্থায় ও ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাজা হতে পেরেছেন। তার পিতৃব্য দোলপেটা ও অন্যান্য সুযোগ-সন্ধানীরা

রাজ সিংহাসন পেতে ব্যর্থ হয়ে যতসব গাল-মন্দ গল্প, জনশ্রুতি ও কিম্বদন্তি রচনা ও প্রচার করেছেন। পরবর্তীতে ১৮৬৬/৬৭ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন টি এইচ লুইন পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক হয়ে আসলে কালিন্দী রানী কর্তৃক লাঞ্চিত ও অপমানিত হলে তিনিও তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেন এবং কালিন্দী রানী ও রাজাদের নিন্দা গাল গল্প রচনা করে। সেই সময় রাজার পিতৃব্য দোলপেটাও জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা যায় এবং ঐ কাজে ইন্ধন যুগিয়েছেন বলে শুনা যায়।

চাকমা রাজাদের রাজত্ব কাল, লিখিত সন তারিখ বিভিন্ন অবস্থাতেই গণনা করা হয়েছে। অনেকের জন্মের সন অনেকের রাজ্যাভিষেক, অনেকের মৃত্যু সন দেওয়া হয়। তাই চাকমা রাজাদের ধারাবাহিক সঠিক ইতিহাস বা সন সমূহ নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। তবে ঘটনা সমূহের বিবরণ প্রায় সঠিক ভাবে বর্ণনা ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। চাকমা রাজাদের ধারাবাহিক ও সঠিক ইতিহাস উদ্ঘাটন করতে আরো গবেষণা করতে হবে। ইহার জন্য বুদ্ধিজীবী ও প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হল।

বৃটিশ সরকারের একান্ত সহায়তায় এবং নিজ পক্ষীয় আত্মীয় ও অমাত্যদের সাহায্যে রাজা ধরম বকস খাঁ ১৮১২ খৃষ্টাব্দে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে রাজ সিংহাসন দখল করতে সক্ষম হন। তিনি সিংহাসন আরোহণের কিছু কাল পরে একদা সামন্তাদি সমভিব্যবহারে মৃগয়ায় বের হন। মৃগয়ায় বহুদূর বন ও শিলাময় পথ অতিক্রম করে রাজা অতিশয় পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন এবং পথে স্থিত গুজাং চাকমার মোন-বাড়ীতে বিশ্রাম নিতে যান। সেখানে গুজাং চাকমা সজীব জুমে বীজ বপন করতেছিলেন আনুমানিক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে। তার কিশোরী কন্যা কালাবি চাকমা মৃনায় পায়ে বারিপূর্ণ করে রাজাকে শীতল জল পান করতে দেন। এতে দুই কিশোর এর চারি চক্ষু মিলন হল এবং কালাবি লজ্জায় লাল হয়ে উঠেন এবং লজ্জাবতী লতার মত আনত মুখে নিজেকে গুটিয়ে নেন। রাজা ধরম বকস খাঁ আচম্বিতে কালাবির প্রতি আকৃষ্ট হন। রাজা রাজ বাড়ীতে গিয়ে গুজাং চাকমাকে সপরিবারে রাজবাড়ীতে নিয়ে যান এবং গুজাং চাকমাকে তদবধি “দেওয়ান উপাধি” দিয়ে মহাসমারোহে কালাবিকে বিবাহ করে কালিন্দী রানী নাম ধারণ করান। কাটাছড়ি সাকিনে গুজাং চাকমার বাড়ী ছিল। রানী কালিন্দী রানীর একমাত্র পুত্র সন্তান জন্ম হয়ে সেই সন্তানটি মারা যায় এবং তৎপরবর্তী সময়ে আর কোন সন্তান হয়নি। তার কোন সন্তান হচ্ছে না দেখে রানী কালিন্দী রানী নিজেই তদীয় জ্ঞাতিভগ্নি আটকবিকে রাজার সাথে দ্বিতীয় বিবাহ করে দেন। এতেও দুই রানীর কোন সন্তান দেখা না দেওয়ায় রানী কালিন্দী জ্ঞাতি সর্দার দৌলত খাঁর কন্যা হারিবিকে ধরম বকস খাঁ এর সঙ্গে তৃতীয় বিবাহ করে দেন। এই তিনটা রানীকে রাজা ধরম বকস খাঁ বিবাহ করায় কুরাকুট্যা গোজার প্রতি সাতিশয় অনুগ্রহ করেন এবং কুরাকুট্যা গোজার

বাড়ীতে সমাজে যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। এই হারিবির গর্ভে রাজার একমাত্র কন্যা সম্ভান জন্মগ্রহণ করেন। রাজকন্যার নাম রাখা হয়েছিল মেনকা ওরফে চিকনবি।

রাজা ধরম বকস খাঁ সকলের নিকট মহারাজ বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সত্যই প্রতিভাবান ও সামর্থ্যবান রাজা ছিলেন। তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে প্রজা ও দেশের মঙ্গল ও উন্নতির দিকে মনোযোগ দেন। তিনি বৃটিশের মুখ রক্ষার জন্য সিংহাসন আরোহনের পর ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ২৭৫০/- টাকা জমায় ১০ বৎসরের জন্য বন্দোবস্তি স্থাপিত করেন এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অতিরিক্ত জমা হ্রাস করতঃ পুনরায় ২০০৫/- টাকা জমা স্থিরকৃত হয়। ধরম বকস খাঁ ঐ সময় অতিশয় বালক বা শিশু থাকলে সরকারের সাথে ঐ সম্পর্কগুলি স্থাপন করা সম্ভব হত না। চট্টগ্রামের রান্নুনিয়া রাজানগরেই তার রাজধানী বা বাসস্থান ছিল। তিনি রাজ্যমাটির নিকটস্থ ধর্মখীল নামে বিস্তীর্ণ সমভূমি আবাদ করেছিলেন। তিনি রান্নুনিয়া থেকে ১২ (বার) পরিবার বাঙ্গালী মুসলমান এনে বসবাসের ব্যবস্থা করেন এবং ঐ জমিগুলি চাষ আবাদের ব্যবস্থা করেন। তিনি পাহাড়ীদেরও হাল চাষে উৎসাহিত করেন।

রাজা ধরম বকস খাঁ হিন্দু ধর্মের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। তার সময়ে সীল মোহরে “জয় কালি সহায় ধরম বকস খাঁ” উৎকীর্ণ ছিল। তিনি কালী ভক্ত ও কালী পূজা করতেন।

তার সময়ে ১৮১৮/১৯ খৃষ্টাব্দে চাকমা জাতির অন্যতম শাখা প্রায় ৪০০০ তঞ্চঙ্গ্যা আরাকান থেকে চাকমা সমাজে ও রাজ্যে প্রবিশ্ট হওয়ার প্রার্থনা করেন। কথিত আছে, তারা প্রাক্তন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার ভবন (লাল কুঠির) টা নির্মাণ করে রাজাকে উপহার দেন। কোন অজ্ঞাত কারণে, রাজা তাদেরকে এদেশে বসবাস করার অনুমতি দেননি। ফলে তাদের অধিকাংশই আবার আরাকানে চলে যায়। রাজার অনুমতি না দেওয়ার কারণ অনেকটা বিতর্কিত :

(১) জনশ্রুতি চাকমা রাজা বৎসরে কর্ণফুলী নদীতে দুই/একবার মনুষ্য বলি দিতেন। একবার বলি দেওয়ার জন্য দুই জন তঞ্চঙ্গ্যা ছেলে চুরি করে আনা হয়। অনেক অনুসন্ধানের পর তাদের পিতা মাতারা অনুসন্ধান পান এবং রাজার কাছে আপত্তি করলে রাজা ছেলেগুলি ছেড়ে দেন। এতে বহু তঞ্চঙ্গ্যা পরিবার আরাকানে বা কল্লবাজার এলাকায় চলে যায়। চাকমা রাজার “জয়-কালী সহায় ধরম বকস খাঁ” উৎকীর্ণ উক্তি দ্বারা মনুষ্য বলি দেওয়ার কথা বিশ্বাস করা যায়।

(২) বাবু ঈশ্বর চন্দ্র তঞ্চঙ্গ্যা বি এ, মহোদয় ইহা অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে, রাজা তঞ্চঙ্গ্যাদের চাকমাদের মত সুযোগ সুবিধা না দেওয়ায় ও চাকমাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করতে অনুমতি না দেওয়ায় ৪০০০ জন এর মধ্যে প্রায় ২০০০ জন আরাকানে ফিরে যায় এবং অবশিষ্টরা রান্নুনিয়া রাজা নগর নিকটস্থ অঞ্চলে বারঘন্যা, ওয়াল্লা, রেইংখ্যং প্রভৃতি স্থানে বসতি করেন এবং এখনও তাদের বংশধররা রয়েছে।

(৩) বাবু সুগত চাকমা তার বই চাকমা পরিচিতিতে এ ভাবে বক্তব্য দেন- তঞ্চঙ্গ্যাদের ধন্যা গোজা ও লাপোস্যা গোজার মধ্যে এক সামাজিক আনুষ্ঠানিক কেন্দ্র করে এক বিবাদ উপস্থিত হয়। তারা উহা মিমাংসা করতে ব্যর্থ হয়ে রাজার কাছে বিচার চাহিলে রাজার বিচারে ধন্যা গোজারা জয়ী হয়। এতে লাপোস্যা গোজার লোকেরা অসন্তুষ্ট হয়ে ফা-ফ্র নামক নেতার প্ররোচনায় আরাকান বা উখিয়া টেকনাফ এলাকায় চলে যায়।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক ক্যাপ্টেন লুইনের মতে রাজা ১৮১৮/১৯ খৃষ্টাব্দে আরাকান থেকে আগত তঞ্চঙ্গ্যাদের লাপোস্যা গোজা ভুক্ত ফা-ফ্র কে তঞ্চঙ্গ্যা সম্প্রদায়ের নেতা স্বীকৃতি না দেওয়ায় প্রায় চার হাজার তঞ্চঙ্গ্যা আবার আরাকানে চলে যায়।

(৫) ঐতিহাসিক তথ্য মতে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব থেকে ইন্দো-বার্মা বিরোধ ও যুদ্ধ পরিস্থিতি দেখা দেওয়ায় এবং আরাকানে অত্যাচারিত হয়ে বহু চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা ও মগ চট্টগ্রাম ও চাকমা রাজ্যে অনুপ্রবেশ করতে থাকে। মনে হয়, এতবড় শক্তির সাথে চাকমা রাজার যুদ্ধ করার বা বিরোধে যাওয়া শক্তি ও সাহস না থাকায় রাজা অনুপ্রবেশকারী মগ বা তঞ্চঙ্গ্যাদের এদেশে অবস্থানের অনুমতি দেননি, তাই কিছু সংখ্যক তঞ্চঙ্গ্যা আবার আরাকানে ফিরে গেছে।

মহারাজ ধরম বকস খাঁ একজন সুশাসক ও প্রজা রঞ্জক রাজা ছিলেন। তার সময়ে রাজ্যে বহু জ্ঞানী গুণী লোক ছিলেন, রাজা তাদেরকে বড়ই ভাল বাসতেন। সম্মান ও মর্যাদা দিতেন। প্রয়োজনে তিনি তাদের সাথে মন্ত্রণা করতেন। তার রাজ সভা যেন বিক্রমাদিত্যের নব রত্ন সভা ও মোগল সম্রাট মহামতি আকবরের রাজ সভার মত অলংকৃত ছিল। তার সময়ে বৃটিশের সাথে আর কোন বিরোধ হয়নি। তিনি শান্তিতে রাজ্য শাসন করে যান। তার রাজ্যে জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের নাম ও গুণী ব্যক্তিদের এভাবে পাওয়া যায়

ক্রমঃ	গুণাবলী সমূহ	নাম সমূহ
১.	বৈদ্যের মধ্যে	গেদলা বৈদ্য
২.	বলীর মধ্যে	খজাল বলী
৩.	গল্পকার মধ্যে	সাপ্পোয়া চাকমা
৪.	সমরবিদ এর মধ্যে	নারাণ দেওয়ান
৫.	ব্যায়াম বীর এর মধ্যে	আবালা বলী
৬.	শিকারীর মধ্যে	রম্ভা পদ্মান
৭.	কূট নৈতিকের মধ্যে	ক্যজু রোয়াজা
৮.	দ্রুততম হাঁটার মধ্যে	ধাবারাম চাকমা
৯.	পেয়াদার মধ্যে	ফান্তোয়া আজম খাঁ
১০.	সুন্দরের মধ্যে	কমল চান চাকমা
১১.	শাস্ত্রবিদ এর মধ্যে	হার্বোয়া রাউলী
১২.	গণকের মধ্যে	অড়া চাকমা
১৩.	আধ্যাত্মিক জ্ঞানের মধ্যে	লেবান্সা ফকির
১৪.	পাণ্ডিত্যের মধ্যে	ধর্মমনি বাপ
১৫.	রাউল ও ধর্মবিদ এর মধ্যে	গুরু চরন ও সনাতন রাউলী

এদের দিয়ে রাজা ধরম বকস খাঁ যে কোন সমস্যা সমাধান দিতে পারতেন। এভাবে তিনি প্রায় ২০ বৎসর দেশ শাসন করে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

চাকমা রাজ্যে জাতীয় বীর সেনারা রাজা সের দৌলত খাঁ, রাজা জ্ঞান বকস খাঁ ও রাজা টক্বর খাঁ এর মৃত্যুর পর জাতি আর মাথা তুলতে পারেনি এবং পারবেও না। তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চাকমা জাতীয় সূর্য যেন অস্ত যায়। তারা শত্রুর কাছে কোন দিন মাথা নত করেননি। তাদের সাথে মহাবীর জাতীয় বীর রনু খাঁ দেওয়ানের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তারপর রাজা জক্বর খাঁ ও রাজা ধরম বকস খাঁ এর তিরোধান জাতির আকাশে যেন চন্দ্র ডুবে গেল। তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জাতি সকল সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলেন। ভবিষ্যতেও এই অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার কোন লক্ষণ নেই। পরে জাতির জীবনে আরো অন্ধকার, আরো ঘোর অন্ধকার নেমে আসে। এভাবে একটা যুগের, একটা রাজ বংশের মুলিমা গোজা ধাবানা গুন্ডির শাসন সমাপ্তি হল।

মুলিমা গোজা ধাবানা গুন্ডি চাকমা রাজা ও রাজত্ব কাল বিবরণ সমাপ্তি হল।

চাকমা রাজন্যবর্গের ব্যবহৃত প্রাচীন শিল মোহর
(রাজ-ভাণ্ডার ও “চাকমা জাতি” গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)



ইহা প্রাচীন রাজকীয় শিল মোহর ।
সম্ভবতঃ ইহা সিংধধ্বজা হইবে ।
পুরাকালে রাজারা হনুমান ধ্বজা,
সূর্য্যবান প্রভৃতি ছাপ ব্যবহার করিতেন ।



ফতে খাঁ ১৭১৫ খৃঃ



শুকদেব (১৭৫৭খৃঃ)
“শুকদেব সহায় ১২১৯”
রেখাঙ্কিত পাঠ করা দুর্লভ
“সহায় কিংবা রায়” এবং
১২১৯ কিংবা ১১১৯ বুঝা দায় ।



রাজা জানবন্স খাঁ ১৭৮২ খৃঃ



শ্রীশ্রী জয় কালী জয় নারায়ণ জম্বর খাঁ
১১৬৩ খৃঃ



জয়কালী সহায় ধর্মমবন্স খাঁ ১৮১২খৃঃ



রাণী কালিন্দী
১৮৪৪ খৃঃ

ঢাকমা দুই রাজবংশ

(ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গুণ্ডি ঢাকমা রাজা ও রাজত্বকাল)

২য় খন্ড

১ম সংস্করণ/২০১৪ খ্রিঃ

কুমুদ বিকাশ ঢাকমা

ভূমিকা

আধুনিক গণতান্ত্রিক যুগে এমন কি বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে একবিংশ শতাব্দী সূচনা কালেও পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্র শাসন তিন উপজাতীয় রাজা বা চীফ এর শাসন প্রচলিত রয়েছে। এ রাজারা কিভাবে দেশের শাসন করার অধিকার লাভ করলেন বা কে তাদেরকে রাজ্যরূপে স্বীকৃতি দিলেন অথবা তারা কিভাবে রাজগদীতে বসলেন ইহা শুধু বিদেশীদের কৌতূহল নয়, অনেক উপজাতি শিক্ষিত মহলের এমনকি বহু চাকমাদেরও অজানার বিষয়। উপরোক্ত বিষয়টি সঠিক ভাবে জানার জন্য আমার সংক্ষিপ্ত ভাবে চাকমা রাজ পরিবার বইটি রচনা ও সংকলন।

দেশী বিদেশী বহু ঐতিহাসিক চাকমা জাতির উপর অনেক গবেষণা, সংকলন ও ইতিহাস রচনা করেছেন কিন্তু নির্দিষ্ট চাকমা রাজ বংশের উপর কেহ ইতিহাস রচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই, যেভাবে ভারতের ইতিহাসে আমরা পাই গুপ্তবংশ, মৌর্য বংশ, পাল বংশ, সেন বংশ, তোগলক বংশ, বিলজি বংশ, মোগল বংশ ইত্যাদি। চাকমা জাতির ইতিহাসে বার্মা-আরাকান ত্যাগ করার পর ১৪১৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ২০০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমরা সাধারণতঃ দুইটি চাকমা রাজ বংশের হৃদিস পাই যাদের শাসন দীর্ঘতর ছিল (১) মুলিমা গঝা চাকমা রাজ বংশ (ধাবানা রাজা) ও (২) ওয়াংঝা গঝা চাকমা রাজ বংশ (রাজা হরিশ্চন্দ্র)। এই রাজ বংশগুলির ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা, সংকলন করা আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সঠিক তথ্য ইতিহাস পাওয়া খুবই দুর্ধর। তবু আমি অনেক শ্রম ও সময় ব্যয় করে চাকমা রাজ পরিবার নাম দিয়ে ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত ভাবে রচনা করে পাঠকবর্গ ও ইতিহাসবিদদের হাতে উপস্থাপন করলাম। এতে অনেক জানা-অজানা ঘটনা বাদ পড়ে থাকবে তা আমি নিশ্চিত তবু যদি পাঠকেরা পড়ে কিছু জানা অজানা জানেন, জানার বিষয়গুলি রোমন্থন করেন, আনন্দ বা বিরক্তি পান, আমার পরিশ্রম কিছুটা সার্থক হয়েছে মনে করবো।

পঞ্চম রাজা, রাজা দেবানীষ রায় এর আমলে ইতিহাসের চেয়ে বাংলাদেশের রাজনীতি বেশী আলোচনা করা হয়েছে বলে কেহ অভিযোগ করলে আমার বলার কিছু থাকবে না। বাঙ্গালী জাতি একটা বিরাট সাগর, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতি বা চাকমারা সেই সাগরের পাড়ে একটা নদী উপনদী মাত্র। নদী-উপনদীর কথা বর্ণনা করলে সাগরের কথা এসে যাবেই। নদী উপনদীর সাগর সঙ্গমে তার গতি সার্থক হয়।

এ বহি লিখা ও সংকলনের সময় এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এর নিকট আমি খুবই ঋণী ও কৃতজ্ঞ। তার “ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ” বইটা আমার খুবই সহায়ক হয়েছে। আমার ঘটনাবলি মনে থাকলেও তারিখ ও সনগুলি পাওয়া তারই অবদান। এ ছাড়া অনেক লেখক ও বই এর সহায়তা আমাকে নিতে হয়েছিল। এদের মধ্যে সতীশ চন্দ্র ঘোষ এর চাকমা জাতি(১৯০৯), বিরাজ মোহন বাবুর চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত/১৯৬৯, প্রাণহরি তালুকদার এর চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস/১৯৮১, বঙ্কিম বাবুর চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস/১৯৯৬, যামিনী রঞ্জন বাবুর “চাকমা দর্পন” বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ রইলাম। ভবিষ্যত প্রজন্ম ও যুব সমাজকে এ ব্যাপারে আরো গবেষণা ও সংকলন করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার দায়িত্ব দিয়ে এখানে আপাততঃ আমার বক্তব্য সমাপ্ত করলাম।

তারিখ : রাঙ্গামাটি

১লা জুন ২০১২ ইং।

ইতি,

লেখক

কুমুদ বিকাশ চাকমা

সূচিপত্র

ক্রঃ নং

বিষয়বস্তু

পৃষ্ঠা

: প্রথম অধ্যায় :

১. চাকমা গঝা গোষ্ঠীর পূর্ব কথা ১-২

: দ্বিতীয় অধ্যায় :

২. ওয়াংঝা গঝার চাকমা রাজ সিংহাসনে আরোহনের পটভূমি ৩-৭
৩. ওয়াংঝা গঝা কালা কাভারা গোষ্ঠী চাকমা রাজাদের রাজত্বকাল ৭

: তৃতীয় অধ্যায় :

৪. রাজা হরিশ্চন্দ্র ৮-১৪

: চতুর্থ অধ্যায় :

৫. রাজা ভুবন মোহন রায় ১৫-২২

: পঞ্চম অধ্যায় :

৬. রাজা নলিনাক্ষ রায় ২৩-২৮

: ষষ্ঠ অধ্যায় :

৭. রাজা ত্রিদিব রায় ২৯-৩৮

: সপ্তম অধ্যায় :

৮. রাজা দেবশীষ রায় ৩৯-৬৬

৯. ওয়াংঝা গঝা চাকমা রাজবংশের বিজয় বা বংশ তালিকা ৬৭-৭৬

১০. রাজ পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের তালিকা ৭৭

১১. লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত ৭৮-৮০

১২. সহায়ক গ্রন্থাবলী ৮১

চাকমা দুই রাজবংশ

(ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গুন্তি চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল)

প্রথম অধ্যায়

চাকমা গঝা-গোষ্ঠীর পূর্ব কথা

“বিজক” (চাকমা জনশ্রুতি ও বংশ পরম্পরা স্মরণকৃত তথ্য) এবং ঐতিহাসিক সূত্র মোতাবেক শাক্য বংশের একাংশ কোন কারণে ভারত ভূমি থেকে বিতাড়িত, স্থানান্তরিত বা রাজ্য জয় অভিযানে গিয়ে ধীরে ধীরে সুদূর অক্সাদেশ, রোসাজ বা আরাকান-বার্মায় (মায়ানমার) গিয়ে পৌঁছে এবং নিজ দেশে না ফিরে সেই বিজিত দেশে স্থায়ী ভাবে বসবাস ও রাজ্য শাসন করতে থাকেন। কিন্তু বিজিত দেশে গিয়ে বিদেশীদের দ্বারা শাক্যদের নানা ভাবে ভাষার তারতম্য হওয়ায় শ্যাকম্যাং/শাক, শেক বিভিন্নভাবে অপভ্রংশ হয়ে পুনরায় ভারতের পূর্বাংশে বাংলায় প্রবেশ করে শাংমা, চাংমা থেকে বর্তমানে ‘চাকমা’ নামটি পরিণত রূপ ধারণ করেছে। বার্মা-আরাকানে চাকমারা প্রায় ৫০০ শতাব্দিক বৎসর বসবাস ও রাজত্ব করার পর ঐতিহাসিক কারণে পতনের মুখে ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে চাকমা রাজা দলবল ও প্রজাবন্দ নিয়ে আলীকদম, টেকনাফ, উখিয়া প্রবেশ করেন বাংলা গৌড়ের নবাব মোহাম্মদ জালাল উদ্দীন এর সহায়তায়।

বার্মা আরাকানে অবস্থান কালে চাকমাদের গঝা গোষ্ঠীর শ্রেণী বিভাগ কিরূপ ছিল তাহা সঠিক ভাবে জানা না গেলেও চাকমা রাজা বাংলায় প্রবেশ করে সমগ্র প্রজাবন্দকে দলপতি ভিত্তিক ১২ (বার) “তালুক” (এলাকা) এ বিভক্ত করে দেশ রক্ষা, জাতিরক্ষা ও দেশ-প্রজা শাসনের ব্যবস্থা করেন। সম্ভবতঃ এই ১২ (বার) “তালুক” থেকে প্রথম ১২টি গঝা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে গঝা থেকে গোষ্ঠী বা উপ-গঝা সৃষ্টি হয়ে নতুন নতুন গঝা-গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৪০/৪২ টি গঝা ও ২৫০/৩০০ টি গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া গেছে। পর্যবেক্ষণে লক্ষ্য করা গেছে যে, চাকমারা আলীকদম রোয়াং (কল্পবাজার) এ বসবাসকালীন সময়ে অধিকাংশ গঝার নামকরণ করা হয়। সাধারণতঃ কোন স্থানের নাম, নদীর নাম, এলাকার নাম, বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম, ঘটনাকে কেন্দ্র করে গঝার নামকরণ করা হয়েছে। যেমন, তৈনছড়ি থেকে তন্যাগোজা, লামা থেকে লার্মা গঝা, ফাস্যাখালি থেকে ফাকসা গঝা, কুঞ্জ ধামাই থেকে ধামাই গঝা, খিয়াং উপজাতীয় বৈদ্যকে পরাজয় করায় খিয়াং জয় থেকে খিয়াংজি গঝা, কাখেই রাজকীয় উপাধি থেকে কাখেই গঝা সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা যায়।

এইভাবে শুনাই ওয়াংঝা (ওয়াংঝা গঝার আদিপুরুষ) থেকে ওয়াংঝা বা বংসা গঝার উৎপত্তি হয়। এই গঝার রনু খাঁ দেওয়ান (জাতীয় মহাবীর) ও ঈশান চন্দ্র দেওয়ান (পূর্ব-রাজা) বিশিষ্ট ব্যক্তি। কালে রনু খাঁ দেওয়ান এর গোষ্ঠী বা লাইন থেকে বর্তমান চাকমা রাজ বংশ উৎপত্তি বা চাকমা রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন। ওয়াংঝা/বংসা গঝার বংশ তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হলো :

১ম পুরুষ শুনাই ওয়াংঝা (ওয়াংঝা গঝার আদি পুরুষ)



২য় পুরুষ (১) কবা (২) শুজা



৩য় পুরুষ (১) বুড়া ওয়াংঝা



৪র্থ পুরুষ (১) তলা পাথর (২) গাবুর ওয়াংঝা



৫ম পুরুষ (১) বুন্দার খাঁ (২) রনু খাঁ দেওয়ান (তিনি দেওয়ান উপাধি পান ও জাতীয় মহাবীর, চাকমা রাজা সের দৌলত খাঁর জামাই, মন্ত্রী ও সেনাপতি)

মৃত্যু- ১৭৯৫ ইং



৬ষ্ঠ পুরুষ (১) চন্দন খাঁ দেওয়ান



(২) রতুন খাঁ দেওয়ান
স্ত্রী পত্যমনি (রাজকন্যা)



৭ম পুরুষ (১) মদ্রান খাঁ (২) বদ্রান খাঁ (৩) বদ্রাল খাঁ



(১) লবন খাঁ দেওয়ান
স্ত্রী ভেল্লুয়া বিবি দেওয়ান



৮ম পুরুষ (১) গোপী নাথ দেওয়ান, কাঙাই
(২) হরিনাথ দেওয়ান কাইন্দ্যা

(১) ঈশান চন্দ্র দেওয়ান
(পূর্ব-রাজা)



৯ম পুরুষ (১) জনাজয় (২) ইন্দ্রজয় (৩) শকুন্তলা (৪) পবনতলা (৫) নয়ন তারা



(৬) রসুনতলা, স্বামী- গৌরমনি

১ম স্ত্রী উমেশ্বরী

২য় স্ত্রী ইন্দ্রানী



১০ম পুরুষ (১) মন চন্দ্র (২) সরসু বালা (৩) আনন্দ মোহন (৪) রাজ মোহন

১ম স্ত্রী গর্ভে (৫) অবনী রঞ্জন (৬) সরসী বালা, স্বামী- রমনী মোহন রায়

২য় স্ত্রী গর্ভে (৭) কিরণ শশী (৮) বিমল শশী (৯) প্রমোদ বজ্জন (১০) জ্যোতির্ময়ী

(১১) স্নেহময়ী (১২) কনক বরণ (১৩) প্রবোধ চন্দ্র (১৪) যমুনা দেওয়ান,
স্বামী হীরলাল দেওয়ান

দ্বিতীয় অধ্যায়

ওয়াংঝা গঝার চাকমা রাজ সিংহাসনে আরোহনের পটভূমি

ইতিহাসের পাতা উন্টালে দেখা যায়, কোন রাজ বংশ চিরস্থায়ী রাজত্ব করে যেতে পারেন না। কোন রাজ বংশ কয়েক পুরুষ বা কোন রাজ বংশ কয়েকশ বৎসর পর্য্যন্ত একাদিক্রমে রাজত্ব করতে দেখা যায়। উপমহাদেশে সেইরূপ গুপ্ত বংশ, মৌর্য বংশ, নন্দবংশ এবং মুসলমান আমলে তোগলক বংশ, খিলজি বংশ, সৈয়দ বংশ এবং মোগল বংশ বেশ দীর্ঘদিন ধরে ভারত শাসন করেছিলেন। চাকমা রাজ্যেও মুন্সিমা টংসা (রাজ-জামাতা, মন্ত্রী ও সেনাপতি) এর অধস্তন পুরুষ রাজা ধাবানা (যারা কালে মুন্সিমা গঝা নামে পরিচিত হয়ে পড়েন) থেকে মহারাজ ধরম বকস খাঁ পর্য্যন্ত ১৪ (চৌদ্দ) জন রাজা প্রায় দুই শতাধিক বৎসর একাধিকক্রমে রাজত্ব করেন। তারপর মুন্সিমা গঝা থেকে ওয়াংঝা গঝায় চাকমা রাজ সিংহাসন হাত বদল হয়ে যায়। এই হাত বদলের ঘটনা ঘটেতে ইতিহাসে ও চাকমা রাজ্যে অনেক ঘটনা ঘটে যায়। ১৭৫৭ ইং সনে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লাহ এর পরাজয় ও পতনের পর বাংলা উড়িয়া ও বিহার সহ সারা ভারত ধীরে ধীরে বৃটিশের হাতে চলে যায় এবং ১৭৬১ ইং খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নায়েব নবাব মীর কাশিম আলী খাঁ এর আমাকে রেজা খানের হাত থেকে হেনরী ভেরেলষ্ট চট্টগ্রাম প্রদেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করলে চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল চাকমা রাজ্যটির কর্তৃত্বও বেনিয়াদের হাতে চলে যায়। সুচতুর বৃটিশ শাসক দল সরাসরি চাকমা রাজ্যটির উপর আধিপত্য করেননি এবং মোগলের সাথে পূর্ব চুক্তি মোতাবেক দেয় কার্পাস পেলেই খুশী থাকেন। সময়ে চাকমা রাজা নিজ সময় শক্তি বলে রাজ্য রক্ষা ও শাসন করতেন। শুধু মাত্র মোগলের চুক্তি মোতাবেক, দেয় কার্পাস, দিয়ে আধিপত্যটি মেনে নিয়েছেন নিজ রাজ্য নিজেই শাসন ও রক্ষা করতেন। পলাশী যুদ্ধের পর সুযোগ বুঝে চাকমা রাজা কর কার্পাস দেওয়া বন্ধ করে দেন। ইহাতে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হলেও ভারতের উত্তর পশ্চিম ভাগে ঘোরতর যুদ্ধ অবস্থা লক্ষ্য করে চাকমা রাজ্যটির উপর কোন পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত রইলেন। এভাবে চাকমা রাজা ১৭৭৬ ইং পর্য্যন্ত প্রায় স্বাধীনভাবে নিরিবিলি রাজত্ব করতে থাকেন। প্রায় ১৯/২০ বৎসর চাকমা রাজা কোন কর বা কার্পাস না দেওয়ায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ও চট্টগ্রামের শাসন কর্তা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেন এবং ক্যান্টেন লেন এর নেতৃত্বে ১৭৭৭ ইং সনে এবং ১৭৮০ ইং সনে ক্যান্টেন ও টর্মার এর নেতৃত্বে বৃটিশ বাহিনী প্রেরণ করে চাকমা রাজ্য আক্রমণ করেন। রাঙ্গুনিয়ার ইচ্ছাখালি নদীর কিছু দূরে বেতাগী পোমরা নিকটস্থ কিল্লামরং নামক স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। উভয় যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনী শোষণীয় ভাবে পরাজিত, বিপর্যস্ত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। চাকমা রাজার পক্ষে সেনাধ্যক্ষ হয়ে নেতৃত্ব দেন সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ান ও রাজা সের দৌলত খাঁ এইভাবে বার বার বৃটিশ বাহিনী পরাজয় বরণ করায় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ আর সরাসরি যুদ্ধ

করতে সাহস করলেন না। বৃটিশ কর্তৃপক্ষ এবার কূটনৈতিক চাল ও ষড়যন্ত্রের উপায় কৌশল আরম্ভ করলেন। যুগে যুগে “বিভীষণ” ও “মিরজাফরের” অভাব হয় না। ১৭৮৫ ইং সনে এক রিয়াং-ত্রিপুরা সর্দার রামমনি দোভাষীর পুত্র জয়মনি দোভাষী প্রচুর উৎকর্ষ গ্রহণ করে স্থলপথে গোপন রাস্তা দেখিয়ে দেন এবং চাকমা রাজার রাজধানী ‘সুখ বিলাস’ আক্রমণ করার পথ বাতলিয়ে দেন। তখন চাকমা রাজা ছিলেন মহারাজ জ্ঞান বকস খাঁ। তিনি আগাম খবর পেয়ে রাজ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে রাজানগর পলাইয়া যান। বৃটিশ বাহিনী রাজ প্রাসাদ রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহ লুণ্ঠন করে চট্টগ্রামে ফিরে যান এবং দুর্গম স্থান রাজা নগর আক্রমণ করার সাহস করেননি। রাজা শত্রুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নেন এবং বিভিন্ন সুবিধামত স্থানে প্রতিরোধ ও দুর্গ নির্মাণ করে সৈন্য সংগ্রহের আরম্ভ করে দেন। এদিকে রাজা রাজধানী থেকে দূরে এভাবে ঘুরে ফিরে থাকায় প্রজাবৃন্দ শত্রু বাহিনীর পুনঃ সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে অস্থির হয়ে পড়ে, দেশের ভিতর বিভিন্ন স্থানে স্থানান্তর হতে থাকে। চাষ-আবাদ প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এইভাবে প্রায় দুই বৎসর কেটে যায়। রাজাও ছদ্মবেশে ঘুরে ফিরে থাকেন আক্রমণ ও বন্দী হওয়ার ভয়ে। এক সময় গুজব রটল যে, বৃটিশ বাহিনী আবার চাকমা রাজ্য আক্রমণ করে বসেছে এবং সৈন্য আগাইয়া আসতেছে। সেই সময় এক গর্ভবতী সন্তান সম্ভাবা মেয়ে দৌড়ে পলাইয়া যেতে আছাড় খেয়ে পড়ে যান এবং কাঁদতে থাকেন আড়ালী রাজার দেশ লাগ নপেদুং, চেদাম ছাড়া রাজা লাগ নপেদুং, রাজা মরের কিয়া, নাতদি ন মরিনেই, এবং অঝরে কাঁদতে থাকেন। সেই সময় রাজা ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত ছিলেন। প্রজাদের এই দুঃখ দেখে রাজা নিজেও কেঁদেছিলেন এবং নীরবে সেই স্থান ত্যাগ করলেন। তারপর রাজা সভা পরিষদ, মন্ত্রী, সেনাপতি ও দলপতিদের ডেকে এক গোপন সভা ও পরামর্শ করেন। বিশদ আলোচনান্তে সর্ব সম্মতিক্রমে পূর্ব উত্তরসূরীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে তদানিস্তান গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস এর কাছে আত্ম সমর্পণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং উপটোকন সহ রাজা নিজে কলকাতায় বড় লাটের সঙ্গে দেখা করেন ১৭৮৭ ইং সনে। সেনাপতি ও মন্ত্রী রনু খাঁ দেওয়ান রাজা ও পরিষদ এর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি এবং প্রতিবাদ করেন কিন্তু সভায় তার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য হয়। বড়-লাট লর্ড কর্নওয়ালিস চাকমা রাজার এই সিদ্ধান্ত ও আত্মসমর্পণে খুশী হয়ে অনুমোদন করেন এবং রাজার সকল অপরাধ ক্ষমাসহ ২য় কার্পাস চুক্তি ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজা সের মুস্তা খাঁ আমলে সম্পাদিত চুক্তিতে অনুমোদিত চাকমা রাজ্যের সীমা বরাবর উত্তরে-ফেনী নদী ও ত্রিপুরা রাজ্য দক্ষিণে শংখ নদীর মধ্যবর্তী স্থান পূর্বে লুসাই হিলের তৈজং পর্বত মালা, পশ্চিমে নিজামপুর রোড মিরসরাই-সীতাকুন্ড এর সীমা স্থান ও দেশ চাকমা রাজ্য বলে স্বীকৃতি দেন ও রাজ্যে পুনঃ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পর চাকমা রাজার সহিত বৃটিশ সরকারের আর কোন যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ১৭৮৬ ইং সনের শেষের দিকে লর্ড ওয়ারেন হেস্টিং বদলি হলে লর্ড কর্নওয়ালিস যোগদান করেন।

রাজা জান বকস খাঁ খুব সুচতুর, দক্ষ রাজা ছিলেন। প্রজারা তাকে মহারাজ বলে সম্বোধন করতেন। তার চার ছেলে (১) টব্বর খাঁ (২) জব্বর খাঁ (৩) দোলপেদা ও (৪) ছলা জব্বর। ১৭৯৮ ইং সনে রাজা জান বকস খাঁর মৃত্যু হলে তার জ্যেষ্ঠ পুত্র টব্বর খাঁ সিংহাসনে আরোহন করেন। টব্বর খাঁ নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮০১ ইং সালে টব্বর খাঁর মৃত্যু হলে ২য় রাজপুত্র জব্বর খাঁ সিংহাসনে আরোহন করেন। জব্বর খাঁ আমল থেকে চাকমা রাজবাড়ীতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়। ফলশ্রুতিতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাজা জব্বর খাঁ রাজ বাড়ীতে আততায়ীর হস্তে নিহত হন। রাজবাড়ীতে হাহাকার পড়ে যায়। রাজ গদীতে শূন্য পদে কে বসবেন? চারিদিকে ভয় ভয়, আতংক ভয়, রাজবাড়ীতে রাজা খুন। অনেকের অনুমান দোলপেদা বা ছলা জব্বরের ষড়যন্ত্রে রাজা জব্বর খাঁ নিহত হয়েছেন। তখন রাজ পুত্র ধরম বকস খাঁ কৈশোরে পা দিয়েছেন। অনেক বাদানুবাদ ঝগড়া ও আলোচনান্তে বৃটিশ সরকারের সহায়তায় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরম বকস খাঁ রাজ সিংহাসনে আরোহন করেন এবং দক্ষতার সহিত রাজ্য শাসন করেন। তার ৩ (তিন) রানী ছিলেন। প্রথম রানী কালিন্দী রানী গুজাং চাকমার মেয়ে। গুজাং চাকমাকে দেওয়ান উপাধি দেওয়া হয়। কালিন্দী রানী (জ্ঞাতী) ভগ্নি আটকবিকেও বিয়ে করেন রাজা ধরম বকস খাঁ। উভয় রানীর গর্ভে কোন সন্তান না থাকায় রাজা আবার দৌলত খাঁ এর কন্যা হারিবিকে বিয়ে করেন। তৃতীয় রানী হারিবির গর্ভে একমাত্র কন্যা মেনকা ওরফে চিকনবি জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে রাজা ধরম বকস খাঁ একমাত্র নাবালিকা কন্যা মেনকাকে রেখে পরলোক গমন করেন। ধরম বকস খাঁর মৃত্যুতে রাজ্যে আবার বিরাট গোলমাল, ষড়যন্ত্র দেখা দেয় কে রাজ সিংহাসনে বসবেন। বৃটিশ সরকার প্রথমতঃ রাজকন্যা মেনকাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনিত করে ৩য় রানী হারিবিকে অভিভাবক রূপে রাজ্যভার দেন। ইহাতে ১ম রানী কালিন্দী রানী ঘোরতর আপত্তি করেন। কিছু সাব্যস্ত না হওয়ায় সরকার রাজা ধরম বকস খাঁর স্বগোষ্ঠীয় সুখ লাল খাঁ দেওয়ান কে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করে রাজ্যভার প্রদান করা হয় ২৪২১ টাকা ১৩ আনা ১১ পাই জমা (খাজানা) দেওয়ার শর্তে। ইহাতে কোন সমস্যা সমাধান হল না। একদিন রাতে ইঠাং রাজ ম্যানেজার সুখ লাল খাঁ দেওয়ান নিজ বাড়ীতে অজ্ঞাত আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। ১৮৩৭ ইং সনে সরকার আবার রানী কালিন্দী রানীকে ২৫৮৩ টাকা দুই আনা জমা (খাজানা) দেওয়ার শর্তে ইজারা দেন। তখনও রাজ্য ও সম্পত্তির অধিকার নিয়ে রাজ বাড়ীতে ও রাজ্যে গোলমাল চলতেছিল। মহিয়সী রানী কালিন্দী রানীকে অবজ্ঞা করে এবং রানীর অজ্ঞাতসারে ৩য় রানী হারিবি ১৯৪০ ইং সনে রাজকন্যা মেনকার সহিত রনু খাঁ দেওয়ানের প্রপৌত্র গোপী নাথ দেওয়ানের সাথে বিয়ে দেন। তারপর রাজবাড়ী ছেড়ে দিয়ে জামাই ও রাজকন্যা সহ পৃথকভাবে সোনাইছড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এত গোলযোগের মধ্যেও রানী কালিন্দী রানী রাজা ধরম বকস খাঁর মৃত্যু ১৮৩২ ইং সনের পর থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাকমা রাজ্যটি শাসন করতে

থাকেন। পরিশেষে বৃটিশ সরকার সর্ব বিষয়ে বিবেচনা ও অনুভব করে দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৮৪৪ ইং সনে রানী কালিন্দী রানীকে মৃত স্বামীর সম্পত্তি ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতঃ সরকারী আদেশ প্রদান করেন। তারপর দেশে শান্তি ফিরে আসতে থাকে।

রানী কালিন্দী রানী একজন তেজস্বিনী দক্ষ প্রশাসক ও দয়ালু ছিলেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করে ৩য় রানী হারিবি এর যাবতীয় দোষ ত্রুটি ক্ষমা করেন এবং জামাই রাজকন্যা সহ সকলকে রাজা নগরে রাজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তিনি রাজবাড়ীতে সকলের ভরণ পোষণের সুব্যবস্থা করেন। তিনি রাজ্য সুশাসনের দিকে নজর দেন। রানী কালিন্দী রানীর আমলটি চাকমা রাজ্যের ও চাকমা জাতির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই আমলেই যত সব দুর্ঘটনা ও সুঘটনা ঘটে তাহা চাকমাদের ও চাকমা রাজ্যের ভবিষ্যতে বিরাট প্রভাব পড়ে। এই আমলে যাহা হারানো গিয়েছে তাহা আর জাতি ফেরৎ পায় নি। অতল সমুদ্রে ডুবে গেছে। এই চরম সন্ধিক্ষণে রাজ্য ও জাতিকে রক্ষা করার জন্য রাজা জান বকস খাঁ বা রাজা ধরম বকস খাঁ এর মত দক্ষ রাজা ও শাসকের প্রয়োজন ছিল। মেয়ে লোক বলে রানী কালিন্দী রানী কূটনৈতিক বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ কর্মকর্তাদের সাথে সামাল দিতে পারেন নি। ফলে, রানী কালিন্দী রানী দেশ ও জাতির জন্য এত চেষ্টা করেও দেশ ও জাতিকে রক্ষা করতে পারেন নি।

১৮৩২ ইং সন পর্যন্ত চাকমা রাজ্যের প্রতিপত্তি, মান ও সীমা অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার পরবর্তী সময়ে শাসকগণ জাতি দেশের মান রক্ষা করতে পারেননি। বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ শাসকদের কূটনৈতিক চালে চাকমা রাজ্য খান্ খান্ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। বৃটিশ সরকারের প্রথম কূটনৈতিক কৌশল হিসাবে সমগ্র পার্বত্য রাজ্য শাসন করার সুবিধার্থে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল নিয়ে প্রশাসনিক ইউনিট পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা ঘোষণা করলেন ১৮৬০ ইং সনে। এতেও বৃটিশ সরকারের স্বাদ ও ভয় গেল না। ১৮৭০ ইং সনে চাকমা রাজ্যটি আবার ত্রি-খন্ডে বিভক্ত করে ৩ (তিন) সার্কেলে ভাগ করেন। রানী কালিন্দী রানী উহার বিরুদ্ধে আপীল করেও ব্যর্থ হন। রানীর মৃত্যুর পর ১৮৮১ ইং সনে সার্কেল বিভক্তি অনুমোদন ও কার্য্যকরী করা হয়। এইভাবে পুরাতন চাকমা রাজ্যটি সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সরকার ধ্বংস করে দেন এবং সামান্য অংশটুকু চাকমা সার্কেল নাম দিয়ে প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখেন।

অনেক আশা নিরাশায় রানী কালিন্দী রানী জীবন অতিবাহিত করেন। বৃটিশ সরকারের সাথে আইনী যুদ্ধ করে সব যুদ্ধে পরাজয় বরণ করেন। ১৮৪১ ইং সনে গোপীনাথ দেওয়ান ও 'রাজ কন্যা' মেনকার গর্ভের ভাবী দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হয়। ১৮৬৮ ইং সনের ১২ই নভেম্বর হরিশ্চন্দ্রকে দৌহিত্র সূত্রে রানী কালিন্দী রানী উত্তরাধিকারী হিসাবে বৃটিশ সরকার মনোনীত করেন। এভাবে রানী কালিন্দীর সামান্য আশা পূরণ হয় এবং ১৮৭৩ ইং খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার রাজা হরিশ্চন্দ্রকে আনুষ্ঠানিক

ভাবে চাকমা রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন। রানী কালিন্দী রানীর নাতি হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক নিজ চক্ষে না দেখে ১৮৭৪ ইং সনে পরলোক গমন করেন বলে জানা যায়। এইভাবে মুলিমা গঝা এর শাসন সমাপ্তি হয়ে ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর চাকমা রাজবংশের অভ্যুদয় ও রাজত্ব আরম্ভ হয় ১৮৭৩ ইং সনে। এ পর্যন্ত ৪ জন রাজার রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং ৫ম রাজার রাজত্ব চলতেছে (২০০২ ইং)।

ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠী চাকমা রাজাদের রাজত্বকাল

রাজাদের ক্রমঃ	রাজাদের নাম	রাজাদের আয়ুষ্কাল	রাজাদের রাজত্বকাল	রাজ্যাভিষেক	মৃত্যুবরণ	রাজধানী বা প্রধান কার্যালয়
প্রথম রাজা	রাজা হরিশ্চন্দ্র	১৮৪১- ১৮৮৫	১৮৭৩- ১৮৮৫	১৮৭৩ইং	২৩ জানুয়ারী ১৮৮৫ ইং	১ম রাজধানী রাজা নগর ২য় রাজধানী রাসামাটি।
দ্বিতীয় রাজা	রাজা ভুবন মোহন রায়	১৮৭৬- ১৯৩৪ ইং	১৮৯৭- ১৯৩৪ ইং	১৮৯৭ইং	১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ইং	রাসামাটি।
তৃতীয় রাজা	রাজা নলিনাক্ষ রায়	১৯০২- ১৯৫১	১৯৩৫- ১৯৫১	১৯৩৫ইং সনের ৭ই মার্চ	৭ই অক্টোবর ১৯৫১ ইং	রাসামাটি।
চতুর্থ রাজা	রাজা ত্রিদিব রায়	১৯৩৩-০	১৯৫৩- ১৯৭১	১৯৫৩ ইং ২রা মার্চ	২০১৩ ইং	পুরাতন রাসামাটি পরে কালিন্দীপুর
পঞ্চম রাজা	রাজা দেবানীষ রায়	১৯৫৯-০	১৯৭৭-০	২৫ নভেম্বর ১৯৭৭ ইং		কালিন্দীপুর (রাসামাটি)

তৃতীয় অধ্যায় ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠী চাকমা রাজা ও রাজত্বকাল (১৮৭৩-২০১৪)

১। রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৮৭৩-১৮৮৫)

রাজা হরিশ্চন্দ্র ওয়াংঝা গঝার কালা কাঙারা গোষ্ঠীর প্রথম রাজা। মুলিমা গঝার শেষ রাজা ধরম বকস খাঁ এর কোন পুত্র সন্তান না থাকায়, তিনি দৌহিত্র সূত্রে চাকমা রাজ সিংহাসন লাভ করেন। রাজা ধরম বকস খাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় স্ত্রী রানী কালিন্দী ও রানী আটকবি এর কোন সন্তান না থাকায় তৃতীয় স্ত্রী হারিবিকে বিবাহ করেন। ৩য় স্ত্রী হারিবি এর গর্ভে একমাত্র কন্যা সন্তান মেনকা ওরফে চিকনবি জন্মগ্রহণ করেন। মেনকা সাবালিকা হলে রানী হারিবি রনু খাঁ দেওয়ান (জাতীয় মহাবীর) এর প্রপৌত্র গোপীনাথ দেওয়ানের সঙ্গে বিয়ে দেন ১৮৪০ ইং সন। গোপীনাথ দেওয়ান ও মেনকার গর্ভে ১৮৪১ ইং সনে ভাবী রাজা হরিশ্চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৩২ ইং সনে রাজা ধরম বকস খাঁ পরলোক গমন করলে রাজ সিংহাসন দাবী নিয়ে রাজ্যে ও রাজবাড়ীতে বিরাট গোলযোগ হয়। বৃটিশ সরকার প্রথমতঃ রাজ কন্যা মেনকাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করিয়া কন্যার অভিভাবক রূপে ৩য় রানী হারিবিকে রাজ্যভার দেন। ইহাতে প্রথমা রানী কালিন্দী রানী ঘোর অসন্তোষ উত্থাপন করেন। ইহার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সরকার ধরম বকস খাঁর স্বগোষ্ঠীজ সুখ লাল খাঁ দেওয়ানকে ১৮৩৫ ইং খৃষ্টাব্দে রাজ্যের ম্যানেজার নিয়োগ করেন বার্ষিক ২৪২১ টাকা তের আনা এগার পাই জমা (খাজানা) দেওয়ার শর্তে। ইহাতেও কোন সমস্যার সমাধান হল না। একদিন রাতে হঠাৎ রাজ-ম্যানেজার সুখ লাল খাঁ দেওয়ানকে নিজ বাড়ীতে অজ্ঞাতনামা আততায়ীর হস্তে নিহত হলেন। ১৮৩৭ ইং সনে সরকার আবার রানী কালিন্দীকে ২৫৮৩ টাকা দুই আনা জমা (খাজানা) দেওয়ার শর্তে ইজারা দেন। তখনও রাজ্য ও সম্পত্তির অধিকার নিয়ে রাজ বাড়ীতে ও রাজ্যে গোলমাল চলতেছিল। এত গোলযোগের মধ্যেও প্রকৃতপক্ষে রানী কালিন্দী রানী রাজা ধরম বকস খাঁর মৃত্যু ১৮৩২ ইং সনের পর থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমগ্র চাকমা রাজ্যটি শাসন করতে থাকেন। পরিশেষে বৃটিশ সরকার সর্ব বিষয়ে অনুধাবন, অনুভব ও বিবেচনা করে দেশে শান্তি শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে ১৮৪৪ ইং সনের রানী কালিন্দী রানীকে মৃত স্বামীর যাবতীয় সম্পত্তি ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করতঃ সরকারী ফরমান জারি করেন। তারপর দেশে শান্তি ফিরে আসতে থাকে।

রানী কালিন্দী রানী একজন দয়ালু, তেজস্বিনী ও দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করে শতমত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ৩য় রানী হারিবি এর যাবতীয় দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দেন এবং সোনাইছড়ি থেকে জামাই রাজকন্যাসহ সকলকে রাজানগর রাজবাড়ীতে এনে ভরণ পোষণের সুব্যবস্থা করেন। তিনি এবার রাজ্য সুশাসনের দিকে নজর দেন। তিনি নবজাত নাতি ভাবী রাজা হরিশ্চন্দ্রের ভবিষ্যত রক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা করেন স্বাস্থ্য, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের আরো দুই বিমাতা ও কয়েকজন বৈমায়েয় ভাই বোন ছিল। প্রথম স্ত্রী রাজ কন্যা মেনকার মৃত্যুর পর গোপীনাথ দেওয়ান কালিন্দী রানীর ভাই-ঝি জয়মনি দেওয়ানের কন্যা কান্দরীকে ও আঙু গঝা চিকন খাঁ তালুকদারের কন্যা জানকীকে বিবাহ করেন। কান্দরীর গর্ভে উর্মিলা ও জানকীর গর্ভে হরচন্দ্র, নবচন্দ্র, ভগিরথ চন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। পরিশেষে রানী কালিন্দী রানীর দৌহিত্র রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং সময়ে লামা গঝার রতুন খাঁ ওরফে চুচ্যাং দেওয়ানের দুই কন্যা সৌরিন্দী ও মনোমোহিনী এর সহিত বিবাহ দেন। বৃটিশ সরকার এর পক্ষে লর্ড ইউলেক ব্রাউন ১৮৬৮ ইং সনের ১২ই নভেম্বর রাজা হরিশ্চন্দ্রকে দৌহিত্র সূত্রে রানী কালিন্দীর উত্তরাধিকার মনোনীত করেন। এতে রানী কালিন্দী রানীর এতদিনের আশা-ভরসা পূর্ণ হ'ল। রানী কালিন্দী দৌহিত্র হরিশ্চন্দ্রকে ১৮৭২ ইং সনে লুসাই অভিযানে প্রেরণ করেন ও ইংরেজগণকে সাহায্য করতে উৎসাহিত করেন। বৃটিশ সরকার রাজা হরিশ্চন্দ্রের লুসাই অভিযানে সন্তুষ্ট হয়ে “রায় বাহাদুর” উপাধি দেন এবং ১৫০০/- টাকার সোনার ঘড়ি ও চেইন উপহার দেন। ১ম রানী সৌরিন্দীর গর্ভে (১) রাজ কুমারী স্বর্ণময়ী রায় (২) রাজা ভুবন মোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন এবং কিশোরী মোহন, হিরন্ময়ী ও করুণাময়ী বাল্যকালে মারা যান। ২য় রানী মনোমোহিনীর গর্ভে একমাত্র কুমার রমনী মোহন রায় ১৮৮১ ইং সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭৩ ইং সনে রাজা হরিশ্চন্দ্র এর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয় এবং বৃটিশ সরকার ১৮৭৪ ইং হরিশ্চন্দ্রকে ‘রাজা’ উপাধি প্রদান করেন।

রাজা হরিশ্চন্দ্র স্বল্পদিন মাত্র প্রায় ১০ বৎসর রাজত্ব করেন ১৮৭৩ থেকে ১৮৮৪ ইং সন পর্য্যন্ত। তিনি অল্প বয়সে প্রায় ৪৪ (চৌচল্লিশ) বৎসর বয়সে ১৮৮৫ ইং সনে ২৩শে জানুয়ারী শুক্রবার ভোর ৮ ঘটিকায় রাজা নগরে রাজ বাড়ীতে পরলোক গমন করেন। তার মৃত্যুর পূর্বে শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি প্রায় ১ বৎসর রাজ কার্য চালাতে পারেননি। ঐ সময়ে গভর্নমেন্ট ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিলার নিযুক্ত করে রাজ্য শাসনের ব্যবস্থা করেন। কাউন্সিলারগণ (১) নীল চন্দ্র দেওয়ান (২) ঈশ্বর চন্দ্র বিশ্বাস (ঈশান চন্দ্র দেওয়ান নয় তিনি ১৮৩৩ ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন চাকমা জাতি সতিশ চন্দ্র ঘোষ) (৩) ত্রিলোচন দেওয়ান (৪) কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান ও (৫) রাজচন্দ্র দেওয়ান। এই কাউন্সিলের সভাপতি ছিলেন নীলচন্দ্র দেওয়ান। রাজা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ঐ কাউন্সিলারদের আবার দায়িত্ব দেওয়া হয় ১৮৮৬ ইং সনে। এইভাবে কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ানকে ম্যানেজার বা সভাপতি নিযুক্ত করা হয়। কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান ঐ পদে যুবরাজ ভুবন মোহনের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত (৬ই মে ১৮৯৭ ইং) বহাল ছিলেন। ইতিমধ্যে অন্যান্য সদস্যদের অব্যাহতি দেওয়া হয়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র অমায়িক। দয়ালু ও নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বাঙ্গালীপনা ও বাঙ্গালী পদ্ধতির লোক ছিলেন। তিনি হিন্দু বাঙ্গালীদের দ্বারা এত

প্রভাবান্বিত হয়ে পড়েন যে, নিজে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দু পর্ব ও হিন্দু ভোজনাদি পছন্দ করতেন। এবং তার নানী দিদি কালিন্দী রানীর মত বাঙ্গালীগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হয়ে বসবাস করতে ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তিনি বর্তমানে কাঙাই বাঁধে জলমগ্ন বালুখালী সিঙিনালা বিল আবাদ করতঃ বাঙ্গালী ও চাকমাদের (সকল উপজাতি) জমি চাষে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করেছিলেন। তার রাজত্ব কালে খুব বেশী ঘটনা না ঘটলেও তিনি চাকমা রাজ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে বহু ঘটনার নীরব সাক্ষী ও প্রত্যক্ষ দর্শী। তার জন্ম ১৮৪১ সনে এবং মৃত্যু ১৮৮৫ ইং সনে। এই ৪৪ বৎসর বয়সে কিছুটা তিনি সাবালক হলে ৮/১০ বৎসর বয়স থেকে ১৮৮৫ ইং সন পর্যন্ত সময়ের মহাকালের সাক্ষী বহু ঐতিহাসিক ঘটনার দর্শক। এই ঘটনাগুলি রাজা ধরম বকস খাঁ এর মৃত্যু পর ১৮৩২ ইং সনের পর পর ঘটতে থাকে।

রাজা ধরম বকস খাঁ আমলে পূর্তগীজ ও আরাকানি মগ দস্যুদের অত্যাচার ও লুণ্ঠন কিছুটা সীমিত হয়ে আসলেও সম্পূর্ণ দূর হয়নি। সময় ও সুযোগ পেলে পূর্তগীজ ও মগ দস্যুরা তখনও লুটপাট করতো। তারা সমতল ভূমি ও সমুদ্রের পাড় থেকে অত্যাচার করে আসতেন সময় সময় দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল কুকীরাও পর্বতমালার দিক থেকেও লুণ্ঠন করে আসতো সেন্দুজ, বনজুগী, খুমী, লুসাই-পাংখোয়া যাদের চাকমারা কুকী বলতো। উভয় দিক থেকে চাকমাদের সন্ত্রস্ত থাকতে হতো। রাজা ধরম বকস খাঁ এর মৃত্যুর পর এই কুকীদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করে। এইভাবে ১৮৪৯ ইং সনে চেন্সি খাগড়াছড়ি ১৮৫৯ ইং সনে বাইস মৌজা, ১৮৬০ ইং সনে চেন্সি বড়াদমে চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল কুকী অতর্কিতে আক্রমণ, লুণ্ঠন, নরহত্যা প্রভৃতি লৌমহর্ষক কাণ্ড সৃষ্টি করে। কুকীরা নীলচন্দ্র দেওয়ানের পিতা কান্দর খাঁ দেওয়ানকে বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে এবং নীলচন্দ্র দেওয়ান এর আত্মীয়া বদাচোগী (শোভাবতী দেওয়ান) কে ধরে নিয়ে যায়। হরিশ্চন্দ্র তখন প্রায় কৈশোর জীবন এবং ঐ সব ঘটনার নীরব সাক্ষী। অবশ্য এই ঘটনার পরেও কুকীদের আক্রমণ ও অত্যাচার থামে নাই। ১৮৬৪ ইং সনে সেন্দুজরা, ১৮৬৫-৬৬ ইং সনে বনজুগীরা, ১৮৬৭ ইং সনে বোম-খুমীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম, বোমাং সার্কেল, বান্দরবান মগ পাড়া, আক্রমণ করে। এই কুকী আক্রমণ ১৮৯০ ইং পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে ব্রিটিশ সরকার, ১৮৭২ ইং ১৮৮৯ইং। ১৮৯২ইং সনে লুসাই অভিযান চালাইয়া কুকী অত্যাচার চিরতরে স্তব্ধ করে দেয়।

রাজা হরিশ্চন্দ্র দেখেছেন, তার নানুদিদি রানী কালিন্দী রানী ১৮৫৬ থেকে ১৮৭৩ ইং পর্যন্ত চাকমা তথা বৌদ্ধদের মগ বড়ুয়া সহ সকল বৌদ্ধদের মূল বৌদ্ধ ধর্ম খের বাদী বৌদ্ধ ধর্ম শিক্ষা সুযোগার্থে আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরো তার রাজধানী রাজা নগরে সাদরে আমন্ত্রণ (ফাং) করে নিয়ে এসে মহাদান ধর্মানুষ্ঠান বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তক “বৌদ্ধ রঞ্জিকা” প্রকাশ ও প্রচার এবং বিলি করেন। তখন

চাকমারা প্রায় মহাযানী, সহজযানী বা তান্ত্রিকযানী বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারী ছিলেন। অবশ্য তখন বড়ুয়া বৌদ্ধরাও চাকমা বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু বা যাজক রুলীদের মত রাউলী দিয়ে বৌদ্ধ পূজা পার্বন করতেন। ১৮৬৬ ইং খৃষ্টাব্দে রানী কালিন্দী রানী পাহাড়তলী অনুকরণে আরাকান থেকে বিরাট বৌদ্ধ মূর্তির মডেল নিয়ে এনে রাজা নগরে শাক্য মনি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন যাহা সারা বাংলাদেশে বৃহত্তম বৌদ্ধ মূর্তি। তিনি বৌদ্ধ শাসন বিস্তার করণের লক্ষ্যে ১৮৬৯ ইং সনে রাজানগরে শাক্যমনি বৌদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বে ঘেং (চিং) বা ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা বাংলাদেশে স্মরণাতীতকালের সর্ব প্রথম ঘেং বা ভিক্ষু সীমা। এভাবে রানী কালিন্দী রানী এতদ্ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার, সংরক্ষণ ও প্রসারের চেষ্টা করেন। থেরোবাদী বৌদ্ধ ধর্মে এ দেশে রানী কালিন্দী রানীর অবদান চিরস্মরণীয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র রানী কালিন্দী রানীর এসব মহাপুণ্য অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ দর্শক।

১৮৫৭ ইং সনে পলাশীযুদ্ধের পর শতবর্ষ অতিক্রান্ত। এ সময় ভারত-পাক-বাংলা- উপ মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন মহামেঘ উঠে বৃটিশ ভারতে। এ মেঘ সারা ভারতে সরে পড়ে। ভারতবাসী প্রচার করলেন আশা করলেন, শত বর্ষের অধিক বৃটিশরা ভারত শাসন করতে পারবে না। দিল্লীর শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ (দ্বিতীয়) এর নেতৃত্বে অযোধ্যায় ঝাসী রানী, পেশোয়া নানা সাহেব, বন্দুল খন্ডের নবাব এর পরিচালনায় বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বৃটিশেরা এ যুদ্ধকে সিপাহী বিদ্রোহ নাম দিয়েছেন এবং বর্তমান ইতিহাসবিদরা এ যুদ্ধকে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নাম করণ করেছেন। ভারতের চারদিকে এ যুদ্ধ দাউ দাউ করে জুলে উঠে। ভারতের প্রায় দেশীয় রাজারা এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। বৃটিশ ভারত থর্ থর্ কাঁপতে থাকে। এবার বুঝি বৃটিশদের ভারত ছাড়তেই হবে। একমাত্র হায়দ্রাবাদের নিঝাম বাহাদুর পাঞ্জাবের শিখরা এবং পূর্ব ভারতে রানী কালিন্দী রানী এই সিপাহী বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেননি। যতসব সিপাহী ও বিদ্রোহী চট্টগ্রামের পার্বত্য রাজ্য চাকমা রাজ্যে প্রবেশ করেন সব বিদ্রোহীদের বন্দী করে রানী কালিন্দী বৃটিশের হাতে সমর্পণ করেন। বৃটিশ সরকার ইহাতে কালিন্দী রানীর উপর সমূহ সন্তুষ্ট হন এবং কর্ণফুলী নদীর উপর বার্ষিক জলকর ১১৪৩/- (এক হাজার একশত তেতাশ্লিশ) চিরদিনের জন্য মণ্ডকুফ করে দেন। বৃটিশ জাতি খুবই চতুর প্রশাসনে দক্ষ, যুদ্ধে ধীর স্থির, কয়েক মাস যুদ্ধ করে সিপাহীরা ও স্থানীয় যুদ্ধের নেতৃবৃন্দ দুর্বল হয়ে পড়েন এবং পশ্চাৎ অপসারণ ও পরাজিত হন। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ (২য়) কে বন্দী করা হয় এবং রেঙ্গুনে নির্বাসনে দেওয়া হয়। এভাবে সিপাহী বিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। সে সময় রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৫/১৬ বৎসরের যুবরাজ এবং ঐ ঘটনাবলীর নীরব সাক্ষী।

বৃটিশ বেনিয়ারা ১৭৫৭ ইং খৃষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লাহকে পরাজয় করে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার আধিপত্য ধীরে ধীরে কুক্ষীগত করতে থাকেন এবং কালে প্রায় ভারতভূমি দখল করে নেন। শুধু পূর্ব ভারতে চট্টগ্রামের চাকমা রাজ্যটি এবং উত্তর পশ্চিম দিগন্তে পেশোয়া, বেলুচিস্থান কিছু সংখ্যক আফগান সর্দার এখনও পুরা হাতের মুঠোয় আসে নাই বৃটিশ সরকারের। ১৮৩২ ইং সনে চট্টগ্রামের চাকমা রাজ্যটি ধরার সুযোগ এসে গেল। ১৮৩২ ইং সনে রাজা ধরম বকস খাঁ একমাত্র নাবালিকা কন্যা মেনকাকে রেখে স্বর্গারোহন করলেন দেশবাসী ও জাতিকে একা ক্ষুধার্ত বাঘের মুখে রেখে গিয়ে। রাজা ধরম বকস খাঁ পর্যন্ত সকল পূর্ববর্তী রাজাগণ সক্ষম ক্ষমতাবান ও শক্তিশালী রাজন্যবর্গ ছিলেন। তাই এতদিন বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যটির উপর থাবা মারতে দুঃসাহস করেন নি। একেতো রানী কালিন্দী রানী মেয়ে মানুষ। তদুপরি চাকমা রাজবাড়ীতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ঢুকে পড়েছে। সুবর্ণ সুযোগ এসে গেলো। বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যের উত্তর পূর্ব সীমান্তে বার বার কুকীদের আক্রমণ, অত্যাচার, চাকমা রাজ্যের বিরাট ভূ-খন্ড ও প্রশাসনের অসুবিধার অজুহাত দেখিয়ে প্রশাসনিক ইউনিক হিসাবে চাকমা রাজ্যের পশ্চিম অঞ্চল সীতাকুণ্ড, ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, বোয়ালখালি, পটিয়া ও সাতকানিয়া চট্টগ্রাম জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করেন এবং উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আমছড়ি, মার, দেমাগ্রী, তৈজং পর্বত মালা (পনছড়ি-কমলা নগর) আসামের (লুসাইহিল) সাথে জুড়ে দিয়ে শুধু কর্ণফুলী ভেলী-রাজামাটি, শংখ মাতামহুরী ভেলী-বান্দরবান ও ফেনী ভেলী-রামগড়কে নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন করা হল ১৮৬০ ইং সনে। অর্থাৎ চাকমা রাজ্যটি ত্রি-খণ্ডে বিভক্ত করা হল। রানী কালিন্দী রানী ইহার প্রতিবাদ ও আপীল করলেন। প্রতিবাদ ও আপীল সবই অগ্রাহ্য হল। তখন হরিশ্চন্দ্র প্রায় পূর্ণ যুবরাজ ও টুকটুকে ১৮/১৯ বৎসর যুবক। অস্ত্র ভাণ্ডারে অস্ত্র, সেনা নিবাসে সৈন্য থাকলে তিনি তখনই বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতেন। সে সময় চাকমা রাজা রানী কালিন্দী রানী দেশ শাসন করতেন নিধিরাম সর্দারের মত বৃটিশ সরকারের কৃপার উপর। রাজ প্রাসাদ পাহারা দেওয়ার মত কিছু সংখ্যক পুলিশ ছাড়া রানীর তখন কোন সৈন্য সামন্ত ছিল না। চাকমা সর্দার দলপতি এবং নেতৃবৃন্দও রানীর উপর খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন বলা যায় না। শুধু বৃটিশের ভয়ে সিংহাসন দাবী করতে সাহস পাচ্ছেন না। এইসব ঘটনাগুলি রাজা হরিশ্চন্দ্র প্রত্যক্ষ দর্শক এবং ভুক্তভোগী সাক্ষী। নীরবে নিভৃতে তার সহ্য করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না।

চাকমা রাজ্যটিকে ত্রি-খণ্ডে বিভক্ত করেও বৃটিশ সরকার ভরসা করতে পারলেন না। রানী কালিন্দী রানীর আমলেই ১৮৭০ সনে বৃটিশ সরকার (১) রাজামাটি অঞ্চল নিয়ে চাকমা সার্কেল (২) বান্দরবান অঞ্চল নিয়ে বোমাং সার্কেল (৩) রামগড় অঞ্চল নিয়ে মং সার্কেল গঠন করার প্রস্তাব করেন। ১৮৭০ ইং সনে রানী কালিন্দী রানী ইহার প্রতিবাদ ও আপীল করলেও উহা অগ্রাহ্য হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ১৮৮১ ইং

সনে উহা অনুমোদন ও কার্য্যকরী করা হয়। রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহার ফল প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগী। এভাবে চাকমা রাজ্যটি বার বার ৬ষ্ঠ খণ্ডে খণ্ডিত করে বৃটিশ সরকার নিশ্চিত হন। চাকমাদের আর ভবিষ্যতেও দাঁড়ানোর কোন সুযোগ রইল না।

১৮৬০ ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সৃষ্টি করে বৃটিশ সরকার চন্দ্রঘোনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা হেড কোয়ার্টার স্থাপন করা হয়। উপজাতীয় লোকদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার লক্ষ্যে বৃটিশ সরকার চন্দ্রঘোনায় একটা Elementary Education স্কুল স্থাপন করে চন্দ্রঘোনা বোর্ডিং স্কুল নামকরণ করা হয়। ঐ স্কুলে দুই ক্লাশ ছিল (১) চাকমা ক্লাশ- বাংলা ও ইংরেজী পড়ান হত এবং (২) বার্মিজ ক্লাশ- বার্মিজ ও ইংরেজী পড়ান হত। স্কুলটিতে ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হত এবং স্কুলটি অবৈতনিক ছিল। ৫০ জন ছাত্রের যাবতীয় খরচ খাওয়া-দাওয়া বই পত্র খরচ সরকার বহন করতেন। ১৮৬৯ ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার হেড কোয়ার্টার রাজ্যমাটিতে স্থানান্তর করা হয় এবং ঐ স্কুলটিও রাজ্যমাটিতে নিয়ে আসা হয়। স্কুলটি নতুন নামকরণ হয় রাজ্যমাটি সরকারী বোর্ডিং স্কুল। ১৮৭৩ ইং সনে স্কুলটিতে এম ই স্কুলে উন্নীত করা হয় অর্থাৎ ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এ সবই ঘটনা রাজা হরিশ্চন্দ্রের চোখের সামনে ঘটে যায়।

১৮৬০ ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রাম সৃষ্টি করার পর জেলা প্রশাসক নিয়োগ করা হয়। প্রথমতঃ জেলা প্রশাসকের নাম সুপারিনটেনডেন্ট নাম ছিল, পরে ডিপুটি কমিশনার নাম করণ করা হয়। ক্যান্টেন টমাস হার্বাট লুইন (এক কথা চাকমারা লুইন সাব বলেন) ১৮৬৬ থেকে ১৮৬৯ ইং সনে প্রথম মেয়াদ ও ১৮৭১ থেকে ১৮৭৪ ইং সনে দ্বিতীয় মেয়াদে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার প্রশাসক রূপে যোগদান ও অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লুইন সাহেব এই জেলায় অবস্থানের সময় চাকমা রাজ্যে ও জনগণের সঙ্গে বহু সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। লুইন সাহেব পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় যোগদানের পর পরই জেলার অনেক বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখেন। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসক, ঝানু কুটনৈতিক ছিলেন। তিনি বৃটিশ রাজত্ব সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে এই জেলায় অনেক সংস্কার পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তার প্রায় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়। তিনি চাকমা রাজ্যটিকে আরো ক্ষুদ্রাকারে আনার জন্য ১৮৭০ ইং সনে ৩ (তিন) সার্কেল (১) চাকমা সার্কেল (২) বোমাং সার্কেল (৩) গং সার্কেল প্রস্তাব বার বার পাঠিয়ে সাফল্যমণ্ডিত হন এবং উহা সাব্যস্ত হয় পরে উহা অনুমোদিত ও কার্য্যকরী হয়।

তিনি কুকীদের অত্যাচার ও আক্রমণ দমনের জন্য ১৮৭২ ইং সনে এক বিরাট লুসাই অভিযান প্রেরণ করেন। এই যুদ্ধে যুবরাজ হরিশ্চন্দ্রও সসৈন্যে অংশ গ্রহণ করেন এবং সরকারকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়। ইহার পর বহু বৎসর কুকীরা পার্বত্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করেনি।

মোগল আমলের ১৭২৬ খৃষ্টাব্দ হতে অর্থাৎ রাজা ফতে খাঁ সময় হতে কর্ণফুলী নদীর শুষ্ক চাকমা রাজা আদায় করতেন। ক্যাপ্টেন লুইন চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ মূলে ১৮৭৩ ইং সনে কালিন্দী রানী থেকে ঐ শুষ্ক আদায়ের ক্ষমতা কেড়ে নেন। ক্যাপ্টেন লুইন ১৮৬৯ ইং সনে প্রত্যেক জুমিয়া পরিবারের উপর ৪ (চার) টাকা জুম খাজানা প্রস্তাব করেন এবং ১৮৭৪ ইং সনে উহা রাজশ্বের ভিত্তিতে গৃহীত হয়।

১৮৮১ ইং সনে ১লা সেপ্টেম্বর তদানীন্তন সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিন সার্কেলে বিভক্ত করার কথা ঘোষণা ও অনুমোদন করলে রাজা হরিশ্চন্দ্রের সহিত পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশাসক মি. এল ফরবসের মনোমালিন্য হয়। ইহাতে রাজার বিরুদ্ধে লেঃ গভর্নর এর নিকট রিপোর্ট দেওয়া হলে জুম মহলের খাজানা ১২২৪ টাকা বার আনা বার পাই এর পরিবর্তে ৪৫৫৩/- টাকা খাজানা ধার্য করা হয়। প্রতিবাদও কোন ফল হয়নি। রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজত্বকালে ১৮৭৩ ইং সনের ২৩ শে জুলাই চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে চাকমা রাজার রাজধানী রাঙ্গুনিয়ার রাজানগর হতে রাঙ্গামাটিতে স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হয়। রাজধানী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাঙ্গুনিয়া রাউজান প্রভৃতি বসবাসরত চাকমা ও উপজাতীয়রা ঐ এলাকার ঘর-বাড়ী, জমি-জমা ত্যাগ করে রাঙ্গামাটি, চেঙ্গি ও ফেনীকুল স্থানান্তরিত হয়ে যান। ইহাতে পাহাড়ীদের সমূহ ক্ষতি হয়ে যায়। ঐ সকল এলাকার জমি চিরতরে হাত ছাড়া হয়ে যায়। চাকমা ও পাহাড়ীরা সাধারণতঃ রাজা বা দলপতি ভিত্তিক জনবসতি গড়ে তোলে। রাজা ও দলপতিরা চলে যাওয়ায় প্রজারা সকলে ঐ স্থান ত্যাগ করে যায়। বৃটিশ সরকার চট্টগ্রাম জেলায় জুমচাষ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেন। ফলে, একমাত্র জুম চাষের উপর নির্ভরশীল উপজাতিরা চট্টগ্রামের যাবতীয় সহায়, সম্বল, জমি-জমা ত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে যান।

চতুর্থ অধ্যায় ২। রাজা ভুবন মোহন রায় (১৮৮৭-১৯৩৪ ইং)

রাজা ভুবন মোহন রায় ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠী দ্বিতীয় রাজা এবং সম্ভবতঃ শ্রেষ্ঠ রাজাও বটে। রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রানী সৌরিন্দ্রী রায় এর গর্ভে ৬ই মে ১৮৭৬ ইং সনে রাজা ভুবন মোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেন। রাঙ্গুনিয়া রাজা নগর রাজ্য প্রাসাদে। রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলে চাকমা রাজ্যে সব চেয়ে শান্তিপূর্ণ ছিল। রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলে বৃটিশ জাতি ও গভর্নমেন্ট পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিরূপে আবির্ভাব হন। তখন ইংল্যান্ডের রাজা সমগ্র বৃটেনের রাজা এবং ভারতের সম্রাট। তার সাম্রাজ্যের সূর্য্য অস্ত যায় না। পৃথিবীর সকল মহাদেশে তার উপনিবেশ ছিল। সারা বিশ্বে যুদ্ধে বা কোন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত শক্তি প্রায় ছিল না। সারা ভারত উপমহাদেশ তার হাতে কুক্ষিগত ছিল। সামান্য চাকমা রাজ্যটি বৃটিশ সরকারকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করা সেতো আকাশ কুসুম স্বপ্ন। সে শক্তি গড়ে উঠার আগেই বৃটিশ সরকার ছলে বলে কৌশলে চাকমা রাজা ও রাজ্য থেকে সকল শক্তি হরণ করে নিয়ে নিয়েছেন। এখন চাকমা রাজ্যের সম্পূর্ণ বৃটিশ সরকারের দয়া ও কৃপার উপর বেঁচে থাকা ছাড়া উপায় নাই। অর্ধ-মৃত হরিণের ছানা, সিংহের খেলার বস্তুর মতন। বৃটিশ সরকার তার ফুলের বাগানটি চাকমা রাজ্য ও চাকমা রাজ্যের প্রতিপত্তি সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে খুবই তৎপর।

অকালে চাকমা রাজা হরিশ্চন্দ্র ২৩ শে জানুয়ারী ১৮৮৫ ইং সনে মৃত্যুবরণ করেন। যুবরাজ ভুবন মোহন রায় তখন মাত্র প্রায় ৮/৯ বৎসরের বালক। স্কুলে হাঁটাহাঁটি আরম্ভ করেছেন। এই যুবরাজ ও চাকমা রাজ্যটি বেঁচে রাখার জন্য বৃটিশ সরকার খুবই তৎপর। রাজ্যটি শাসন পরিচালনার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট কাউন্সিল গঠন করা হল ১৮৮৬ ইং সনে। নীলচন্দ্র দেওয়ান উহার সভাপতি। তারপর ঐ কাউন্সিলকে কিছু রদ বদল করে ১৮৮৭ ইং সনে কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ানকে রাজা ভুবন মোহন রায়ের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত সভাপতি পদে নিযুক্ত করা হল এবং অপরাপর সদস্যদের অব্যাহতি দেওয়া হল।

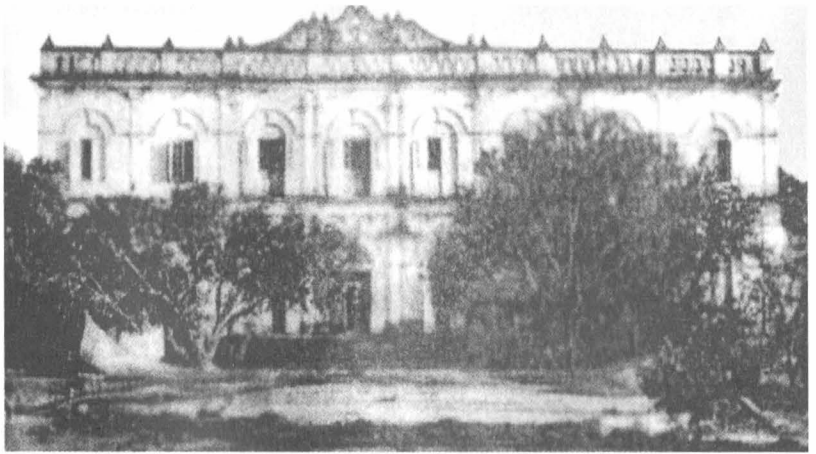
১৮৯০ ইং সনে রাজ্যমাটি সরকারী বোর্ডিং স্কুলকে (এমই) হাই স্কুলে উন্নীত করে স্কুলের নাম রাজ্যমাটি সরকারী ইংলিশ হাই স্কুল নামকরণ করা হল এবং খুবই যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক দিয়ে স্কুলটি পরিচালনার ব্যবস্থা করা হল। ১৮৯১ ইং সনের নবম শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তি আরম্ভ করা হয়। যুবরাজ ভুবন মোহন রায়কে ও রাজ্যমাটি সরকারী ইংলিশ হাই স্কুলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হল। ঐ প্রথম ব্যাচের ছেলেরা ১৮৯৩ ইং সনে সর্ব প্রথম রাজ্যমাটি সরকারী ইংলিশ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেন। ঐ ব্যাচে ৩ (তিন) জন উপজাতীয় ছেলে (১) যুবরাজ ভুবন মোহন

রায় (২) বাবু অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান ও (৩) কৈলাশ চন্দ্র শেল (কুকী) সর্ব প্রথম উপজাতীয় ছেলে এন্ট্রাল পাশ করেন। এই ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় উচ্চ শিক্ষার সূচনা। এই তিন উপজাতীয় ছেলে এফ. এ (ফার্স্ট আর্টস) পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন। এভাবে যুবরাজ ভুবন মোহন রায়ের শিক্ষার সমাপ্তি ঘটে।

তিনি ১৮৯৫ ইং সনের ১লা মার্চ কাটাছড়ি নিবাসী কালিন্দী রানীর ভাই জয়মনি দেওয়ানের ২য় পুত্র চন্দ্রকান্ত দেওয়ানের ২য় কন্যা দয়াময়ীকে ভুবন মোহন রায় বিবাহ করেন। এই জ্বরী গর্ভে রাজ কন্যা (১) বিজন বালা (২) কুমার নলিনাক্ষ (৩) কুমার বিরূপাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। ১৯০৫ ইং সনের ২০শে এপ্রিল রানী দয়াময়ীর মৃত্যু হলে গঙ্গামানিক দেওয়ানের ১ম কন্যা রমাময়ীকে ২য় জ্বরী বিবাহ করেন। ২য় জ্বরী গর্ভে (৪) সুষমা বালা (৫) নীহার বালা (৬) উৎপলাক্ষ (৭) কোকনদাক্ষ (৮) কুবলয়াক্ষ (৯) মঞ্জুলাক্ষ ও (১০) দিব্যাক্ষ জন্ম গ্রহণ করেন। যুবরাজ ভুবন মোহন রায়কে ১৮৯৭ ইং সনে ৭ই মে সহকারী কমিশনার মি. ডব্লিউ, এন, ডেলিডিন সি এম মহোদয় রাঙ্গামাটি রাজ্য প্রাসাদে মহা সমারোহে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। রাজ্যাভিষেকের সময় শরৎ চন্দ্র দেওয়ান (দারোগা) মানপত্র (অভিনন্দনপত্র) পাঠ করেন। ১৮৯৮ ইং সনের ১৬ই ডিসেম্বর লে. গভর্নর স্যার জন উডবরন বেলবেদিয়া প্রাসাদে ভুবন মোহন রায়কে রাজা উপাধি প্রদান করেন।

রাজা ভুবন মোহন রায় ১৯০৫ ইং সনে রাঙ্গামাটিতে চাকমা রাজার রাজ্য প্রাসাদটি ও একটা বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে রেংগুন থেকে গৌতমমনি বুদ্ধ মূর্তিটি স্থাপন করেন। তিনি রাজ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু রাজগুরু নিযুক্ত করে বৌদ্ধ ধর্ম উন্নয়ন ও চর্যার ক্ষেত্র তৈয়ার করেছেন। তার পিতা হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৮৯২ ইং সনে চাকমা সার্কুলকে ৯টা তালুকে বিভক্ত করে ৯জন তালুকদার নিযুক্ত করা হয়। নিম্নে তালুক গুলির বর্ণনা দেওয়া গেল :

তালুক নম্বর	তালুক এর নাম	তালুকদার নিযুক্ত
১নং	কাচালং	ইন্দ্রজয় দেওয়ান
২নং	চেঙ্গি	নীল চন্দ্র দেওয়ান
৩নং	মহাপ্রশ্ম	রাজ চন্দ্র দেওয়ান
৪নং	সত্বা	কমলাক্ষ চৌধুরী (মার্মা)
৫নং	ইছামতি	শরৎচন্দ্র রোয়াজা (মার্মা)
৬নং	রাঙ্গামাটি	কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান
৭নং	রাজা	ভুবন খাস রাজার নামে
৮নং	সুবলং	ত্রিলোচন দেওয়ান
৯নং	বরকল	কুমার রমনী মোহন রায়



উনিশ শতকের চাকমা রাজবাড়ী (রাঙ্গামাটি), (বর্তমানে কর্ণফুলী হ্রদে নিমজ্জিত)



বর্তমান রাজবাড়ীর নিকটস্থ বৌদ্ধ মন্দিরে আবস্থিত গৌতম মুনি ।

১৯০৫ সনে মাইয়নী রিজার্ভ ফরেস্ট খোলা হয়। এই অঞ্চলটি চাকমা সার্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে চাকমা সার্কেলের আয়তন যথেষ্ট বেড়ে যায়। বর্তমানে উক্ত অঞ্চল দীঘিনালা থানা নামে পরিচিত। তারই আমলে ১৯০০ ইং সনে সব তালুক বিলুপ্ত করে পার্বত্য চট্টগ্রাম যথেষ্ট সংখ্যক মৌজায় বিভক্ত করে প্রত্যেক মৌজায় হেডম্যান নিয়োগ করা হয়। রাজার সুপারিশ ক্রমে জেলা প্রশাসক হেডম্যান নিয়োগ দেন। প্রথমতঃ পার্বত্য চট্টগ্রামকে ১২৪টি মৌজায় বিভক্ত করা হয়। পরে চাকমা সার্কেলে ১৮৫টি মৌজা সৃষ্টি করা হয়। ১৯২৬ ইং সনে ভূমি জরিপ রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় ৩৭২টি মৌজা সৃষ্টি করা হয়েছিল। বর্তমানে ৩৮৯টি মৌজা আছে বলে জানা যায়।

রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলে চাকমারা তথা উপজাতীয় লোকেরা লিখা পড়া করার দিকে একটু নজর দেন। রাজা নিজেই সর্ব প্রথম উপজাতীয়দের মধ্যে এন্ট্রান্স যৌথভাবে তিনজন পাশ করে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। শিক্ষা রিপোর্টে দেখা যায়, ১৯০৯ ইং সন পর্যন্ত ১২ জন উপজাতীয় লোক এন্ট্রান্স পাশ করেন। উহার মধ্যে একজন এফ এ ও একজন এল, এম, এফ ডাক্তার পাশ করেন এবং রাজার জীবদশায় ১৯৩৪ ইং পর্যন্ত ৭২ জন চাকমা এন্ট্রান্স/মেট্রিক পাশ করেছেন। তৎমধ্যে ৮ জন গ্র্যাজুয়েট ৬ জন আই এ ২জন এল এম এফ ডাক্তার ১ জন এমবিবিএস ডাক্তার ১জন ডিপ্লোমা ভেটেরিনারী সার্জন পাশ করেছেন। তার জীবদশায় রাজ্যমাটি সরকারী ইংলিশ হাই স্কুল ছাড়া পার্বত্য চট্টগ্রামে ৪টি এম ই স্কুল ৩টি ইউ, পি স্কুল ও দুই ডজন খানেক প্রাথমিক স্কুল স্থাপিত হয়।

যামিনী রঞ্জন দেওয়ান ১৯১৩ ইং সনে সর্ব প্রথম বি এ পাশ করেন যিনি রাজকন্যা বিজন বালা রায়কে বিয়ে করেন তারিখ ২৩/১/১৯১৪ ইং সনে। ১৯০৯ ইং সনে ডা. মদন মোহন দেওয়ান সর্ব প্রথম এল এম এফ ও ১৯২৮ ইং সনে ডা. নির্মল চন্দ্র দেওয়ান এম বি বি এস পাশ করেন। ১৯১৮/১৯ ইং সনে যামিনী রঞ্জন চাকমা সর্ব প্রথম ডিপ্লোমা ভেটেরিনারী পাশ করেন। শুধু রাজ পরিবার থেকে রাজা ব্যতীত কুমার রমনী মোহন রায় ও ভগবান চন্দ্র দেওয়ান ১৮৯৭ ইং সনে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ১৯২৩ ইং সনে নিরুপম রায়, ১৯৩২ ইং সনে কুবলয়াক্ষ রায় মেট্রিক পাশ করেন। ১৯৩১ ইং সনে কুমার কোকনদাক্ষ রায় মেট্রিক পাশ করে পরে ১৯৩৭ ইং সনে সর্ব প্রথম এম এ পাশ করেন। এভাবে রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমল থেকে শিক্ষার অগ্রগতি সূচনা হয়। অবশ্য তার আমলে কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, বিএবিটি ভুবন চন্দ্র চাকমা বি এ বি টি নিরোদ রঞ্জন দেওয়ান বি এ বি টি শিক্ষাবিদ এবং স্কুল ইন্সপেক্টর এর যথেষ্ট অবদান রয়েছে। রাজেন্দ্র নাথ তালুকদার বি এ বি টি অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান ডিপুটি স্কুল ইন্সপেক্টর এবং সহ প্রধান শিক্ষক অবদান স্বীকার করতেই হবে। ১৯০৯ ইং সনে চাকমা জাতি সতিশ চন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত এবং ১৯১৯ সনে চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস রাজা ভুবন মোহন রায় কর্তৃক সম্পাদিত প্রকাশিত হয়। এই দুইটি বই চাকমা বুদ্ধিজীবিকে জাগরণী বাণী শুনায়।

রাজা ভুবন মোহন রায়ের রাজত্ব কালে “ভারত জয়ন্তী দিল্লী দরবার” অনুষ্ঠান একটি স্মরণীয় ঘটনা। এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় ১২ই ডিসেম্বর ১৯১১ ইং সনে। অনুষ্ঠানে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ দিল্লীতে শুভ আগমন ও অংশ গ্রহণ করেন। সম্রাটের আগমন উপলক্ষে ভারত-জয়ন্তী দিল্লী দরবারে যোগদান করার জন্য ভারতের সকল দেশীয় রাজ্য ও করদমিত্র রাজ্যগুলির রাজা-নবাবগণকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

রাজা ভুবন মোহন রায় ও তার সভা পরিষদ এই মহান দরবারে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ পান। তিনি তার সভা পরিষদ (১) দুর্গ কিংকর দেওয়ান (২) মধু সুখন দেওয়ান ও (৩) বেক্যা কার্বারী সহ সুবলং মুখ, মিতিংগা ছড়ি মৌজার হেডম্যান সহ সভায় যোগদান করেন। এই বেক্যা কার্বারী উচ্চ শিক্ষিত না হলেও খুবই চালাক। তড়িৎ বুদ্ধি সম্পন্ন ও রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন।

রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলে আরো একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, তার দুই বড় কুমারের সঙ্গে অসবর্ণ বিয়ে দিয়ে ভারতের বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ ও রাজন্যবর্গের সাথে আত্মীয়তা গড়ে তোলেন। ভাবী রাজা যুবরাজ নলিনাক্ষ রায়ের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তক স্বনামধন্য কেশব চন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিষ্টার সরল সেনের কন্যা বিনীতা দেবী এবং ২য় পুত্র বিরূপাক্ষ রায়ের সহিত কোচ বিহার মহারাজার ভ্রাতা কুমার ভবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ এম, ডি সিভিল সার্জন এর কন্যা সুধীরা দেবীর সহিত ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ ইং সনে বিবাহ সম্পন্ন হয়। রাজকুমারী নীহার বালার সঙ্গে ভাবী মং রাজা মং প্রু সাইন এর সঙ্গে বিয়ে দিয়ে স্থানীয় রাজন্যবর্গের সঙ্গে আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠতর করেন। তিনি অন্যান্য পুত্র কন্যাদেরও যথাযোগ্য পাত্রস্থ করেন।

রাজা ভুবন মোহন রায় একজন দক্ষ, জনপ্রিয় শাসক এবং জন দরদী রাজা ছিলেন। তার প্রজাকুল ও অমাত্যবর্গ তাকে যেমন সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন সেরূপ ভয় ও সমীহ করে চলতেন। তিনি ন্যায় বিচারক ও সুশাসক ছিলেন। প্রজারা তাকে খুবই ভাল বাসতেন। কোন সময় রাজা গ্রামাঞ্চলে বা মৌজায় বেড়াতে গেলে চাকমারা দলে দলে এসে রাজার জন্য নানা উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। কেহ একটা বড় মান কচু। জুম্ম মিষ্টি কদু, তুমবাজ কুমড়া, একজোড়া বড় মোরগ, একটা খাসী ছাগল, দো-চুয়ানী কয়েক বোতল মদ কেহ বা বিনি চাউল ও দই দুধের কলসী নিয়ে আসতেন। তখন একটা মেলার (নিমন্ত্রণ) উৎসবের আয়োজন হয়ে যেত। স্থানীয় হেডম্যান কার্বারী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রাজার সহিত দেখা করে কুশলমত বিনিময় করতেন। এভাবে রাজা মৌসুম কালে গ্রামে গিয়ে প্রজাদের সুখ দুঃখের কথা শুন্যর জানান্যর ব্যবস্থা করতেন। প্রতি বৎসর রাজ বাড়ীতে রাজ পুণ্যাহ্ মেলা বসতো। প্রাচীন কালের প্রধানুযায়ী রাজা রাজ পরিষদ নিয়ে রাজ পুণ্যাহ্ এর সময় রাজগদীতে রাজকীয় ভাবে উপবেশন করতেন। অনুষ্ঠানে হেডম্যান কার্বারীরী হাজার হাজার টাকার খাজানা জমা দিতেন। বাবার কাছে শুনেছি ১৯৩৫ ইং সনে রাজা নলিনাক্ষ রায়ের রাজ্যাভিষেকের সময় রাজ পুণ্যাহ্ এ ২,৫০,০০০/- (দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার)



রাজা ভুবন মোহন রায় (রাজত্বকাল ১৮৯৭-১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)



চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় (মাঝখানে)
তাঁর ডানে ত্রিলোচন দেওয়ান ও বামে নীলরথ কার্বারী

টাকা খাজানা উত্তল হয়েছিল (এখন প্রায় ১০/১২ কোটি টাকা)। রাজ পুণ্যাহে প্রজাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য প্রতি মৌজায় রসদ দেওয়া হত। ইহার জন্য কয়েক জন কর্মকর্তা থাকতেন রাজ ভান্ডারে। পঞ্চাশের দশক পর্য্যন্ত সময়ে আমি বাল্যকালে রাজ পুণ্যাহে গেলে এই রূপ রসদ দেওয়ার কথা শুনেছি। রাজা সময়ান্তে এই সব রসদ বিতরণ ঠিকমত হচ্ছে কিনা তদারক করতেন। রাজা ভুবন মোহন রায়ের রাজত্ব কাল ছিল চাকমা রাজ্যের সবচেয়ে শান্ত, নিরিবিলা এবং সকল উন্নয়নের সূচনা। দেশের বাইরে ও ভেতরে তখন বৃটিশ ভারতে প্রায় শান্ত ছিল। রাজা ভুবন মোহন রায় প্রায় ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বৎসর দীর্ঘদিন রাজত্ব করেন। রাজা ভুবন মোহন রায় ১৯৩৪ ইং সনে ১৭ই সেপ্টেম্বর পরলোক গমন করেন।

রাজা ভুবন মোহন রায়ের রাজত্ব কালে ১৯০০ ইং সনে শাসনের সুবিধার্থে বৃটিশ সরকার চাকমা সার্কেল ও অন্যান্য সার্কেলের তালুক প্রথা রহিত করে সার্কেলকে ৪/৫ থেকে ২০ বর্গমাইল পর্য্যন্ত এলাকাকে নিয়ে এক একটা মৌজা সৃষ্টি করেন। প্রথম মৌজা সৃষ্টি কালে চাকমা সার্কেলের মৌজার বিবরণ :

ক্রমং	মৌজার নাম	হেডম্যানের নাম	মন্তব্য
১।	বড় কাটলী	নীলচন্দ্র দেওয়ান	কাচলং এলাকা
২।	চাল্যাতলী	জৈলাধন দেওয়ান	"
৩।	ডুলুছড়ি	চন্দ্র মানিক দেওয়ান	"
৪।	ঘুইছড়ি	নব চন্দ্র দেওয়ান	"
৫।	মারিশ্যাচর	থৈয়া তালুকদার	"
৬।	রাঙাপানি	দির্ব ধন দেওয়ান	"
৭।	পেটান্যামাছড়া	কর্ণচন্দ্র তালুকদার	"
৮।	ভাসন্যা আদাম	মনুয়া তালুকদার	"
৯।	নলুয়া	কিনারাম তালুকদার	"
১০।	খাগড়াছড়ি	মদন মোহন দেওয়ান	"
১১।	ঘন মোর	শশী মোহন দেওয়ান	"
১২।	কাকপর্য্যা	যুব লক্ষ্য তালুকদার	"
১৩।	বেগেনাছড়ি	ভুবন মোহন দেওয়ান	"
১৪।	কুরকুটি ছড়ি	ইন্দ্রজয় দেওয়ান	"
১৫।	বগাচতর	গোলক তালুকদার	"
১৬।	ছয়কুড়ি বিল	অবিনাশ চন্দ্র দেওয়ান	চেন্গি ভেলী
১৭।	মাইসছড়ি বিল	শশী কুমার দেওয়ান	"
১৮।	সাবেখ্যং	যোগেন্দ্র নাথ দেওয়ান	"

ক্রঃনং	মৌজার নাম	হেডম্যানের নাম	মন্তব্য
১৯।	কাটুলতলী	বাঙ্গালীচান তালুকদার	চেঙ্গি ভেলী
২০।	ষাদু খাঁ ছড়া	মেস্তা তালুকদার	"
২১।	গবছড়ি	বিজয়গিরি তালুকদার	"
২২।	এগারেল্যাছড়া	মানিকচন্দ্র তালুকদার	"
২৩।	শৈলেশছড়ি	সূর্যধন তালুকদার	"
২৪।	চৌধুরী ছড়া	নীলমনি দেওয়ান	"
২৫।	ঘিলাছড়ি	কবিরাজ দেওয়ান	"
২৬।	হাজাছড়ি	অক্ষয় মনি তালুকদার	"
২৭।	ছোট মহাপ্রম	রাজমনি দেওয়ান	"
২৮।	বুড়ী ঘাট	যুবরাজ দেওয়ান	"
২৯।	বড়াদম	ব্যাসমনি দেওয়ান	"
৩০।	বেতছড়ি	সূর্যচন্দ্র তালুকদার	"
৩১।	বাকছড়ি	রাজচন্দ্র দেওয়ান	"
৩২।	তৈচাকমা	রাজ চন্দ্র দেওয়ান	"
৩৩।	কেঙ্গেল ছড়ি	রাজ কুমার তালুকদার	"
৩৪।	বগাছড়ি	রাজ চন্দ্র দেওয়ান	"
৩৫।	দূরছড়ি	অভয় চরণ তালুকদার	সস্তা ভেলী
৩৬।	বান্দর কাটা	ফুল চন্দ্র দেওয়ান	"
৩৭।	মুক্তছড়ি	অনঙ্গ মোহন দেওয়ান	"
৩৮।	ডানের বান্দর কাটা	হরিকান্ত তালুকদার	"
৩৯।	লক্ষ্মীছড়ি	গোপীনাথ তালুকদার	লক্ষ্মীছড়ি এলাকা
৪০।	শুকনাছড়ি	শ্রী চন্দ্র দেওয়ান	"
৪১।	কেরেত কাবা	রমনী মোহন দেওয়ান	"
৪২।	না ভাঙ্গা	মন্ডীচরণ তালুকদার	"
৪৩।	মুবাছড়ি	ভাঞ্জরাম তালুকদার	ইছামতি ভেলী
৪৪।	ঘিলাছড়ি	রাজচন্দ্র তালুকদার	"
৪৫।	খাগড়াছড়ি	ভাগ্যধন তালুকদার	"
৪৬।	রাঙাপানি	জয় কুমার দেওয়ান	কর্ণফুলী ভেলী
৪৭।	বাকছড়ি	চন্দ্রধর দেওয়ান	"
৪৮।	ঝগড়াবিল	ত্রিভুজগত দেওয়ান	"
৪৯।	জীবতলী	চন্ডি চরণ দেওয়ান	"
৫০।	কামিলাছড়ি	নগেন্দ্র নাথ দেওয়ান	"

ক্রঃনং	মৌজার নাম	হেডম্যানের নাম	মন্তব্য
৫১।	বড়াদম	ত্রিলোচন দেওয়ান	কর্ণফুলী ভেলী
৫২।	সাপছড়ি	রতন মানিক দেওয়ান	"
৫৩।	শুকনাছড়ি	গঙ্গা মানিক দেওয়ান	"
৫৪।	কুদুকাছড়ি	মুক্ত কিশোর দেওয়ান	"
৫৫।	ডুলুছড়ি	কান্ত নাথ চাকমা	"
৫৬।	তৈমিদং	কৃষ্ণ চরণ দেওয়ান	"
৫৭।	বালুখালি	কৃষ্ণ চন্দ্র দেওয়ান	"
৫৮।	মগবান	কামিনী মোহন দেওয়ান	"
৫৯।	কৌশল্যা ঘোনা	ঘনেশ্বর রাম তালুকদার	"
৬০।	ধনপাতা	জয় চন্দ্র তালুকদার	"
৬১।	কুতুব দিয়া	কর্মধন দেওয়ান	রাইংখ্যং ভেলী
৬২।	নারেই ছড়ি	ভিলক চন্দ্র দেওয়ান	"
৬৩।	ফুলগাজী বাপের ছড়া	পূর্ণ চন্দ্র দেওয়ান	"
৬৪।	বিলাইছড়ি	মানিক চান তালুকদার	"
৬৫।	কেংড়া ছড়ি	সিদ্ধাধন তালুকদার	"
৬৬।	কাইন্দা	নবীন চন্দ্র দেওয়ান	কর্ণফুলী ভেলী
৬৭।	মিতিঙ্গাছড়ি	কৃষ্ণ কিশোর দেওয়ান	"
৬৮।	বামের হালঘা	শ্রী বিদ্যাধর তালুকদার	"
৬৯।	বড় হরিণা	জয়ন্ত তালুকদার	"
৭০।	জারুল ছড়ি	শরৎ চন্দ্র দেওয়ান	সুবলং ভেলী
৭১।	পানছড়ি	ননা মোহন দেওয়ান	"
৭২।	মৈদং	বিরাজ মোহন দেওয়ান	"
৭৩।	তিন দোদড়ি	নীলধ্বজ কার্বারী	"
৭৪।	বাঘা ছোলা	পঞ্চরাম তালুকদার	"
৭৫।	চোকপতি ঘাট	কিনুর দেওয়ান	"
৭৬।	ডুবা জারুল	জলেয়া তালুকদার	"
৭৭।	কুসুম ছড়ি	বিনাধন দেওয়ান	"
৭৮।	বনযোগী ছড়া	চন্দ্র ধন তালুকদার	"
৭৯।	ফকিরা ছড়া	মেঘনাথ দেওয়ান	"
৮০।	লুলং ছড়ি	কৈলাশ দেওয়ান	"
৮১।	গর্জনতলী	ফুল চন্দ্র তালুকদার	কর্ণফুলী ভেলী
৮২।	গোরস্থান	চন্দন খাঁ দেওয়ান	"

ক্রঃনং	মৌজার নাম	হেডম্যানের নাম	মন্তব্য
৮৩।	আইমা ছড়া	রসুন খাঁ দেওয়ান	কর্ণফুলী ভেলী
৮৪।	হেইট ভরেয়া	ইন্দ্র ধন দেওয়ান	"
৮৫।	মাউখং ভৈরব	চন্দ্র দেওয়ান	"
৮৬।	ধুম তালং	পবন চন্দ্র দেওয়ান	"
৮৭।	তৈবাং	মানিক্য তালুকদার	"

উপরোক্ত মৌজাগুলি সৃষ্টি ও ইতিহাস ১০০ (একশত) বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। জাতি ও পরিবারের উত্থান পতনে বহু হেডম্যানের পরিবার ইতিহাসের পাতা থেকে মুছে গেছে। বহু হেডম্যানের ক্ষমতা হাত বদল হয়ে গেছে। নতুন হেডম্যান নিয়োগ হয়ে গেছেন কোন কোন ১ম হেডম্যানের গোষ্ঠীর লোক এখনও পুরুষানুক্রমে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন।

রাজা ভুবন মোহন রায় একালের একজন দক্ষ, ক্ষমতাবান তেজস্বী রাজা ছিলেন কিন্তু কাল ও সময় শতবর্ষ অতীত হয়ে গেছে। তার শৌর্য-বীর্য কোন কাজে লাগাতে পারলেন না। তার জন্মের বহু আগেই চাকমা রাজা ও চাকমা জাতি চাকমা রাজ্যকে পঙ্গু করে দিয়েছে ধূর্ত ব্রিটিশ সরকার। তাই তার সবই নীরবে সহ্য করা ও মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তিনি জাতিকে বেঁচে রাখার বিকল্প চিন্তা করে, জাতি ও জাতিকে শিক্ষিত করে তোলার চিন্তা করলেন। তার আশা এখন কিছুটা সফল বলা যাবে। শিক্ষার বিষয় মন্ত্রে এখন জাতিকে আত্ম-রক্ষা করতে হবে এবং বিশ্বের প্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে বাঁচতে হবে।

পঞ্চম অধ্যায়
৩। রাজা নলিনাক্ষ রায়
(১৯৩৫-১৯৫১ ইং)

রাজা নলিনাক্ষ রায় ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর তৃতীয় রাজা। রাজা ভুবন মোহন রায় ও রানী দয়াময়ী রায়ের গর্ভে তিনি ১৯০২ ইং সনের ৬ই জুন জন্মগ্রহণ করেন। একালের চাকমা রাজার গৌরবময় সময়ে রাজা নলিনাক্ষ রায়ের জন্ম। ধনে সম্পদে মান সম্মানে রাজা ভুবন মোহন রায় তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার খুব উঁচু পর্যায়ে অবস্থান। ডি, সি বাহাদুর, বিভাগীয় কমিশনার, বাংলার লেঃ গভর্নর এমনকি বড়লাট গভর্নর জেনারেল মহোদয়ও রাজা বাহাদুরকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সব জায়গায় রাজকীয় সম্মান পান রাজা ভুবন মোহন রায়। সুতরাং ভাবী রাজা যুবরাজ নলিনাক্ষ রায়ের মানুষ হয়ে উঠতে। শিক্ষা-দীক্ষা পেতে কোন অসুবিধা হয়নি। শশীকলার মত যুবরাজ নলিনাক্ষ দিন দিন বড় হতে থাকেন। রাজ্যের বার্ষিক আয় ছাড়াও রাকুনিয়া, পটিয়া, ধলঘাট ও চট্টগ্রাম শহরে রাজার লট সম্পত্তির (জমিদারী) পরিমাণ কম ছিল না। এই আয়ে একজন পার্বত্য রাজার চলার কোন অসুবিধা ছিল না।

যুবরাজ নলিনাক্ষ রায়কে মেট্রিক পাশ করার পর কলিকাতা মহানগরীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়। সেখানে তিনি মনোযোগের সহিত পড়াশুনা ও শিক্ষা আরম্ভ করে দেন। তিনি ১৯২৫ ইং সনে বি এ পাশ করেন এবং ইংলিশে এম, এ ভর্তি ও অধ্যয়ন করেন। এম, এ অধ্যয়ন কালে তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। ভারতের স্বনামধন্য কেশব চন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিস্টার সরল সেনের কন্যা বিনীতা দেবীর সঙ্গে যুবরাজ নলিনাক্ষ রায়ের ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬ ইং সনে বিয়ে হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের পড়ার সমাপ্তি ঘটল। তারা ৭ (সাত) ভাই ও ৩ (তিন) বোন। সকল ভাই বোনের মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করেন কুমার কোকনদাক্ষ রায়। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৩৭ ইং সনে বাংলা নিয়ে এম, এ পাশ করেন। উপজাতীয়দের মধ্যে কুমার কোকনদাক্ষ রায়ই সর্ব প্রথম এম, এ ডিগ্রী লাভ করেন। রাজা নলিনাক্ষ রায়ের অপর এক ছোট ভাই কুমার বীরূপাক্ষ রায় কোচ বিহার মহারাজার জ্ঞাতি ভাই ডাঃ ভবেন্দ্র নারায়ণ ভূপ এফ, আর, সি, এস ও সিভিল সার্জন এর মেয়ে সুধীরা দেবীকে বিয়ে করেন। বীরূপাক্ষ রায় আই এ পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট কন্ট্রোলার অব ফুড হিসাবে রাজ্যমাটি কিছু দিন চাকুরী করে অবসর গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় মহাসমরে সরকারকে বিবিধ বিষয়ে সাহায্য করায় সরকার সন্তুষ্ট হয়ে কুমার বীরূপাক্ষ রায়কে “রায় বাহাদুর” উপাধি দেন। রাজার অন্যান্য ভাই-বোনদেরও যথাযোগ্য ভাবে বিয়ে হয়ে যায়।

রাজা ভুবন মোহন রায় ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ইং সন তারিখে পরলোক গমন করলে ১৯৩৫ ইং সনের ৭ই মার্চ যুবরাজ নলিনাক্ষ রায়কে বিভাগীয় কমিশনার মি. টুইনাম আই সি এস মহোদয় রাজা অভিষিক্ত করেন। ১৯৩৯ ইং সনে ৮ই জুন সম্রাট

ষষ্ঠ জর্জের জন্ম দিবস উপলক্ষে সম্রাটের জয়ন্তীতে নলিনাক্ষ রায়কে ‘রাজা’ উপাধি প্রদান করা হয়। রাজা নলিনাক্ষ রায় একজন খুব সাদাসিধা, নম্র, ভদ্র ব্যক্তি ছিলেন।

রাজা নলিনাক্ষ রায়ের সঙ্গে বিনীতা রায়ের বিয়ে রাজ পরিবারে ও চাকমা বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন ও প্রভাব এসে যায়। ব্যারিষ্টারের কন্যা বিলাতে জনগ্রহণকারী পাশ্চাত্যের শিক্ষায় দীক্ষায় শিক্ষিত ও গড়ে তোলা বিনীতা রায় দেশান্তরে পার্বত্য রাজ্যে এসে নিজেকে বন্দী করে রাখলেও মনকে আর বন্দী করে রাখতে পারলেন না। তার মন, রূপ, স্নেহ ভালবাসা ও শ্রদ্ধা দিয়ে শুধু রাজ পরিবারের লোকজনকে নয়, চাকমা সমাজের বুদ্ধিজীবীদেরও আকর্ষণ ও আপন করে নিলেন, তিনি চাকমা রাজ প্রাসাদকে পাশ্চাত্যের নানা উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে নিলেন নাচ, গান ও সাহিত্যের আসর জমিয়ে। পরিশেষে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কৃপা-দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবির নাম দেওয়া “গৈরিকা” পত্রিকা বের করলেন ১৯৩৬ ইং সনে। এই “গৈরিকা”র স্বাদ পেয়ে চাকমা সমাজের অনেক শিক্ষিতজন এসে সাহিত্য সেবায় মন দেন কেহ বাংলা ভাষায়, কেহ ইংরেজী সাহিত্য এবং কেহ চাকমা ভাষায়। এদের মধ্যে চিত্রশিল্পী চুনী লাল দেওয়ান, কবি অরুণ রায়, নাট্যকার ও সাংবাদিক কুমার কোকনদাক্ষ রায়, নটরাজ অরিন্দম দেওয়ান, পণ্ডিত বিপুলেশ্বর দেওয়ান, রাজা নলিনাক্ষ রায়, কবি ও প্রবন্ধকার সলিল রায় এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাদের অপূর্ব লেখনীতে গৈরিকা সমৃদ্ধ হয়ে উঠে এবং দেশে বিদেশে (বাঙালী সমাজে) প্রচুর সুনাম অর্জন করে। এভাবে “গৈরিকা” ১৯৫১ ইং সন পর্যন্ত প্রায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়। চিত্রশিল্পী চুনী লাল দেওয়ানের বাঙালী অক্ষরে চাকমা ভাষায় রচিত কবিতা (সম্ভবতঃ সর্ব প্রথম) এখনও চাকমা সমাজে মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত “ঘর দুয়ারত এইনোই ডাগে সিবা কন্বা মরে মূয়ান চিনং, নাং ন জানং কুদু দেখ্যং তারে....” নাট্যকার কোকনদাক্ষ রায় বেশ কয়েকটা নাটক নাটিকা রচনা করেন ও প্রচুর ছোট গল্প ও প্রবন্ধ রচনা করেন। কবি অরুণ রায়ের কবিতা, খুবই উঁচু মানের ছিল। এভাবে চাকমা বুদ্ধিজীবীরা “গৈরিকা”তে প্রচুর সাহিত্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ লেখকগণের উদাসীনতা, চাকমা বুদ্ধিজীবীদের নির্লিপ্ততা, অবহেলা ও সংরক্ষণের অভাবে চাকমা বুদ্ধিজীবীদের সাহিত্য ভাণ্ডার প্রায় হারিয়ে গেছে। বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধ্যাপক নন্দলাল শর্মা, লেখক ও প্রবন্ধকার বঙ্কিম কৃষ্ণ দেওয়ান এর প্রচেষ্টা ও গবেষণায় সামান্যতম মাত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তৎকালীন সময়কার লেখকগণের বহু বন্ধু বান্ধব, এবং কলিকাতা সাহিত্য সেবী ও সংগঠন প্রতিষ্ঠানে অনুসন্ধান করলে হয়তো গৈরিকার পুরাতন কপি ও কিছু কিছু সাহিত্য এখনও উদ্ধার করা সম্ভব হতে পারে।

রাজা ভুবন মোহন রায় এর রাজত্ব কালে চাকমাদের শিক্ষার ভিত্তি ও উচ্চ শিক্ষার সূচনা এবং রাজা নলিনাক্ষ রায়ের রাজত্ব কালে চাকমাদের শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। রাজা নলিনাক্ষ রায়ের রাজত্ব কালে ১৭৯টি প্রাথমিক স্কুল ২টি জুনিয়র হাই স্কুল ৫টি এম ই স্কুল ও ১টি হাই স্কুল স্থাপিত হয় এবং ২০৪ জন চাকমা



রাজা নলিনাক্ষ রায় (রাজত্বকাল ১৯৩৫-১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দ)



প্রয়াত রাজমাতা বিনীতা রায়

ছেলে মেট্রিক ১২ জন আই, এ (একজন মেয়ে সহ) ৫জন মেয়ে মেট্রিক ১৯ জন গ্র্যাজুয়েট, ১ জন এম, এ ৬ জন ডাক্তার, ২জন ইঞ্জিনিয়ারিং, ২জন ভেটেরিনারী সার্জন ও ১জন কৃষিবিদ (বিএসসিএজি) পাশ করেন। এভাবে তার রাজত্বকালেই চাকমাদের উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।

রাজা ভুবন মোহন রায়ের রাজত্ব কালে চাকমাদের গণ-চেতনা ও গণ-আন্দোলনের সূচনা হয়। ১৯১৫ ইং সনের রাজ মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে সর্ব প্রথম গণ-সংগঠন “চাকমা যুবক সমিতি”। ১৯১৮ ইং সনে ঘনশ্যাম দেওয়ানের নেতৃত্বে “চাকমা যুবক সংঘ” ১৯২০ ইং সনে কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বে ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি’ গঠিত হয়। বহু চাকমা শিক্ষিত মহল পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতি ও কামিনী মোহন দেওয়ানের নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন দেন। এদের মধ্যে নানিয়ারচর বড়াদমের হেডম্যান প্রতুল চন্দ্র দেওয়ান, যামিনী রঞ্জন দেওয়ান, হাজারী বাগের বিজয় চন্দ্র চাকমা, খাগড়াছড়ির ইন্দ্রমনি চাকমা (দারোগা), ছোট মহাপ্রম এর লার্মা ভ্রাতৃদ্বয়, স্নেহ কুমার চাকমা ও হৃদয় রঞ্জন চাকমা, লংগদুর চিত্তরঞ্জন চাকমা, সুনীতি জীবন চাকমা বড়াদম গোলাছড়ি এর সুধীর কুমার চাকমা পীং মতিলাল চাকমা এর নাম উল্লেখযোগ্য। কামিনী মোহন দেওয়ান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির জনপ্রিয়তা দেখে চাকমা রাজ পরিবার শংকিত হয়ে পড়েন এবং নিজেদের জন সমর্থন ও প্রজাবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করার্থে ১৯৩৯ ইং সনে চাকমা রাজ পরিবারের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাত্র সমিতি নামে একটা সংগঠন গড়ে তোলেন কিন্তু ইহার কার্যকারীতা ও প্রসার বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।

শুনা গিয়াছে, ঐসময় কিছু চাকমা ছেলে ভারত বাংলা বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়েন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদল মাষ্টার দা সূর্যসেন এর সঙ্গে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কাজ করেন। এদের মধ্যে নানিয়ারচর এলাকার সহস্র লোচন চাকমা ও কামিনী মোহন দেওয়ান ভ্রাতুষ্পুত্র খগেন্দ্র লাল দেওয়ানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐ সময়ে তারা বিপ্লবীদের পার্বত্য চট্টগ্রামে গহিন অরণ্যে, অজানা অচিনা জায়গায় নিরাপদে অবস্থান করার সুযোগ করে দিতেন। এভাবে বিপ্লবী মাষ্টার দা সূর্যসেন অনেক সময়ে বাবু সহস্র লোচনের বাড়ীতে আত্মগোপন করে থাকতেন বলে জানা যায়।

১৯৪০ ইং সনের পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আকার ও বিস্তৃতি পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। অক্ষ-শক্তি জার্মান ইটালী তুরস্ক ও জাপান মিত্র শক্তির এলাকা ও রাজ্যসমূহ একের পর এক রাজ্য দখল ও অধিকার করতে থাকেন। এভাবে জাপান মিত্র শক্তি এলাকা দূর প্রাচ্য দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় রাজ্য সমূহ ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর, ভিয়েতনাম, লাউস কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও বার্মা দখল করে ভারত পূর্ব সীমান্তে মনিপুর ইম্পল, কোহিমা এবং ভারত মহাসাগরে আন্দামান নিকোবরে বোমা বর্ষণ আরম্ভ করে দেন। এদিকে মহাত্মা গান্ধীজি ও সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ঘোষণা

দিয়েছেন “কুইট ইন্ডিয়া” ভারত ছাড় অসহযোগ আন্দোলন। প্রথম মহাযুদ্ধে বৃটিশ সরকার ভারতবাসীকে প্রতারণা করেছে। স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসন কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দেন বৃটিশ সাংবিধানিক আওতায়। সে সময় মানতে বাধ্য হলেও এখন আর ভারতবাসী মানতে রাজী নয় “লরকে লেঙ্গে”। এরূপ পরিস্থিতিতে বৃটিশ সরকার বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবেন বলে অঙ্গীকার করতে বাধ্য হন। ১৯৪৫ ইং সনের শেষ ভাগে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকীকে মার্কিনীদের এটম বোমা মারার সঙ্গে সঙ্গে জাপান যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করেন এবং যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ভারতে স্বাধীনতা রব রব পড়ে যায়। সেই স্বাধীনতার ধ্বনি পার্বত্য চট্টগ্রামেও এসে যায়। কূটনৈতিক বৃটিশ জাতি পূর্ব থেকে ভারতকে বিভাগ দুই ভাগে বিভক্ত করার মতলব আটেন। হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে ভারত মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করা হবে। পূর্ব থেকে অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ কামিনী মোহন দেওয়ান ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতি এর নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা অ-মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে ভারত-ভুক্তি নিশ্চিত ঘোষণা দেন এবং ভারতীয় কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ আরম্ভ করে দেন। ইতিমধ্যে ভারত বিভাগ ক্রিষ্ট মিশনের পরামর্শে (১) এ. ডি ঠাকুর, (২) ডাঃ প্রফুল্ল কুমার ঘোষ (৩) মি. জয়পাল সিং, (৪) মি. রাজকৃষ্ণ বোস, (৫) মি. ফুলবান সাহা (৬) মি. জয় প্রকাশ নারায়ণ প্রতিনিধি দলে পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজ্যমাটি পরিদর্শন সফর শেষ করে গেলেন। তারা (নেতৃবৃন্দ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির নেতৃবৃন্দ, বর্ষিয়ান নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে দেখা, সাক্ষাত ও আলাপ করে যান এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পার্বত্য রাজা চাকমা চীফ, বোমাং ও মং চীফের সঙ্গেও দেখা, সাক্ষাত ও আলাপ করে যান। ইতিমধ্যে পার্বত্য প্রদেশে রাজ্যমাটি বান্দরবান ও মানিকছড়িতে অনেক বিতর্কিত গুজব ছড়ে পড়ে। দেশে স্বাধীন হলে তিন রাজা আর থাকবে না। জনগণই রাজ্য চালাবে। তিন রাজা ইহাতে ভীষণ ভয় পেয়ে যান এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভোগতে থাকেন। তাদের ভাগ্য কি ভগবান উন্টিয়ে দেবেন? তারা প্রমাদ গুলেন কি কৌশল করা যায় কুল-কিনারা কিছু করতে পারলেন না। হেডম্যান দরবার ডেকে বিষয়টি আলোচনা করলেন। হেডম্যানেরা কিছুই সমাধান দিতে পারলেন না জনগণ যাহা চায়, তাই হবে। তাদের ভয় জনগণ রাজা চান না। হেডম্যান দরবার ও রাজাদের সংগঠন কোন কাজে আসলো না। দেখতে দেখতে ভারত পাকিস্তান স্বাধীনতা দিবস এসে গেলো। ১৪ই আগষ্ট/১৯৪৭ ইং তারিখ লর্ড মাউন্ট ব্যাটন গভর্নর জেনারেল ও ভাইসরী করাচিতে পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন এবং ১৫ ই আগষ্ট/১৯৪৭ ইং দিল্লীতে ভারত স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। রাজ্যমাটিতে কোন খবর আসলো না, পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসমিতির সাধারণ সম্পাদক মি. স্নেহ কুমার চাকমা ও নেতৃবৃন্দ ডিসি অফিসে গিয়ে ১৪ ই আগষ্ট/৪৭ ইং তারিখ ভারত পতাকা উত্তোলন করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারত ভুক্তি ঘোষণা দেন।

ইতিমধ্যে চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়, বোমাং রাজা ও মং রাজাকে লয়ে চুপিসারে ঢাকা গিয়ে নব-রাষ্ট্র পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর সঙ্গে দেখা করে তিন পার্বত্য রাজ্য পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তান ভুক্তি স্বীকৃতি দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে আসেন। ১৮ই আগস্ট/৪৭ তারিখ পাকিস্তান পুলিশ ব্যাটেলিয়ান বাহিনী রাজ্যমাটি এসে কোন প্রতিরোধ ছাড়া রাজ্যমাটি দখল করে নেন এবং ভারত পতাকা নামিয়ে পাকিস্তান পতাকা উত্তোলন করেন। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম রাজ্যমাটি, বান্দরবান, রামগড় পাকিস্তান ভুক্তি হয়ে যায়। পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সমিতির নেতৃবৃন্দ মি. স্নেহ কুমার চাকমা, হৃদয় রঞ্জন চাকমা, ইন্দ্র মনি চাকমা, ঘনশ্যাম দেওয়ান দলবল নিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে পলাইয়া যান। বৃদ্ধ নেতা কামিনী মোহন দেওয়ান ও প্রতুল চন্দ্র দেওয়ানকে পাকিস্তান সরকার নজরবন্দী করেন। ভারতে চাকুরী করার অপশন দেওয়াতে ডা: নির্মল চন্দ্র দেওয়ান, ডা: প্রমোদ বিকাশ তালুকদার, মি: ভুবন চন্দ্র চাকমা, (সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুল), মি: নিরোদ রঞ্জন দেওয়ান (সাব ইন্সপেক্টর অব স্কুল) কে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। এভাবে স্বাধীনতা যবনিকা সমাপ্ত হয়। মি. কামিনী মোহন দেওয়ান ও মি. প্রতুল চন্দ্র দেওয়ানকে দীর্ঘদিন কারা বরণ করতে হয়নি। পরে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এভাবে স্বাধীনতা প্রাক্কালে চাকমা ও মার্মারা প্রো ইন্ডিয়ান ও প্রো বার্মিজ কার্যকলাপে জড়িত হয়ে পড়ায় পাকিস্তান সরকারের কু-নজরে পড়ে যান। বান্দরবানে ১৪ই আগস্ট/৪৭ তারিখ বার্মিজ পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল পরে পাকিস্তানী পুলিশ ব্যাটেলিয়ান গিয়ে তাহা নামিয়ে পাকিস্তানী পতাকা উত্তোলন করেন। উক্ত কাজের উদ্যোক্তা বোমাং রাজকুমার বার্মায় পলাইয়া যান। অবশ্য পাকিস্তান সরকার প্রাথমিক অবস্থায় জন সাধারণের উপর বিশেষ কোন অত্যাচার করেননি। শুধু বিপ্লবী বা বিদ্রোহীদের উপর কড়া নজর রাখেন এবং একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজ্যমাটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়টির উপর নজর দিতে থাকেন। ১৯৪৯ ইং সনে স্কুলটির উপর এক আঘাত হানার সুযোগ পান। সামান্য তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক রূপ দিয়ে বহু ছাত্রের জীবন নাশ করে দেন। কিছু ছাত্রের চিরতরে স্কুল থেকে বহিষ্কার কিছু ছাত্রের বাধ্য-বাধকতা ভাবে স্কুল ত্যাগ এবং কিছু ছাত্রের অঙ্গীকার নামায় ছাত্র ও অভিভাবকের স্বাক্ষর প্রদান এভাবে বহু মেধাবী ছাত্রের পড়া শেষ হয়ে যায়। তাদের মধ্যে শ্রোত রঞ্জন খীসা, বিপিন চন্দ্র তালুকদার, ভাগ্যচন্দ্র চাকমা, বক্রবাহন চাকমা, বানেশ্বর চাকমা প্রভৃতি কয়েকজন ছাত্র ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যে গিয়ে পড়াশুনা করে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বহু ছাত্র বাড়ীতে গিয়ে জীবন খুঁটে মরেন বা পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়।

এ রাজনৈতিক খেলায় চাকমা রাজা নলিনাক্ষ রায়, বোমাং রাজা ক্যাজ সান প্র ও মংরাজা হানুমা চৌধুরী রাজগিরি বা চীফগিরি রক্ষা করলেও উপজাতীয় লোকদেরকে ও পার্বত্য রাজ্যগুলিকে চিররক্ত করে যান এবং আত্মসী জাতির মুখে

ঠেলে দিয়ে যান রাজশক্তি ও ক্ষমতা ধীরে ধীরে নিঃশেষ থেকে আরো শেষ হয়ে গেলো। অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে আধাসী জাতি পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল উপজাতীয়দের সকল শক্তি অষ্টোপাসের মত গ্রাস করে বসলো, নড়া-চড়ার কোন উপায় রইল না। হয়তো আরো অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে সকল উপজাতি অতীতের ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ জাতি সমূহ, হুন, শক, মোগল পাঠান জাতির মত হারিয়ে যাবে। জাতির নেতৃবৃন্দ বার বার ভুল সিদ্ধান্ত দেওয়ায় জাতির এই অমোঘ পতন এত দ্রুত ত্বরান্বিত হল বলে বিজ্ঞজনের অভিমত। বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন রোধ করার সময় বৃটিশ সরকার ১৯১১ ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমাজ ও প্রকৃতি লক্ষ্য করে প্রস্তাব দিয়েছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামকে আসামের সাথে সংযুক্ত করা হউক। নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদের মুখে তাহা কার্য্যকরী হয়নি। ১৯৩৯ ইং সনে বার্মাকে ভারত উপমহাদেশ থেকে পৃথক করে ডমিনিয়ন দেওয়ার সময় বৃটিশ সরকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসী শতকরা ৮০% ভাগ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পার্বত্য চট্টগ্রামকে বার্মার সাথে সংযুক্ত করা হউক। আমাদের নেতৃবৃন্দ তাতে রাজী হয়নি। নেতৃবৃন্দ ভাল মানুষের সাথে থাকতে চেয়েছিল। এখন খুব ভাল ভাবে থাকুন। তখন পার্বত্য চট্টগ্রাম যেই দিকেই সংযুক্ত হউক না কেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে যে কোন নামে হউক না কেন প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্ব শাসন লাভ করতো। বার্মায় যেমন আরাকানিজদের রাখাইন স্টেট, লাইকারদের চিনহিল স্টেট এবং ভারতে মিজোদের জন্য মিজোরাম নাগাদের জন্য নাগ্যাল্যান্ড, মনিপুরীদের মনিপুর স্টেট, গারোদের জন্য মেঘালয় প্রভৃতি প্রাদেশিক স্বায়ত্ত্বশাসন লাভ করেছেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের দেশতো গেলই, জাত তো যেতে বেশী দেরী নেই।

পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর রাজা নলিনাক্ষ রায় বেশী দিন বাঁচেন নাই। চট্টগ্রাম শহরের অন্তর্গত রাজাপুরস্থ রাজভিলাতে বেড়াতে গিয়ে হঠাৎ শিরঃ পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৫১ ইং সনের ৭ই অক্টোবর রাজা নলিনাক্ষ রায় মৃত্যুবরণ করেন। রাজা নলিনাক্ষ রায়ের ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে (১) রাজকুমারী অমিতি রায় (২) রাজা ত্রিদিব রায় (৩) কুমার সমিত রায় (৪) রাজকুমারী মৈত্রী রায় (৫) রাজকুমারী রাজশ্রী রায় (৬) কুমার নন্দিত রায়।

ষষ্ঠ অধ্যায় ৪। রাজা ত্রিদিব রায় (১৯৫৩-১৯৭১ খৃষ্টাব্দ)

রাজা ত্রিদিব রায় ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর ৪র্থ চাকমা রাজা এবং পাকিস্তান আমলে প্রথম চাকমা রাজা হন। চাকমা রাজার গৌরবোজ্জ্বল বৃটিশ রাজত্বকাল রাজা ভুবন মোহন রায়ের আমলের শেষভাগে রাজা ত্রিদিব রায় ১৯৩৩ ইং সনের ১৪ই মে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম রাজা নলিনাক্ষ রায় ও মাতার নাম রানী বিনীতা রায়। তার মাতা নব বিধান সমাজ প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাতনামা ব্রহ্মনন্দ কেশব চন্দ্র সেনের পৌত্রী ও ব্যারিষ্টার সরল সেনের কন্যা। সেই সূত্রে রাজা ত্রিদিব রায় কুচ বিহার ও ময়ূর ভঞ্জ মহারাজার পরিবার বর্গের নিকট আত্মীয় স্বজন।

তার পিতা রাজা নলিনাক্ষ রায় কুমার ত্রিদিবের সুশিক্ষার সুব্যবস্থা করেন এবং বাড়ীতে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর ১৯৪৩ইং সনে কলিকাতার সেন্টজেরভিয়ার স্কুলে ভর্তি করে দেন। ১৯৫০ ইং সনে তিনি ইংরেজীতে অনার্সসহ দার্জিলিংস্থ কার্সিয়াং স্কুল থেকে সিনিয়র কেমব্রিজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ ইং সনে ব্যারিষ্টারী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিলাতে লিংকন ইন এ ভর্তি হন কিন্তু হঠাৎ পিতার মৃত্যু হওয়াতে ব্যারিষ্টারী পড়া বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৫২ ইং সনে সরকার তাকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দেন এবং পাকিস্তান কেন্দ্রীয় তুলা উন্নয়ন কমিটিতে সদস্য পদ দেন।

১৯৫৩ ইং সনে ২রা মার্চ তারিখে পুরাতন রাঙ্গামাটিস্থ রাজ প্রাসাদে মহাসমারোহে বিভাগীয় কমিশনার পীর আসান উদ্দীন সিএসপি মহোদয় দ্বারা তিনি রাজগদীতে অভিষিক্ত হন এবং প্রতিভাপন্ন দেওয়ান পরিবার সম্ভ্রান্ত বংশীয় শ্রীযুত নিবারণ চন্দ্র দেওয়ানের সুযোগ্যা কন্যা রানী আরতি রায়ের সঙ্গে তার রাজকীয় মর্যাদায় শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে যায়। তিনি ১৯৫৩ ইং থেকে ১৯৭১ ইং সন পর্যন্ত রাজগদীতে সমাসীন ছিলেন।

রাজা ত্রিদিব রায় ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্যের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত হয়ে দেখলেন ইতিমধ্যে মানব সভ্যতা ও পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে এবং কর্ণফুলী নদী প্রচুর জল সাগর-দ্বারে বয়ে নিয়ে গেছে। বৈজ্ঞানিক যুগ বিংশ শতাব্দীর প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। এ সময়ে কাল পাত্র, পরিস্থিতি ও পরিবেশ মূল্যায়ন করে চলতে হবে। সরকার ও আপন জনগণের সদিচ্ছা ও অংশ গ্রহণ ব্যতীত কোন ভাল কাজ কি দেশে কি সমাজে করা সম্ভব নয়। উপরোক্ত সূত্র ধরে তিনি কাজে এগিয়ে যেতে পরিকল্পনা নিলেন। তিনি আরো লক্ষ্য করলেন যে, উপজাতীয় লোকেরা স্বাধীনতা সূচনাতে সরকার বিরোধী ডাক দিয়েছিল। তাই সরকার সব বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করবে এতো বাস্তবায়ন। সরকার দ্বিমুখী নীতি অনুসরণ করতে থাকেন। কিছু আমলা সৃষ্টি ও শাসন ব্যবস্থা শক্ত করণ এবং উপজাতীয়দের আর্থিক

মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া। পাকিস্তান সরকার চাকমা রাজাকে হাত করার লক্ষ্যে রাজা ত্রিদিব রায়কে পদবী ও দায়িত্ব দিতে আরম্ভ করেন।

পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ ইং সনে ত্রিদিব রায়কে পাকিস্তান ল্যান্ড ফোর্সে অবৈতনিক ক্যাপ্টেন ও পাকিস্তান গভর্নর জেনারেল এর “এ-ডি-কং” পদে ভূষিত করেন।

১৯৫৬ ইং সনে বার্মায় রেংগুনে বুদ্ধ জয়ন্তী ও ষষ্ঠ সংগায়ন মহা সভায় পাকিস্তানী বৌদ্ধ হিসাবে যোগদানের সুযোগ করে দেন। উনি ১৯৫৬ সনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে নয়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ২৫০০ তম বুদ্ধ জয়ন্তী ও মায়ানমারের রেংগুনে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ বৌদ্ধ সংহতিতে যোগদান করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশেষ অবদান রাখার জন্য তিনি ২০০৫ সনে শ্রী লংকার রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শ্রীলংকারঞ্জন উপাধি, ২০০৭ সনে মায়ানমার সরকার কর্তৃক সদ্ধর্মজ্যোতিকধজ ও ২০০৯ সনে শিশু করুণা সংঘ কর্তৃক সদ্ধম্মদীপ উপাধিতে ভূষিত হন। তার প্রকাশনার মধ্যে অন্যান্য রয়েছে (ast Avgo)

-They Simply Belong

-The Windswetp Wahing

-The Departed Melody (Me

- South American Diaries (A Pakistan Ambassadors Journal)

১৯৬০ ইং সনে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কাউট-এ জেলা কমিশনার নিযুক্ত হন। ১৯৬২ ইং সনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য পদে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হন।

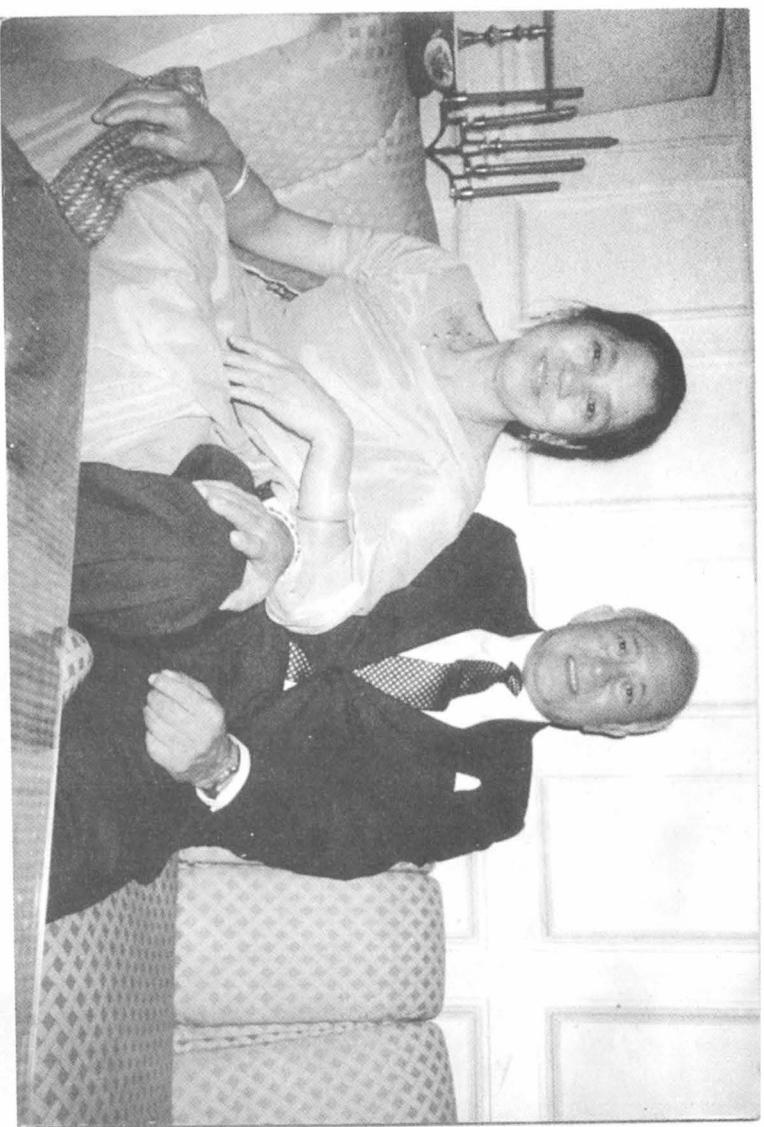
১৯৬৩ ইং সনে তিনি ওয়ার্ল্ড ফুড কংগ্রেস প্রতিনিধি হয়ে ওয়াশিংটন ডি, সি মার্কিন রাষ্ট্রে সফর ও কংগ্রেসে যোগদান করেন। সেই বৎসরই তাকে পাকিস্তান ল্যান্ড ফোর্সের অবৈতনিক মেজর পদে উন্নতি করা হয়। ১৯৬৪ ইং সনে তিনি পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভাইস-চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন এবং ঊনবিংশতম জাতিসংঘ অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হয়ে নিউ ইয়র্ক, ইউ, এস, এ তে যোগদান করেন। ১৯৬৫ ইং সনে বুদ্ধিষ্ট এডুকেশন এড্‌ভাইসরী কমিটির সদস্য মনোনীত হন।

১৯৬৬ ইং সনে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম হতে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ইষ্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল এড্‌ভাইসরী কাউন্সিল ও ইষ্ট পাকিস্তান মাইনোরিটি বোর্ড এর সদস্য মনোনীত হন। ১৯৬৭ ইং সনে ইষ্ট পাকিস্তান স্পোর্ট ফেডারেশন গার্ডনিং বোর্ডের সদস্য মনোনীত হন।

১৯৬৯ ইং সনে তিনি নেপাল তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী ও নেপালের রাজধানী কাঠমন্ডু দর্শন ও পরিভ্রমণ করেন। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক এতগুলি পদবী, দায়িত্ব ও সম্মান দিয়েও তিনি নিজ জাতি ও সমাজকে কোন দিন অবহেলা করেননি।



রাজা ত্রিদিব রায় (রাজত্বকাল ১৯৫৩-১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ)



রাজা ত্রিদিব রায় ও রানী আরতি রায়

বৃটিশ সরকার রাজাদের অধিকাংশ প্রশাসনিক ক্ষমতা হরণ করে নিলেও নিজ নিজ সমাজ ও জাতি রক্ষার্থে জাতীয় বিচার রাজাদের উপরই সর্ব ক্ষমতা অর্পণ করেন। এই ক্ষমতাবলে রাজা বাহাদুরগণ কার্বারী, হেডম্যান আদালতের মাধ্যমে জাতীয় বিচার সম্পন্ন করার নির্দেশ দেন এবং উক্ত নিম্ন আদালতে বিচারের পর রায় হলে বাদী-বিবাদী ইচ্ছা করলে রাজ-আদালতে (সর্বোচ্চ আদালতে) আপীল করতে পারেন। এই ক্ষমতা ও আদেশ পাকিস্তান সরকারও বলবৎ ও অব্যাহত রাখেন। এক সময় এক চাকমা যুবতী মেয়ে এক মুসলমান ছেলের সঙ্গে পলাইয়া যায়। যুবতী মেয়ের পিতা বাদী হয়ে রাজ আদালতে মামলা দায়ের করেন। কালে যুবতী মেয়েটি ও মুসলমান ছেলেটি রাজ আদালতে হাজির হন এবং জাতীয় বিচার মতে রাজ আদালতে এই ছিনালী মোকদ্দমার বিচার হয়। চাকমা জাতীয় বিচার অনুযায়ী মেয়ের পিতা তিন বার মেয়ের রায় পান। উক্ত বিচারে রাজকোর্ট মেয়েটিকে পিতার সঙ্গে যাওয়ার রায় দেন কিন্তু মুসলমান ছেলেটি তার দল বল নিয়ে রাজকোর্ট থেকে মেয়েটিকে ছিনিয়ে নিতে চেষ্টা করেন। রাজা ত্রিদিব রায় তখন রাজকোর্টে বিচারক হিসাবে দন্ডায়মান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার উপক্রম হলে রাজা বাহাদুর বন্দুকের গুলি করতে হুকুম দেন এবং তার নিরাপত্তা বাহিনী সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোড়েন। ফলে ঐ বিবাদী মুসলমান ছেলেটি সহ আরো কয়েকজন গুলিবিদ্ধ ও আহত হন এবং রাজকোর্ট ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আহতদের সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কোতয়ালী এর এক দারোগা রাজ বাড়ীতে গিয়ে রাজা ত্রিদিব রায় কে খেপ্তার করে জেল হাজতে নিয়ে আসেন। কিন্তু এই খেপ্তার আইন ও সংবিধান মোতাবেক হয়নি। পার্বত্য চট্টগ্রামের চীফ বা রাজাগণ সাংবিধানিক রাজা, তাদের খেপ্তার করতে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের অনুমতি প্রয়োজন। একজন দারোগা রাজাকে খেপ্তার করতে আইনতঃ বাধা রয়েছে। ফলে, উক্ত দারোগা ও কর্তৃপক্ষের সাংবিধানিক আইনভঙ্গের আওতায় পড়ে যান। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় ছিলেন খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও স্বাধীনচেতা লোক। নিজ বিচার রাজকোর্ট ও জাতীয় বিচারকে সম্মান দিতে তিনি সব সময় প্রস্তুত ছিলেন। পরবর্তীতে সরকার এই মামলায় রাজার সাথে সমঝোতা করতে ও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়।

পাকিস্তান আমলটা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের নির্যাতনের অত্যাচারের যুগ। ছলে বলে কৌশলে উপজাতীয়দের জমি সম্পদ ক্রয় বা হরণ করে নেওয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষতঃ যারা গরীব ও অশিক্ষিত তাদের সম্পদ ধীরে ধীরে প্রায় নিঃশেষ করে নিয়ে যায় সমতলের বাঙ্গালীরা এ ব্যাপারে সরকার এর আমলারা নিত্য ইন্ধন যোগায় ও সহায়তা দান করতো পাহাড়ীদের সহায় সম্পদ লুণ্ঠনের (ক্রয় বা হরণ)। এভাবে পাহাড়ীদের সেই সামান্যতম জমি-জমা ছিল তাহাও বিক্রি করে পাহাড়ীরা ধীরে ধীরে ভূমিহীন হয়ে পড়েন।

কর্ণফুলী নদীর ভেলীগুলি পার্বত্য চট্টগ্রামের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী এলাকা জমিজমায় শিক্ষা দীক্ষায় এবং অন্যান্য সম্পদে। পাকিস্তান সরকার উপজাতীয়দের এই অঞ্চলটা ধ্বংস করার মহা পরিকল্পনা হাতে নিলেন। বৃটিশের আমলে কর্ণফুলী নদীর পানিতে বরকল নামক স্থানে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরকারী পরিকল্পনা ছিল। দেশ বিভাগের কারণে বৃটিশ সরকার তাহা বাস্তবায়ন করতে পারে নি। পাকিস্তান সরকার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষা আরম্ভ করে দেন। এই পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করতে পারলে সরকারের সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। প্রথমতঃ পরিকল্পনাটি বরকল থেকে সুবলং মুখে সিলারদাগে নিয়ে আসে, পরিশেষে সমস্ত সমৃদ্ধশালী চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে ডুবে মরে যাবে এমন স্থান কাণ্ডাই নামক স্থানে ১৯৫০ ইং সনে বাঁধ দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় এবং ১৯৫১ ইং জুলাই মাস থেকে কাজ আরম্ভ হয়ে যায়। দীর্ঘ প্রায় ১০ বৎসরে ১৯৫৯-৬০ ইং বাঁধ নির্মাণ করা সমাপ্ত করা হয়।

এই কর্ণফুলী বাঁধের ফলে প্রায় ১৮০০০ (আঠার হাজার) পরিবার ও প্রায় ১,৫০,০০০ লোক উদ্ধাস্ত হন। উহার মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০% ভাগ লোক উপজাতি। ঐ উদ্ধাস্তদের প্রায় ৫৫,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) একর চাষাবাদযোগ্য জমি জলমগ্ন হয় এবং আরো প্রায় ১,১০,০০০ (এক লক্ষ দশ হাজার) একর অনুচ্চ জুম ও আবাদযোগ্য পাহাড় পানিতে ডুবে যায়। ইহা ছাড়া পাহাড়ীদের প্রায় ৩০০ বৎসরে গড়ে তোলা ঘর বাড়ী কিয়ৎ, মন্দির, স্কুল সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়। সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের শতকরা ৪০% ভাগ লোক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হন এবং সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আবাদী জমির শতকরা ৫০% ভাগ জমি এ বাঁধের পানিতে ডুবে যায়। সরকার সামান্য পরিমাণ মাত্র জমির ও গাছ বাঁশ এবং বাড়ী ঘরের ক্ষতি পূরণ দেন। ক্ষতি পূরণ ধার্য করা হয় প্রথম শ্রেণী জমি প্রতি একর ৫০০/৬০০ টাকা দ্বিতীয় শ্রেণী জমি একর প্রতি ৪০০/০০ টাকা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জমি একর প্রতি ৩০০/০০ টাকা। মাট্যা ঘরের প্রতিটি ৮০০/১০০০ টাকা বাঁশ ঘরের প্রতিটি ৪০০/৫০০ টাকা এবং একটা ফলন্ত আম লিচু, নারিকেল গাছ ১০/১৫ টাকা এবং অফলন্ত জাতি গাছ ১০ টাকা মাত্র ক্ষতি পূরণ প্রদানেও অপূরণীয় প্রতারণা করা হয় নিম্নতম ক্ষতি পূরণ দিয়ে সরকারী নির্দেশ পরিবারে যত একর জমি বন্দোবস্তী থাকুক না কেন উদ্ধাস্ত পরিবারে জনপ্রতি এক একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হবে এবং পরিবারে পূর্ব বন্দোবস্তীকৃত জমির অধিক নয়। ফলে ২০/৩০ একর জমির মালিকদের মাত্র জনপ্রতি এক একর অর্থাৎ ৫/৬ একর এর অধিক কোন পরিবার জমি বরাদ্দ পাননি।

উদ্ধাস্ত পরিবারদের সাধারণতঃ কাচালং রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকা মারিশ্যায় (বর্তমানে বাঘাইছড়ি থানা), আপার চেঙ্গি ভেলী, মাইনী ভেলী ও ফেনী ভেলী (রামগড়, মাটিরাজা, আসলং প্রভৃতি) এবং মাতামহরী ভেলী ফাস্যাখালী প্রভৃতি এলাকায় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। উদ্ধাস্ত এলাকা থেকে ঐ সব এলাকা শতাধিক

মাইলের দূরে অবস্থিত। সরকার পরিবহনের বা যাতায়াতের কোন ব্যবস্থা না করায়, উদ্বাস্তু পরিবারগুলির যাতায়াত ও পুনর্বাসন নিতে প্রাপ্ত ক্ষতি পূরণের টাকা শেষ হয়ে যায়। নতুন স্থানে গিয়ে জমি জমা আবাদে ও ফসল ফলাতে ৬ থেকে ৯ মাস সময় দরকার। ঐ সময়ে ভরণ পোষণ করতে অবশিষ্ট টাকাও প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। এভাবে বহু পরিবার দারুণ আর্থিক কষ্টে পড়ে যান। দ্বিতীয়তঃ নতুন জায়গা জমি, অনাবাদী, বিষাক্ত পোকা মাকড়, মশার উপদ্রব খুবই তীব্রতর ছিল। রোগ শোক লেগেই ছিল। সরকার উপযুক্ত জন-স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, মেডিকেল এইড প্রভৃতি করতে পারেননি বা করেননি। ফলে শত শত শিশু মাতৃজাতি ও বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মৃত্যুবরণ করেন এবং উদ্বাস্তু পরিবারকে কাঙালে পরিণত করে ফেলেন। এভাবে শুধু মারিশ্যায় কয়েক হাজার শিশু ও লোকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সরকার কোথাও সঠিকভাবে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে পারেননি। বিশেষতঃ আপার চেঙ্গি ভেলী, মাইনী ভেলী ও রামগড় এলাকায় পুনর্বাসিত উদ্বাস্তুরা সরকারের নীতিমালায় নির্ধারিত জমিও বরাদ্দ না পেয়ে পুনর্বাসিত এলাকা ত্যাগ করে কেহ কেহ নিজ উদ্বাস্তু এলাকাতে ফিরে যান, কেহ কেহ ফরেস্ট ভিলেজ এলাকায় আশ্রয় নেন, কেহ কেহ সুদূর বার্মা সীমান্ত এলাকা ঠেঙ্গা বগা, থানচি, মধু, ছোট মধু চলে যান এবং কেহ কেহ রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান টাউন এলাকায় বা গ্রাম দেশের নিকট দূর-আত্মীয়দের আশ্রয়ে যান। এভাবে সরকারের ১৯৬০ সনের পুনর্বাসন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা প্রায় ভেঙ্গে যায় ১৯৬১-৬২ইং সনে। ইতিমধ্যে ১৯৬১-৬২ ইং সনে কাচালং পুনর্বাসন এলাকা মারিশ্যায় সরকারের আর এক দুর্দিন ও দুর্যোগ এসে যায়।

কাচালং ফরেস্ট এলাকা মারিশ্যায় সরকারী জরিপ অনুযায়ী সকল সমতল ভূমি সমুদ্র হতে ১২০ ফুট উপরে অবস্থিত মূল্যায়ন করে সরকার ঐ এলাকায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে আইনানুগ অধিকরণ করেন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেন ১৯৬০ ইং সনে। কাঙাই বাঁধ ১২০ ফুট উঁচু হলেও কোন দিন ১১০ ফুটের উপরে বাঁধের জল যাবে না এবং মারিশ্যায় জমি ও বাঁধে বা বন্যার জলে ডুবে না, এই ছিল সরকারের ঘোষণা ও মতামত। কিন্তু ১৯৬১-৬২ ইং সনে কাঙাই বাঁধের জল যখন ১০০ ফুট উঁচুতে রাখা হল, মারিশ্যায় প্রায় শতকরা ৬০-৭০% ভাগ জমি ও ধানের ক্ষেত জলের তলায় চলে গেল। শুধু জমি ও ক্ষেত নয় ঐ জমিতে তৈরী ঘর বাড়ীও ডুবে গেল। উদ্বাস্তুরা ও সরকার বিপদে পড়ে গেলেন কিভাবে এতগুলি লোককে বাঁচানো যায়। দেখা গেল, সমতল জমিগুলি প্রায় ৯০ ফুটের নিচে এবং অনুচ্চ পাহাড়গুলিও ১১০ ফুটের নিচে। সেই বৎসর উদ্বাস্তুরা ভাতে অনেক কষ্ট পায়, বাঁশ, গাছ, কর্তন করে বিক্রয় করে অনেক পরিবার প্রাণ রক্ষা করে। ফলে ১৯৬২-৬৩ইং সনে উদ্বাস্তুরা জমি চাষ না করে পুনর্বাসন এলাকায়ও কেহ কেহ রিজার্ভ ফরেস্ট কর্তন করে জুম চাষ আরম্ভ করে দেন। এতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট হাজার হাজার ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফরেস্ট মামলা দায়ের করে দেন। তখন বাঘাইছড়ি থানা ছিল রামগড় সাব ডিভিশনের

অন্তর্ভুক্ত। সকল বাদী বিবাদীকে রামগড় এস,ডি,ও কোর্টে হাজিরা দিতে হতো। ইতিমধ্যে সরকার ঘোষণা দিল ফরেস্ট এলাকায় ও নিকটস্থ ফরেস্ট এলাকায় কেহ জুম চাষ করতে পারবে না। এভাবে ১৯৬৩-৬৪ ইং সন এসে গেলো। উদ্বাস্তরা এইরূপ পরিস্থিতিতে কিভাবে বাঁচবে দিশেহারা হয়ে গেল। চাষের জমি জলের তলায় যায়। পাহাড় জুম চাষ করা যাবে না। এদিকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নির্ধাতন মামলায় হয়রানি। (লেখক নিজেই ইহার সাক্ষী তখন পুনর্বাসন বিভাগে এসিসটেন্ট ওয়েল ফেয়ার অফিসার হিসাবে চাকুরীরত (১৯৬১-৬৯ ইং)।

মানুষ মরার চেষ্টা করলেও মরতে পারে না।। বেঁচে থাকার একটা না একটা পথ এসে যায়। ভারত সরকার পাকিস্তান সরকারকে ঘায়েল করার জন্য দেশে বিদেশে হয়ে প্রতিপন্ন করার জন্য ভারত সীমান্তে মিজোরামের, মার, দেমাঘাটে এবং ত্রিপুরা স্টেটে সাক্রং শীলছড়াতে কয়েকটি শরণার্থী ক্যাম্প খুলে দিয়ে ভাত-পানি রসদ যোগান দিয়ে বসে রইল কবে পার্বত্য চট্টগ্রামের নির্ধাতিত উপজাতীয়রা তার কাছে যাবে। ইতিমধ্যে খবরাখবর হয়ে গেল, ভারত সরকার নির্ধাতিত পাহাড়ীদের জন্য ভাত পানি নিয়ে বসে আছে। উদ্বাস্তরা এই সুবর্ণ সুযোগ মাথা পেতে নিল। এই সুযোগ ও খবর চারিদিকে চুপে চুপে রাষ্ট্র হয়ে গেল হাজার হাজার উপজাতি বিশেষতঃ মারিশ্যা, রামগড়, মাটিরাঙ্গা, ফেনী, পানছড়ি, মাইনি, মেরুং থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে গেলেন। ভারত সরকার ঠিকমত খেলায় খেললো এবং জাতিসংঘে নালিশ দিল যে পাকিস্তান সরকারের অত্যাচারে টিকতে না পেরে হাজার হাজার পাহাড়ী ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারত সরকার এই উপজাতীয়দের সেখানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন। ইহাতে পাকিস্তান সরকারের টনক নড়লো। দেশ ত্যাগীদের ফিরে আনার জন্য গোপনে দূত প্রেরণ করলেন। কেহ দেশে ফিরলেন না, বরং আরো দিন দিন দেশ ত্যাগ করতে লাগলেন। সরকার প্রমাদ গণলেন। একমাত্র প্রশাসনিক চাকমা অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট মি. শরদিন্দু শেখর চাকমা অবঃ অতিঃ সচিব ও রাষ্ট্রদূত মহোদয়কে মারিশ্যায় লোক বুঝানোর জন্য সপরিবারে পোষ্টিং দিলেন সরকার এবং চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়কে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করতে থাকেন। ইতিমধ্যে প্রায় ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) চাকমা ও পাহাড়ী দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যান এবং ভারত সরকার চাকমাদের নেফাতে অরুণাচল প্রদেশে পুনর্বাসন দিয়ে দেন। চাকমা ও পাহাড়ীদের দেশ ত্যাগের হার একটু কমে আসলো। ভারত সরকার 'দেশ ত্যাগীদের' দিয়ে জাতিসংঘে নালিশ দায়ের করেন পাকিস্তান পাহাড়ীদের নির্ধাতন করা হচ্ছে বলে। ১৯৬৪ ইং পাকিস্তান সরকার ঊনবিংশতম জাতিসংঘ অধিবেশনে চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় কে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন ঐ বিষয়ে জবাব দিহি করতে। এভাবে আমরা প্রায় ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) জাতি ও জাতিকে হারালাম ১৯৬৪ ইং সনে, যেই ভাবে বার্মায় ১৩৩৩-৩৪ ইং খৃষ্টাব্দে হারিয়ে ছিলাম চাকমা রাজার পরাজয় ও রাজধানী মইনসাংগিরি পতনের মাধ্যমে এক বির্রাট

দল ও আত্মীয়দেরকে। যারা এখন আরাকানে চাকমা নাম পরিবর্তন করে দৈংনাক নাম দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে নিজের অস্তিত্ব। তারা এখনও নিজেদেরকে চাকমা মনে করেন এবং আরাকানিজ ও বার্মিজরা তাদেরকে দৈংনাক বলে থাকেন। (১৯৯৭ ইং সনের ২৬শে নভেম্বর লেখক নিজেরাই বুসিতং (আরাকান) এ দৈংনাকদের সাথে কথা বার্তা বলেন। যাদের লোক সংখ্যা এখন প্রায় লক্ষাধিক।

যত অত্যাচার তত প্রতিরোধ। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকজন বিশেষতঃ চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যাগণ বেঁচে থাকার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেন। তারা চিন্তা করলেন যে, শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া এই প্রতিরোধ দেওয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা ও অর্থ ছাড়া কোন জাতি সবল ভাবে বাঁচতে পারে না। ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের লোকেরা প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের উন্নয়ন-উন্নয়নের দশক ১৯৫৮ ইং থেকে ১৯৬৮ ইং সন কে খুবই কাজে লাগাতে চেষ্টা করেন। কর্ণফুলী পুনর্বাসন ব্যর্থ হওয়ায় এবং ৪০/৫০ হাজার লোক দেশ ত্যাগ করায় সরকার পাহাড়ীদের উপর একটু নমনীয় ভাব পোষণ করতে থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ১৭৯টি প্রাথমিক স্কুল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম ৬০০টি প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করতে উন্নয়ন দশকে সরকারী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক হাই স্কুল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উপজাতীয়রা শিক্ষায় পশ্চাত্তপদ বিবেচনা করে যে কোন উপজাতি নারী পুরুষ অষ্টম শ্রেণী পাশ করলে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষক নিয়োগ দেওয়ার সরকারী সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সনে অনন্ত বিহারী খীসা ও মৃনাল কান্তি চাকমার নেতৃত্বে হিল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন, ১৯৬৭ ইং সনে চট্টগ্রামে মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মার এর নেতৃত্বে ট্রাইবেল স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন গঠিত হয় ও রাজ্যমাটিতে ঐ সংগঠনের শাখা পাহাড়ী ছাত্র সমিতি গঠিত হয়। ১৯৬৬ ইং সনে অনন্ত বিহারী খীসা ও জ্যোতিরিন্দ্র বোধিশ্রিয় লার্মার নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতীয় কল্যাণ সমিতি গঠন করা হয়। এই সংগঠনগুলি জনগণ, বুদ্ধিজীবী ও ছাত্র সমাজকে সংগঠন, পরিচালনা ও নেতৃত্ব দিতে থাকে। তাদের প্রচার, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনায় সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম ১৯৫১ ইং থেকে ১৯৭০ ইং সনে প্রায় ২০টি নতুন হাই স্কুল স্থাপিত হয় এবং উহার মধ্যে ১০টি হাই স্কুল চাকমা সার্কেল ও চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চলে স্থাপিত হয়। ১৯৬৫ ইং রাজ্যমাটিতে একটা কলেজ স্থাপিত হয়। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষতঃ চাকমা সার্কেলে চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যারা শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেন। সরকারের প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তা বহু সংখ্যক উপজাতি বিশেষতঃ চাকমা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বে-সরকারী সংস্থায় চাকুরীতে নিয়োগ পান ১৯৬০-১৯৭০ ইং সনের মধ্যে। ১৯৬১ ইং সনে মি. শরদিন্দু শেখর চাকমা, ১৯৬৮ ইং সনের মি. চিত্ত রঞ্জন চাকমা, ১৯৬৯ ইং সনে মি. যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা ও ১৯৭০ ইং সনে মি. তারা চরণ চাকমা ইপিএস পাশ করে প্রশাসনে ঢুকে যান। এদের মধ্যে মি. শরদিন্দু

শেখর চাকমা ও মি. তারা চরণ চাকমা অতিরিক্ত সচিব এবং চিত্তরঞ্জন চাকমা ও যতীন্দ্র প্রসাদ তঞ্চঙ্গ্যা যুগ্ম-সচিব হন। ১৯৬২ ইং মি. বিপরী চাকমা সিএসপি পরীক্ষা দিয়ে সি এস এস সার্ভিসে যোগদান করার সুযোগ পান এবং অডিটর-জেনারেল পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। সাধারণ জরিপে দেখা যায় যে, ১৯৭১ ইং সনে চাকমারা ২৬২৮ জন মেট্রিক (২৮জন মহিলাসহ) ১১২ জন গ্র্যাজুয়েট (১১ জন মহিলা সহ) ৩৫ জন মাস্টার্স (৪জন মহিলা সহ) পাশ করেন এবং ঐ সন পর্যন্ত ১৬ ডাক্তার, ৫২ জন ইঞ্জিনিয়ার, ১৬ জন ভেটরিনারী সার্জন, ৬ জন কৃষিবিদ (বিএমসিএজি) পাশ করেছেন এবং ছোট বড় (গেজেটেড নন গেজেটেড) প্রায় ১০৪০ জন চাকমা সরকারী চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন। এভাবে ১৯৭১ ইং সনেই চাকমারা নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করার পটভূমি গড়ে তোলেন। বর্তমানে আরো অনেক এগিয়ে গেছেন।

১৯৭১ ইং সনে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ ও উপজাতীদের খুবই বিতর্কিত ও টানা পোড়নে ফেলে দেয়। ১৯৭০ ইং সনের পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পার্টি একক সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করে ও দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খাঁন শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠনে, গড়িমসি আরম্ভ করে দেন এবং ১৯৭১ ইং সনের ২৫শে মার্চ আলোচনা বৈঠক ব্যর্থ হয়ে বাঙ্গালী সৈনিক, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও বুদ্ধিজীবীদের উপর রাড্রে অতর্কিতে সেনা বাহিনী দিয়ে আক্রমণ, নির্যাতন, হত্যা আরম্ভ করে দেন, তখন মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ লেগে যায় প্রথমতঃ শহর অঞ্চলে ঢাকা চট্টগ্রামে এবং পরবর্তীতে সমগ্র বাংলাদেশ। সেই যুদ্ধের ডেউ রাঙ্গামাটিতেও এসে যায় ১৯৭১ইং সনের মার্চের শেষে এবং এপ্রিল এর ১ম ভাগে। পাক বাহিনী তখন পর্যন্ত চন্দ্রঘোনা কাপ্তাই পৌঁছে নাই। মদনা হাটে যুদ্ধ চলতেছে পাক বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর মধ্যে। ডিসি জনাব এইচটি ইমাম তখন রাঙ্গামাটিতে মুক্তি বাহিনীর প্রধান পরিচালক। গতি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বাঙ্গালী, চাকমা, ত্রিপুরা, মার্মা সকলে মুক্তি বাহিনীকে স্পষ্টভাবে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসেন রসদ সরবরাহ সংযোগ প্রভৃতির কাজে। প্রাসঙ্গিক সংসদ সদস্য মোঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা তার দল ও কর্মীদের মুক্তি যুদ্ধে সার্বিক সহায়তা দান করার নির্দেশ দেন। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় জাতীয় সংসদ সদস্য তার বাহিনী কার্বারী, হেডম্যানদের মুক্তি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন।

ইতিমধ্যে এক অভাবনীয় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে কতিপয় স্বার্থান্বেষী নেতৃ স্থানীয় বাঙ্গালী যুবক, চাকমা, মার্মা ছেলেদের সাংসদ মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মার প্রেরিত ভলিন্টিয়ারদের নানা তাচ্ছিল্য ভাষায় গালাগাল দিয়ে রসদ সরবরাহ কেন্দ্র থেকে তাড়িয়ে দেয় এবং ডেমী রাইফেল ট্রেনিং সেন্টার থেকে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। ছেলেরা মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মার কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেন। মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ক্ষোভে দুঃখে কোন জবাব দেননি। ২/১ দিনের মধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। পাক বাহিনী চন্দ্রঘোনা

কাণ্ডাই দখল করে নেন এবং রাঙ্গামাটি সদর আক্রমণ করার প্রস্তুতি নিতেছেন অবস্থা বুঝে ডিসি এইচটি ইমাম ও আরো কতিপয় সরকারী কর্মচারী গোপনে রাঙ্গামাটি ত্যাগ করে রামগড় হয়ে আগরতলা পলাইয়া যান। তখন ডিসি কার্যালয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হযরত আলী ও সহকারী কমিশনার জনাব আবদুল মোমেন চৌধুরী প্রমাদ গণলেন কি করা যায়। পাক বাহিনী রাঙ্গামাটি পৌছলে মৃত্যু অবধারিত। তারা দুইজনে এক মহা মরণ-বাঁচন উপায় বের করলেন। তারা দুইজনে চাকমা রাজা ত্রিদিব এর কাছে গেলেন এবং রাজাকে হাতে পায়ে ধরে রাজী করালেন, উপায় নাই, চলুন, আপনি সহ আমরা কাণ্ডাই গিয়ে পাক বাহিনীকে সম্মান দিয়ে ডেকে নিয়ে আসি। অনেক চিন্তা করে নিরীহ মানুষ, রাঙ্গামাটির মানুষদের বাঁচানোর লক্ষ্যে রাজা ত্রিদিব রায় এই প্রস্তাবে রাজী হয়ে গেলেন। যেই দিন রাজা মহোদয় মিঃ চৌধুরী ও হযরত আলী পাক বাহিনীকে অভ্যর্থনা করে ডাকতে যান। সেই দিনই পাক বাহিনীর পরিকল্পনা ছিল বিকাল সন্ধ্যা থেকে প্রথম তবলছড়ি কর্ণার থেকে সমগ্র রাঙ্গামাটিতে বোমা বর্ষণ, অগ্নি সংযোগ ও আক্রমণ চালনার। এই তিন জনের পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত বিনা যুদ্ধে অক্ষত অবস্থায় রাঙ্গামাটি রক্ষা পেলো। ধীরে ধীরে পাক বাহিনী সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান (বাংলাদেশ) পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দখল করে নিল।

মুক্তি বাহিনী পশ্চাৎ অপসারণ করে প্রায় সকলে ভারতে চলে যান এবং নতুন ভাবে আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। ভারতে মুক্তি বাহিনী অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং সমগ্র বাংলাদেশকে এগার ভাগে বিভক্ত করে ১১ সেক্টরে ১১ জন সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করে আক্রমণ শুরু করে দেন। এই ‘মুক্তিযুদ্ধে’ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয়। যথেষ্ট সংখ্যক চাকমা, মার্মা দেশে যেমন লেঃ কর্ণেল মনিষ দেওয়ান (চাকমা), হেডম্যান করুণা মোহন চাকমা, সিনিয়র উপ-সচিব মিঃ অকগজাই (মার্মা) সহ বহু উপজাতীয় দেশে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও বাঙ্গালীদের অমনীয় মনোভাবের কারণে সর্বস্তরের উপজাতীয় ছেলেরা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভোগে মুক্তি যুদ্ধে যাননি এবং পাক বাহিনী প্ররোচনায় অনেক উপজাতীয় দেশে রাজাকার, সিভিল ফোর্সে যোগদান করার ইচ্ছা পোষণ করেন কিন্তু পাক বাহিনীর প্রচারণা ও ঝুঁকিত নীতির কারণে বেশী সংখ্যক উপজাতীয় দেশে আর্মস গ্রুপে যোগদান করতে পারেননি। বুদ্ধিমান সাংসদ মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা পাক বাহিনী তাকে ব্যবহার করার আগেই আত্মগোপন করেন এবং গ্রামাঞ্চলে চলে যান।

১৬ই ডিসেম্বর/১৯৭১ইং তারিখ পাক বাহিনী ঢাকায় মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে গেল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কতিপয় বাঙ্গালীসহ রাজা ত্রিদিব রায় এর নাগরিকত্ব বাতিল করে দেওয়া হয়। তিনি আর দেশে ফিরতে পারলেন না অথচ স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও যাবতীয় আত্মীয় বাংলাদেশে রয়ে গেলেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো রাজা ত্রিদিব রায় কে পাকিস্তানে পর্যটন মন্ত্রী পদে নিয়োগ করেন এবং পরে আর্জেন্টিনায় রাজা ত্রিদিব রায়কে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেন। তিনি পাকিস্তানে ফিরে যান। রাজা ত্রিদিব রায় এর ৩ স্ত্রী প্রথম রানী

আরতি রায় তার গর্ভে (১) রাজ কুমারী চন্দ্রা রায় (২) রাজা দেবশীষ রায় (৩) কুমার শিবশীষ রায় (৪) কুমার ইন্দ্রশীষ রায় (৫) রাজ কুমারী ত্রিবেণী রায়, ২য় রানী অঞ্জলী রায় তার গর্ভে (৬) চাঁদ রায় বি, এ (অনার্স) (৭) রাজ কুমারী পিয়া রায়, ৩য় রানী মারটিং কুয়েন ট্রিক রায় তার গর্ভে (৭) কুমার পদ্ম সম্ভব ওয়েনহেল রায় জন্ম গ্রহণ করেন।

রাজা ত্রিদিব রায় ছাত্র জীবনে লেখালেখি আরম্ভ করে দেন। নাট্যকার ও বাকযুদ্ধ (বিতর্ক প্রতিযোগিতা) সুসম্পন্নের জন্য স্কুল জীবনে তিনি পুরস্কৃত হন। তিনি ক্রিকেট, ফুটবল ও হকিতে ভাল খেলোয়ার ছিলেন এবং ছাত্র জীবনেই এথলেটিক্স এ চ্যাম্পিয়নশীপ অর্জন করেন। তিনি সমাজের প্রাচীন সংস্কার, নিয়মনীতি ও প্রচলিত প্রথাগুলি রক্ষার জন্য বিশেষ যত্ন ও আগ্রহশীল। তার অভিমত প্রাচীন জাতির রক্ষণশীল প্রথাগুলি এতদিন জাতিকে রক্ষা করে এসেছে। জাতি ও সমাজকে রক্ষা করার জন্য তিনি বুদ্ধিজীবী, শিক্ষিত সমাজ ও নব প্রজন্মকে প্রাচীন জাতির প্রথাগুলি প্রয়োজনে সংস্কার করে রক্ষা করার আহ্বান জানান। তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি রক্ষা সম্পর্কে বিশেষ সচেতন ও গুরুত্ব দেন। তিনি বার্মায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধর্ম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ত্রিপিটক বিশারদ শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো মহোদয়কে তার ‘রাজ বিহারে’ রাজগুরু হিসাবে বরণ করে নিয়েছিলেন। তিনি সৎ সাহসী, কর্মবীর, দয়ালু ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন।

তিনি দীর্ঘদিন দেশ স্বাধীন হওয়াবধি বিদেশে পাকিস্তানে অবস্থান করে মন্ত্রীভূগিরি ও রাষ্ট্রদূতগিরি করে সেখানে অবসর জীবন যাপন করতেন। তার স্ত্রীপুত্র সকল আত্মীয় বাংলাদেশে বসবাস করেন। ১৯৯০ইং সনে তার মাতার মৃত্যু হলে তিনি সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান মতে ভারতের বুদ্ধ গয়ায় এসে “পিণ্ড-দান” ও “সংঘদান” করতে সফরে এসেছিলেন। সফরের শেষে তিনি কলিকাতায় আসলে স্টেটমেন্ট পত্রিকার সাংবাদিকের কবলে পড়ে যান। সাংবাদিকরা তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি স্বদেশে ফিরবেন কিনা? জাতি ও দেশের জন্য মায়া হয় কিনা? তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি ও পরিবেশ উন্নতি হলে তিনি দেশে ফিরার আশা রাখেন এবং জাতি ও দেশ পিতৃ ও মাতৃ সমান। জনগণ ও দেশের মানুষের প্রশ্ন এই পরিস্থিতি ও পরিবেশ কবে উন্নত হবে? একদিন কি সত্যই রাজা ত্রিদিব দেশে ফিরবেন? তৎপরবর্তীকালে রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানে Ambassador ছিলেন পরে Federal Minister without post-folio পদে নিযুক্ত ছিলেন। মন্ত্রী থাকাকালীন তিনি ২০১৩ সনে পরলোক গমন করেন।

৭ম অধ্যায়
৫। রাজা দেবাশীষ রায়
(১৯৭৭-২০১৪ খ্রিষ্টাব্দ-০)

রাজা দেবাশীষ রায় ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর ৫ম রাজা এবং স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম চাকমা রাজা। রাজা ত্রিদিব রায়ের ১ম স্ত্রী রানী আরতি রায়ের গর্ভে রাজা দেবাশীষ রায় ১৯৫৯ইং সনের ১০/০৪/৫৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। ভাবী রাজা কুমার দেবাশীষের জন্মে চাকমা রাজ্য বাড়ীতে খুশীর বন্যা বয়ে যায়। সকল বুড়া-বুড়ী, গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজন কুমার দেবাশীষকে অন্তরের সহিত আশীর্বাদ প্রদান করেন। কুমার দেবাশীষ এর জন্মের পর পর চাকমা রাজ্য ও চাকমা জাতির উপর বিরাট একটা আঘাত ও বিপদ এসে যায়। উপজাতি তথা চাকমাদের আর্থিক বুনিয়াদ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে ধ্বংস করার লক্ষ্যে সরকার কর্ণফুলী নদীতে আরো উপযুক্ত বাঁধ দেওয়ার জায়গা বিদ্যমান থাকলেও কাঙাই নামক স্থানে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন করার অজুহাতে বিরাট বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ করে ১৯৫৯-৬০ইং সনে সমাপ্ত করেন। ফলে প্রায় ১,৫০,০০০ লোক উদ্বাস্ত হয়ে পড়েন এবং প্রায় ৫৫,০০০ একর সমতল ভূমি ও ১,১০,০০০ একর আনুমানিক পাহাড় জমি জলমগ্ন হয়ে যায়। ইহাতে শতকরা ৪০% ভাগ পাহাড়ী ও চাকমা পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হন।

চাকমা রাজার 'রাজ প্রাসাদ', বিরাট মন্দির, কিয়াং ও রাজ মহলের কার্যালয় সমূহ প্রায় চাকমা রাজার হাজার একরের অধিক জমি জলমগ্ন হয়ে যায়। রাজা ত্রিদিব রায় ১৯৬০ইং সনে নিউ রাঙ্গামাটি শহরের উত্তর প্রান্তে কালিন্দীপুর নামক স্থানে সামান্যতম রাজ প্রাসাদ অফিস, মন্দির ও কিয়াং নির্মাণ করে পুনর্বাসন গ্রহণ করেন। এদিকে কুমার দেবাশীষ শশীকলার মত ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন। রাজ প্রাসাদেই কুমার দেবাশীষের হাতে খড়ি 'লিখা পড়া' শিক্ষা আরম্ভ হয়। একটু বড় হয়ে উঠলে তাকে চট্টগ্রাম শহরের খৃষ্টিয়ান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত ইংলিশ স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়।

১৯৬৯ইং সনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আয়ুব খানের উন্নয়ন দশক শেষ হয়ে যায় এবং সারা দেশে আন্দোলনের মধ্যে আয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদে পদ-ত্যাগ করে জেনারেল প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেশের শাসন প্রণালী কিছুটা পরিবর্তন করে দেশে সাধারণ নির্বাচন দিবেন ঘোষণা করায় দেশে কিছুটা শান্তি ফিরে আসে। ১৯৭০ইং সনে সারা পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন এর তারিখ ও তফসিল ঘোষণা করা হল। পার্বত্য চট্টগ্রাম লইয়া একটা কেন্দ্রীয় আসন-৩০০ নির্ধারিত হল এবং প্রাদেশিক পরিষদ দুই আসন- ২৯৯ ও ৩০০ নির্ধারিত হল। কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদে রাজা

ত্রিদিব রায় ও প্রাদেশিক পরিষদে মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা- ২৯৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয় লাভ করেন। সারা পাকিস্তানে ও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ পার্টি সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। আইনত: ও সংবিধান অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানকে সরকার গঠন দিতে হয়। দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে মুজিবুর রহমানের সরকার গঠন দিতে হয়। দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে সরকার গঠন করতে না দিয়ে গড়িমসি আরম্ভ করে দেন। সারা দেশে ভয়াবহ আন্দোলন দেখা দেয়। ফলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মার্চের/১৯৭১ শেষ ভাগে ঢাকায় গোল টেবিল বৈঠক ডাকেন সকল নির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে। এই বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায় এবং ২৫শে মার্চ/১৯৭১ইং তারিখ রাত্রে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং ঐ দিনই ঢাকার যাবতীয় বুদ্ধিজীবী, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমন্ডলী জ্ঞানী-গুণী মানুষের উপর, পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারী, পুলিশ, আনসার প্রভৃতি এর উপর অতর্কিতে হামলা, হত্যা, জখম ও নিদারুণ অত্যাচার আরম্ভ হয়। পূর্ব বাংলার জনগণ এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করলেন না। প্রতিরোধ আরম্ভ করে দেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ লেগে যায়। এই যুদ্ধের ডেউ পার্বত্য চট্টগ্রামেও এসে যায়। দেশী-বিদেশী নানা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে রাজা ত্রিদিব রায় ও সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা এই মুক্তি যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করে নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন। পরবর্তীতে পাক সরকার রাজা ত্রিদিব রায়কে অঘোষিত বন্দী করে রাখলেন। সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা সাময়িকভাবে 'আত্ম গোপন' করলেন। পরে পাক সরকার রাজা ত্রিদিব রায়কে অনেকটা অনিচ্ছাকৃতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যান এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বের বৌদ্ধ রাষ্ট্রগুলিতে প্রেরণ করেন। ৯ মাসের যুদ্ধে পাকিস্তান হার মানলেন এবং ১৬ই ডিসেম্বর/১৯৭১ তারিখ ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনীর কাছে পাক বাহিনী জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে আত্মসমর্পণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে 'আত্ম প্রকাশ' করল। দেশ স্বাধীন হয়ে গেল। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ফিরে আসলেন এবং দেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন। নূতন সরকার যারা মুক্তি যুদ্ধের বিরোধীতা অসহযোগিতা বা অন্তর্ঘাত মূলক কাজ করেছেন অথবা বিদেশে অবস্থান করেও বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য স্বীকার করেননি। এইরূপ জনাব নূরুল আমিন, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আসাদুস জামান, রাজা ত্রিদিব রায় সহ প্রায় ৩৯জন বাংলাদেশের বিভিন্ন পর্যায়ের কূটনৈতিক, বিশিষ্ট ব্যক্তি এর নাগরিকত্ব সরকার বাতিল করে দেন। এভাবে দেশ স্বাধীন হলেও রাজা ত্রিদিব রায় আর দেশে ফিরলেন না।

পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের বিশেষতঃ উপজাতীয় লোকদের চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, মুরুং প্রভৃতিসহ প্রায় ১২/১৩ বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতীয়দের



রাজ দেবশীষ রায়
১৯৭৭-২০১৪.....



চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবশীষ রায়, রানী ভাতু রায় (বর্তমানে প্রয়াত) ও কুমার ত্রিভুবন আর্য়দেব রায়

স্বাধীনতা প্রাক্কালে বার বার ১৯৪৭ইং সন ও ১৯৭১ইং সনে বিভিন্ন কারণে ও অজুহাতে সরকার পক্ষের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। ১৯৪৭ইং সনে উপমহাদেশ ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তানে উপজাতিরা প্রো-ইন্ডিয়ান এবং ১৯৭১ইং সনে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশের উপজাতিরা প্রো-পাকিস্তানী রূপে চিহ্নিত হন। আসলে উপজাতিরা কোন ‘দল ভুক্তই’ নন, তাদেরকে বিরুদ্ধবাদীদল ভুক্ত সাজিয়ে নাচানো হয়েছে। অত্যাচার করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে দেশী-বিদেশীর ষড়যন্ত্রে। উপজাতিরা প্রো-ইন্ডিয়ানও নন এবং প্রো-পাকিস্তানীও নন। কতিপয় স্বার্থান্বেষী ভারতের পক্ষে বা পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করলে সর্বস্তরের উপজাতিদেরকে বিরুদ্ধ বাদী চিহ্নিত করা ন্যায় সঙ্গত নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা আদিকাল থেকে এই অঞ্চলে বসবাস করে আসতেছেন। এই অঞ্চল এক সময় হিন্দু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত, একসময় মুসলমান নবাবের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিংশ শতাব্দীর ১৯৪৭ইং পর্যন্ত বৃটিশ সরকারের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৭১ইং পর্যন্ত পাকিস্তান সরকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা সর্বকালে উপজাতি ছিলেন এবং বাংলাদেশে এখনও উপজাতি রূপে আছেন। তাদেরকে জাতি বা অজাতি করতে গেলেই গোলমাল। তাদেরকে জাতি করতে গিয়ে তারা আরো একধাপ পিছে চলে যান। জুম্ম জাতি রূপে আত্ম প্রকাশ। সুতরাং তাদেরকে উপজাতি রূপে থাকতে দেওয়াই ভাল।

“গতস্য সূচনা নাস্তি”

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিদের বেলায় অতীতের নীতি ও প্রবচনটি বার বার অমঙ্গল ডেকে আনতেছে। ১৯৭১ইং সনে মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে উপজাতীয় লোকেরা দেশী-বিদেশী নানা ষড়যন্ত্রের কবলে পড়ে নেতা মুরুব্বীরা কোন সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে না পারায় কেহ কেহ মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেন। কিন্তু অধিকাংশ যুবক বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে পৌছতে না পেয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন এবং কেহ কেহ পাক বাহিনীর প্ররোচনায় রাজাকার সিভিল ফোর্সে যোগদান করলেন। এই দিকে পাক বাহিনী উপজাতীয় যুবকদের প্রতারণা করলেন সামান্য সংখ্যক লোক রাজাকার ও সিভিল ফোর্সে ভর্তি করে তাহা স্বগিত করে উপজাতীয় লোকদের একূল, ঐকূল দুই কূল গেল। মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ কিন্তু থেমে নেই। চারিদিকে যুদ্ধ আর যুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বহু রাষ্ট্র জড়িত হয়ে পড়েন। ভারত সরকার পূর্ব থেকে খুবই সতর্ক। যাতে পাক বাহিনী এক ইঞ্চিও ঢুকতে না পারে, দখল করতে না পারে। এভাবে যুদ্ধের পরিস্থিতি ও প্রকৃতি অগ্রসর হতে থাকে। অক্টোবর-নভেম্বর/৭১ মাসে বুঝা গেল। বাংলাদেশ অচিরেই স্বাধীন হবে। ভারতের চাকমারা বিশেষতঃ মিজোরাম, অরুণাচল ও আগরতলার চাকমারা, নেতৃবৃন্দরা হৃদয়োগ্রম করলেন যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বাংলাদেশের উপজাতিদের বিশেষতঃ চাকমাদের উপর ভীষণ বিপদ এসে যাবে। একেতো চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ চাকমা কেউ কেউ

রাজাকারে অংশ গ্রহণ করেছেন এবং বহু চাকমা যুবক নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন। মুক্তিবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকলেই সব চাকমা ‘কচু কাটা’ হয়ে যাবে। ভারতের চাকমারা জাতি ও জাতিকে রক্ষার জন্য নেতৃবৃন্দরা সকলে মিলে আগরতলা ও দিল্লীতে মিছিল করে স্মারকলিপি দাখিল করেন। বৌদ্ধ জাতি তিব্বতী বাহিনীকে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাঠান হউক। দাবী জানালেন অনেক যোগাযোগ ও দরবারে শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে মিত্র বাহিনীর সঙ্গে তিব্বতী বাহিনীও পাঠাতে সম্মত হলেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও পাকিস্তান সরকারের পূর্ব বাংলায় নরহত্যা, মানবাধিকার লংঘন প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ব জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে অক্টোবর-নভেম্বর/৭১ মাসে প্রথমে রাশিয়ায় পরে পাশ্চাত্যের বহুদেশসহ আমেরিকায় সফর করে এলেন এবং ভারতের পক্ষে বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে অনেকটা সাফল্যমণ্ডিত হন। এমতাবস্থায় ভারত সরকার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্ব প্রস্তুতি প্রায় সমাপ্ত করেন এবং পাকিস্তানের সকল সীমান্তে যুদ্ধ-অবস্থা সৃষ্টি করেন। পাকিস্তান মনে করেছিলেন, ১৯৬৫ইং সনের সেপ্টেম্বর যুদ্ধের মত নিমিষেই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মির ও পূর্ব সীমান্তে ত্রিপুরা রাজ্য ২/১ দিনের মধ্যে দখল করে নেবেন। ভারত সরকার পূর্ব থেকে খুবই সতর্ক। ১৯৭১ইং সনের ৩রা ডিসেম্বর রাত্রি ১১ ঘটিকায় হঠাৎ পাক বিমান বাহিনী দিল্লী, অমৃতসর ও শ্রীনগরসহ ৭টা টাউনে বোমা বর্ষণ করেন এবং ঐ রাত্রেই ৪টা ডিসেম্বর ১টায় ভারত বিমান বাহিনী রাওয়ালপিণ্ডি, ইসলামাবাদ, লাহোর, করাচিসহ ১১টা টাউনে প্রবল গোলা বর্ষণ করেন। এভাবে ১৯৭১ইং সনে পুনরায় পাক-ভারত যুদ্ধে বেঁধে যায়। ভারত প্রতিটি সীমান্তে শক্ত প্রতিরোধ দেয় এবং ২/৩ দিনের বিমান যুদ্ধে পাকিস্তানের সকল বিমান ও বিমান-ঘাটী ধ্বংস ও অকেজো করে দেন যাতে কোন বিমান আকাশে উঠতে না পারে। ইতিপূর্বেই ভারত সরকার তার আকাশ পথে উপর দিয়ে পাক বিমান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত সকল বিমানও ভূপাতিত করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা ও প্রতিরোধেরও কোন বিমান রইল না। ভারতের একটা বিরাট যুদ্ধ জাহাজ গায়েল হলেও পাকিস্তানের সকল সাব-মেরিন ও যুদ্ধ জাহাজগুলি অকেজো হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সীমান্তের যুদ্ধে ভারত অগ্রগামী হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বহু এলাকা ভারতের দখলে চলে যায়। এমতাবস্থায় ভারত সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের সকল সেক্টরে ও সীমান্তে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ স্থগিত ঘোষণা করে অধিকৃত স্থানগুলি ছেড়ে দেন কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ করা হয় নাই। এভাবে পূর্ব পাকিস্তানে নিয়োজিত পাক বাহিনী ১২/১৩ দিনের বেশী যুদ্ধ চালাতে পারলেন না। ১৬ই ডিসেম্বর/৭১ তারিখ জেনারেল নিয়াজি ৯৩,০০০ হাজার সৈন্যসহ ঢাকায় মিত্র বাহিনী (ভারতীয় সৈন্য) ও মুক্তি বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন হয়ে গেল।

১৬ই ডিসেম্বর/৭১ এর আগে ও পরে দলে দলে মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েন। কোন কোন স্থানে ১৬ই ডিসেম্বর/৭১ এর আগেই পাক-দখল মুক্ত হয়। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামেও মিত্র বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী দ্রুত ঢুকে পড়েন। “গতস্য সূচনা নাস্তি” প্রবচনের ক্রিয়া হিসাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র না হলেও কিছু কিছু জায়গায় মুক্তি বাহিনীরা পুরাতন মানসিকতার জের হিসাবে পাহাড়ীদের উপর বিশেষতঃ চাকমাদের উপর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে উঠেন। জনৈক মুক্তিবাহিনী অধিনায়ক পানছড়িতে এসে সকল উপজাতীয় লোকদের বিশেষতঃ চাকমাদের ডেকে এক জায়গায় জড় করে গুলি ও হত্যাযজ্ঞ চালাতে নির্দেশ দেন। এই হত্যাযজ্ঞে শুধু একটা পরিবারে সুপ্রিয় চাকমা এর বাড়ীতে ৪ জনসহ ৪৭ জন লোক নিহত হন। ৭০/৮০ জন লোক আহত হন এবং বেশ সংখ্যক লোক নিখোঁজ হন। এদের মধ্যে অনেক সংখ্যক লোক ফিরে আসলেও কিছু সংখ্যক লোক আর বাড়ীতে ফিরে আসেন নাই। তাদেরকেও নিহত সংখ্যাবুক্ত করা যায়। অবশ্য উহার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। এভাবে দীর্ঘদিনের পরেও নর হত্যা চালানো হয়। এতে ২ জন নিহত সহ ৩২জন গুরুতর আহত হন। অনেকের ঘরবাড়ী পুড়ে দেওয়া হয়। লংগদু থানায়ও ২ জন নিহতসহ বেশ কয়েকজন আহত ও রাঙ্গি পাড়া এলাকার ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মিত্র বাহিনী ও তিব্বতী বাহিনী তড়িৎ গতিতে উপরোক্ত উপদ্রুত জায়গায় গিয়ে উৎপীড়ন দমন করেন। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য জায়গায়ও বড় ঘটনা না হলেও মুক্তি বাহিনীর বহু অত্যাচার ও উৎপীড়নের খবর শুনা গিয়েছে। সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ মিঃ জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, মিঃ চাকু বিকাশ চাকমা, মিঃ অনন্ত বিহারী খীসা প্রমুখ এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মিত্র বাহিনী, তিব্বতী বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অনুরূপ ঘটনা আর ঘটেনি। ধীরে ধীরে দেশে শান্তি ও স্থিতি ফিরে আসে। শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পুনর্গঠিত ও ভারতে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন দেশে বিদেশের সাহায্য চেয়ে এবং দেশ শাসনের সুব্যবস্থা করতে থাকেন।

বাংলাদেশ আমলটা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় লোকদের সংগ্রামের যুগ, বেঁচে থাকার জন্য জীবন সংগ্রামের যুগ, যত অত্যাচার, তত প্রতিরোধ ও তত সংগ্রাম। পার্বত্য চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবী মহল শিক্ষিত সমাজ বুঝে নিলেন যে সংগ্রাম ছাড়া এ দেশে বেঁচে থাকা যাবে না। পরিস্থিতি ও স্তর ভেদে সংগ্রামের কৌশল ও পরিবর্তন করতে হবে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক সংগ্রাম ও অ-গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, সংগ্রাম করতে গেলে প্রকৃতি পর্ব ও সংগঠন দরকার। পাকিস্তান আমলের শেষ প্রান্তে ১৯৭০-৭১ইং সনে পাহাড়ীদের সংগঠন ও প্রকৃতি পর্বের সূচনা এবং অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা অগ্রগতি সম্পন্ন হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে যুব সমাজ ও নেতৃবৃন্দ তাদের নিজ নিজ সংগঠন সুদৃঢ় করতে কর্মক্ষেত্রে নেমে যান। এই সংগঠনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস চলে জন সমর্থন আদায়, সরকারের কাছে দাবী নামা পেশ, গণতান্ত্রিক আন্দোলন, প্রতিরোধ ও মুখামুখি।

উপরোক্ত প্রণালীতে রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৭২ইং সনের ২৯শে জানুয়ারী মিঃ চারু বিকাশ চাকমার নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ঢাকায় সাক্ষাৎ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আলোচনা করা হয় কিন্তু ইতিবাচক কিছুই সাড়া পাওয়া যায়নি। প্রতিনিধি সদস্যবৃন্দ :- (১) চারু বিকাশ চাকমা (২) মথুরা লাল চাকমা (৩) অশোকমিত্র চাকমা (৪) মংচানু চৌধুরী (৫) চিংহলাক্ষ চৌধুরী (৬) উক্যাজে মার্মা (৭) যতীন্দ্র লাল ত্রিপুরা।

মুক্তি যুদ্ধের অবসানের পরে মুক্তিবাহিনী কর্তৃক পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রতিহিংসা মূলক ঘটনা অবতারণার প্রেক্ষিতে ১৯৭২ইং সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মং রাজা মংফ সাইন এর নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট (মং রাজা, বোমাং রাজা, সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা, রাজমাতা বিনীতা রায়, কুমার কোকনদাক্ষ রায়, সুবিমল দেওয়ান ও এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা) একটি উপজাতীয় প্রতিনিধি দল প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় সাক্ষাৎ করতে যান কিন্তু প্রধানমন্ত্রী ঢাকার বাইরে থাকায় তারা সাক্ষাৎ করতে পারেননি। এই প্রতিনিধি দল আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ ৪ দফা দাবী সম্বলিত একটি স্মারকলিপি জনসংযোগ কর্মকর্তার কাছে দাখিল করে আসেন প্রধান মন্ত্রীর নিকট উপস্থাপনের জন্য। এতে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

সাংসদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির কাছে উপরোক্ত দাখিলকৃত স্মারকলিপির আলোকে ১৯৭২ইং সনের ২৪শে এপ্রিল লিখিতভাবে বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা দাবী আবেদন দাখিল করেন কিন্তু সংবিধান প্রণয়ন কমিটি তাহা অগ্রাহ্য করেন।

এভাবে বার বার প্রত্যাখ্যাত হয়ে সাংসদ মানবেন্দ্র লার্মা তার সহকর্মীদের ও পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু নেতা ও মুরূব্বীদের নিয়ে ১৯৭২ইং সনের ২৪শে জুন রাজ্যমাটি ইন্দ্রপুরী সিনেমা হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি নামে এক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এই সমিতির ৬০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রাক্তন এম, এল, এ মিঃ বীরেন্দ্র কিশোর রোয়াজা ও সাধারণ সম্পাদক মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা সর্ব সম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। এই সমিতির মাধ্যমে মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা পার্বত্য চট্টগ্রামে দৃঢ় সংগঠন ও বিরাট কর্মী বাহিনী গড়ে তোলেন। তারপর তিনি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করেন। মিঃ লার্মা পাহাড়ের উপর বাঙ্গালী ও সরকারী বাহিনীর নির্ধাতন, জুলুম ও অত্যাচার এর সাথে মোকাবেলা ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে আন্দোলনের দুইটি ভাগ করেন বাহিরের ফ্রন্ট ও ভিতরের ফ্রন্ট। বাহিরের ফ্রন্ট গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবে এবং ভিতরের ফ্রন্ট সশস্ত্র সংগ্রাম করবে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব নিজেই দিতে থাকেন এবং ভিতরের ফ্রন্টের দায়িত্ব দেন আপন ভাই মিঃ জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা (সন্ত) কে। পরবর্তীতে ভিতরের ফ্রন্ট শান্তিবাহিনী রূপে পরিচিত হয়ে পড়ে। ২য় ফ্রন্ট গঠিত হয় ১৯৭৩ইং সনে ৭ই জানুয়ারী।

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সরকার প্রধান বঙ্গবন্ধু প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও তার মন্ত্রী পরিষদ বিশ্ব ও দেশের পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের

ঘূণে ধরা অতীতের শাসন ব্যবস্থা, বৃটিশ সরকারের প্রবর্তিত আধাসামন্ত, আধা-ঔপনিবেশিক শোষণযোগ্য শাসন পদ্ধতি সরকার নিয়ন্ত্রিত শাসন প্রণালী রাজতন্ত্র ও রাজার শাসন মেনে নিলেন। বোমাং রাজা ও মং রাজা বিদ্যমান। শুধু চাকমা সার্কেলের রাজপদটা শূন্য। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার না করায়, অন্যান্যদের সঙ্গে রাজা ত্রিদিব রায়ের নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যাওয়ায় চাকমা সার্কেলের রাজপদ শূন্য হয়। তখন রাজা দেবাশীষ রায় এর বয়স মাত্র ১১/১২ বৎসরের বালক। আপাততঃ দেবাশীষ রায়কে রাজা অভিষিক্ত করা যাচ্ছে না।

প্রধান মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাক্তন সংসদ বিলুপ্ত করে ১৯৭৩ ইং সনে সাধারণ নির্বাচন (বাংলাদেশ গণপরিষদ ঘোষণা দেন। ১৯৭৩ইং সনের ১৬ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী সভায় রাজ্যমাটি স্টেডিয়ামে তার ভাষণে বলেন যে, সকল উপজাতির প্রমোশন, জাতিতে সামিল হউন। এ বক্তব্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং নির্বাচনের ফলাফলও আওয়ামী লীগের বিপক্ষে যায়।

চাকমা উপজাতির ঐতিহ্যবাহী রাজপদ পূরণের লক্ষ্যে এবং উপজাতিদের মনোবল ফিরে আনার জন্য তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আবদুল মালেক উকিল ১৯৭৩ইং সনে ৩০শে এপ্রিল সফরে আসলে রাজা ত্রিদিব রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র কুমার দেবাশীষ রায়কে চাকমা রাজা করার সরকারী সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা দেন এবং রাজা ত্রিদিব রায় এর ভাই কুমার সমিত রায় এম.এ কে কিশোর রাজা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত রাজ-প্রতিনিধি বা রিজেন্ট নিযুক্ত করা হয় এবং কুমার সমিত রায় কে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের দুইটি আসনে আসন নং- ২৯৯ (পার্বত্য চট্টগ্রাম-১) ও আসন নং- ৩০০ (পার্বত্য চট্টগ্রাম- ২) তে যথাক্রমে মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ও মিঃ চাইখোয়াই রোয়াজাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়। মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা আওয়ামী লীগ প্রার্থী কুমার সমিত রায়কে ও মিঃ চাইখোয়াই রোয়াজা, জাসদ প্রার্থী মিঃ উপেন্দ্র লাল চাকমাকে পরাজিত করে নির্বাচনে বিজয়ী হন। যথা সময়ে সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধান অনুমোদন করার প্রাক্কালে মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা সাংসদ মহোদয়কে সংবিধান বইতে স্বাক্ষর করতে অনুরোধ করলে সংবিধানে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন এর অধিকার লিপিবদ্ধ না থাকায় মিঃ লার্মা সংবিধানে স্বাক্ষর করেননি। ঐ সময় রাজ্যমাটি থেকে মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ান মহিলা সংরক্ষিত আসনে এমপি মনোনীত ও নিযুক্তি পান।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয় লোকদের উপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন হয় বলে অনুমিত হয়। ক্ষুদ্র জাতি সমূহ বৃহত্তর জাতি কর্তৃক বিভিন্ন উপায়ে বহু ক্ষেত্রে বঞ্চিত, অবহেলিত ও অত্যাচারিত হন বলে তিনি

হৃদয়োগ্রম করেন। প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখার জন্য ১৯৭৩ইং সনে শিক্ষা মন্ত্রী ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ দেন। এমপি সুদীপ্তা দেওয়ান ১৯৭৩ইং সনের ৬ই জুন প্রধান মন্ত্রীর সংসদ কক্ষে উপরোক্ত বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রধান মন্ত্রী এই বিষয়ে আশ্বাস দেন। সেই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবুর রহমান উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজে ৩টি, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে ২টি, ঢাকা প্রকৌশলী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২টি ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩টি, কৃষি কলেজে ২টি, পলিটেকনিকে ৫টি আসন সংরক্ষণ করার নির্দেশ দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী যুগ যুগ ব্যাপী অবহেলিত, বঞ্চিত ও পশ্চাৎপদ অবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্য একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠনের সিদ্ধান্ত নেন এবং মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত ১৯৭৩ইং সনের ১৯শে জুলাই সরকারী সফরে আসলে মন্ত্রীবর রাষ্ট্রাধিপতিতে এক সমাবেশে প্রধান মন্ত্রীর উক্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৈদেশিক বৃত্তি প্রদান করা হয় এবং ১৯৭৩ইং সন থেকে এই বৃত্তি মঞ্জুর করা আরম্ভ হয়। ১৯৭৩ইং সনের পর থেকে প্রতিবৎসর যথেষ্ট সংখ্যক উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীকে রাশিয়া, পোলাভ, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া, পূর্ব জার্মানী ও কিউবায় উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হয়।

চট্টগ্রাম ও ঢাকার উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস বরাদ্দ বা নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭৪ইং সনের ১১ই আগস্ট মন্ত্রী জনাব আবদুর রব সেরনিয়াবাত রাষ্ট্রাধিপতি এসে ৩ পর্যায়ে ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকার পার্বত্য চট্টগ্রাম বোর্ডের কর্মসূচী ঘোষণা করেন।

১৯৭৫ইং সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রাধিপতি সফর করতে এলে সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কে তার সরকারের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন এবং স্থানীয় সংসদ সদস্য, চীফগণ, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান কালে বলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীদের ধর্ম, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অবশ্যই রক্ষা করা হবে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে পুলিশ বাহিনীতে ৩শত ও রক্ষী বাহিনীতে ২শত যুবক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। ঐ দিনই তিনি স্থানীয় ছাত্রদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ২ লক্ষ টাকা ও সমবায় ভিত্তিতে গণ্য বাজারজাত করণের জন্য ১ লক্ষ টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা দেন।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হৃদয়োগ্রম করলেন যে, বাংলাদেশে বহু দলীয় রাজনীতি অচল ও গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি ১৯৭৫ইং সনে এক দলীয় শাসন বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠন করেন মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধাচরণ করলেও বোধহয় উপরোক্ত সুবিধাদি উপজাতীয়দের জন্য ব্যবস্থা করায় এবং শেখ মুজিবুর রহমান থেকে অনেক আশার বাণী শুনে আশাবিত্ত হয়ে মিঃ চারু বিকাশ চাকমা, মিঃ অনন্ত বিহারী খীসা,

এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, কে. এস. গ্রুপ সহ মিঃ লার্মা “বাকশালে” যোগদান করেন। খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের গভর্নর নিযুক্ত হন যথাক্রমে মং রাজা ও বোমাং রাজা। রাজ্যমাটিতে ডি. সি কাদের (যেহেতু চাকমা রাজা নাবালক)। বাকশালের প্রক্রিয়া জেলা গভর্নর নিযুক্ত হলে মিঃ চারু বিকাশ চাকমা রাজ্যমাটিতে ও মিঃ অনন্ত বিহারী বীসা খাগড়াছড়িতে সেক্রেটারী নিয়োগ পান কিন্তু ১৯৭৫ইং সনের ১৫ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান এক সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবার নিহত হলে বাকশালের কার্যক্রম ভেঙে যায়। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা আত্মগোপন করেন।

জেনারেল জিয়াউর রহমান কিছু দিনের মধ্যে সকল রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন এবং পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। ১৯৭৬ইং সনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কতিপয় উপদেষ্টা নিয়োগ করে দেশ পরিচালনা আরম্ভ করেন। এ সময় ১৯৭৬ইং সনে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান মন্ত্রীপদ মর্যাদায় রাজমাতা বিনীতা রায়কে উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের উপর দ্বি-মুখী নীতি প্রয়োগ করেন। একদিকে উপজাতীয়দের “ডিভাইড এন্ড রুল” নীতি প্রয়োগ করে উপজাতীয়দের একতার উপর কুঠারাঘাত অপর দিকে কতিপয় নেতা ও গ্রুপকে অনাকাঙ্ক্ষিত সুবিধা প্রদান করে উদ্দেশ্য হাসিল করেন। এই সুযোগ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সমতলের বাঙ্গালী পুনর্বাসনের পরিকল্পনা করেন। ইতিমধ্যে নাবালক কুমার দেবশীষ রায় সাবালক হয়ে ১৯৭৬ইং সনে এস.এস.সি (মেট্রিক) পাশ করেন এবং কলেজে অধ্যয়ন করতে থাকেন। রাজমাতা বিনীতা রায় উপদেষ্টা ও রাজ পরিবারের অন্যান্য সদস্যবর্গ এর সাথে পরামর্শ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ইং সনের ২৫শে নভেম্বর অনেক ধুমধাম অনুষ্ঠান করে চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব আবদুল আওয়াল মহোদয় কর্তৃক একটি রাজকীয় তরবারী প্রদানের মাধ্যমে কুমার দেবশীষ রায়কে রাজা (চীফ) রূপে অভিষিক্ত করেন। এভাবে ওয়াংঝা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর ৫ম রাজা রূপে রাজা দেবশীষ রায় রাজগদীতে অভিষিক্ত হন। এই দিকে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কতিপয় স্বার্থান্বেষী নেতা ও মুরব্বীকে ডেকে ত্রিপুরাদের জন্য ত্রিপুরা উন্নয়ন সংসদ, মার্মাদের জন্য “মার্মা” উন্নয়ন সংসদ, তঞ্চঙ্গ্যাদের জন্য তঞ্চঙ্গ্যা উন্নয়ন সংসদ গঠন করে বিশেষে সুবিধা প্রদান করতে থাকেন এবং উপজাতীয়দের মধ্যে পরস্পর বিভেদ ডেকে আনার অপকৌশল অবলম্বন করতে থাকেন। ইতিমধ্যে তিনি স্থানীয় প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের ডেকে এক জরুরী সভার মাধ্যমে ১৯৭৭ সনে ২রা জুলাই থেকে ৪ঠা জুলাই অনুষ্ঠিত সভায় ট্রাইবেল কনভেনশন নামে ১৯জন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে এক সংগঠন গড়ে তোলেন। উপরোক্ত ট্রাইবেল কনভেনশন এর মিঃ চারু বিকাশ চাকমাকে আহবায়ক পরে সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করা হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এই সুযোগে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে সমতলের বাঙ্গালী পুনর্বাসন আরম্ভ করে দেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ বিশেষতঃ শান্তিবাহিনী এর গ্রুপ উপরোক্ত পরিস্থিতির কারণে আর চূপ করে থাকতে পারলেন না; শত্রুকে প্রতিরোধ ও আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাধারণতঃ গেরিলা পদ্ধতিতে প্রতিরোধ ও আক্রমণ করার কৌশল নেওয়া হয়। ইতিমধ্যে শান্তিবাহিনী ও সশস্ত্র গ্রুপ যথেষ্ট শক্তিশালী হয়েছে বলে তারা ধারণা করলেন। ১৯৭৬ইং সনের মধ্যবর্তী সময়ে শান্তিবাহিনী সর্ব প্রথম বিলাইছড়ি আর্মড পুলিশ ক্যাম্প ও খাগড়াছড়ির বেতছড়ি গ্রামে পুলিশের নৌকায় সফল হামলার মধ্যে দিয়ে সশস্ত্র কার্য-কলাপের সূচনা করেন এবং সরকারকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেন। এভাবে শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র গ্রুপ ১৯৭৭ইং সনের ২৯শে মে চন্দ্রঘোনা এলাকায় এক অতর্কিত হামলা চালিয়ে সামরিক বাহিনীর বেশ কয়েকজন সদস্যকে হত্যা করেন। এরূপ ভাবে সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামে গেরিলা পদ্ধতিতে সামরিক বাহিনী ও শত্রুদের উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়ে যায়। সরকার এক ডিভিশন নিয়মিত বাহিনী মিলিটারী ও প্রায় অর্ধ-লক্ষ পুলিশ, আনসার ব্যাটালিয়ন নিয়োগ করেও পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি স্থাপন করতে পারলেন না।

তাই, ট্রাইবেল কনভেনশন এর নেতৃবৃন্দকে জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং জে.এস.এস এর নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৭ইং সনের ৩০শে জুলাই নানিয়ারচরে শান্তিবাহিনীর কয়েকজন নিম্ন পর্যায়ের সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ লাভ করতে সক্ষম হন। ১৯৭৭ইং সনের ১৭ই আগস্ট জুরাছড়িতে সমিতির উচ্চ পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে ট্রাইবেল কনভেনশন নেতৃবৃন্দের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। জনসংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ শর্ত সাপেক্ষে সরকারের সাথে আলোচনায় বসতে রাজী হন। ট্রাইবেল কনভেনশনের সাধারণ সম্পাদক মিঃ চারু বিকাশ চাকমা, যুগ্ম সম্পাদক মিঃ জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কল্প রঞ্জন চাকমাসহ ১৯৭৮ইং সনের ১৫ই ডিসেম্বর কাউখালি উপজেলার বাদলছড়ি গ্রামে জে.এস.এস এর নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক হয়। আলোচনায় ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়।

ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ ১৯৭৮ইং সনের ১১ই ডিসেম্বর ঢাকায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ও ১৯৭৯ইং সনের ৮ই সেপ্টেম্বর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মোস্তাফিজুর রহমানের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও আলোচনা করে কোন ইতিবাচক সাড়া পাননি। এসময় ১৯৮০ইং সনের ২২শে জানুয়ারী সরকার শান্তিবাহিনীর প্রেরণকৃত ও বন্দী মিসেস্ অনিমা, মিঃ বিভূতি চাকমা, মিঃ চাবাই মগ সহ মানবেন্দ্র লার্মার ভাই মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা (সন্ত্র)কে জেল থেকে মুক্তি দেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের নতুন পথ অন্বেষণের কৌশল নেন। ১৯৮০ইং সনের ১৮ই মে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রাজ্যমাটি সফরে এলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের উপায় ও পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করে স্বায়ত্তশাসন দাবী ও সমতলের বাঙ্গালী পুনর্বাসন বন্ধের দাবী জানালে প্রেসিডেন্ট

উহার জবাব না দিয়ে এড়িয়ে যান। এরপর থেকে কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ সরকারের উদাসীনতা লক্ষ্য করে তারাও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা শুধু অর্থ-নৈতিক কারণ বলে স্বীকার করে নেন। ইতিমধ্যে ১৯৮১ইং সনের ১৮ই এপ্রিল তদানিন্তন পার্বত্য চট্টগ্রামকে রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা গঠন করার সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয় এবং পর পর কার্য্যকরী করা হয়। অবশ্য ১৯৮৩ইং সনের ১৩ই অক্টোবর খাগড়াছড়িকে নতুন জেলা ঘোষণা করা হয়। ১৯৮১ইং সনের ৩০শে মে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম সফরে আসলে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে জিয়াউর রহমান নিহত হন এবং তার শাসন সমাপ্ত হয়। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার আগে ১৯৮০ইং সনে রাজমাতা বিনীতা রায়কে বাদ দিয়ে মিঃ সুবিমল দেওয়ানকে রাষ্ট্রপতির উপজাতীয় বিষয়ক সহকারী উপদেষ্টা নিয়োগ করেন। প্রেসিডেন্ট সান্তারের আমলে ১৯৮২ইং সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী সহকারী উপদেষ্টা সুবিমল দেওয়ানের নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য একদল প্রতিনিধি প্রেসিডেন্ট এর সাথে ঢাকায় দেখা করেন কিন্তু কোন সুনির্দিষ্ট উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। প্রতিনিধি নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন।

জেনারেল মোহাম্মদ হোসেন এরশাদ আবদুস সান্তারকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই ক্ষমতা দখল করেন এবং দেশে সামরিক শাসন জারি করে দেশ শাসন করতে থাকেন। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর ১৯৮২ইং সনের ২৭শে জুলাই খাগড়াছড়িতে পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের আশাব্যক্ত করেন এবং নেতা ও জনগণের সহযোগিতা আহ্বান করেন। তিনি প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা বলে স্বীকার করেন। এ বিষয়ে সরকারের আশ্বাসের ভিত্তিতে ১৯৮২ইং সনের ২রা আগস্ট ২৪তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি জেনারেল মোন্লাফ রাঙ্গামাটিতে আবার উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন ও আলোচনা করেন। প্রাক্তন সংসদ মিঃ উপেন্দ্র লাল চাকমাকে আহ্বায়ক করে খসড়া দাবীনামা ও যোগাযোগ উপ কমিটি গঠন করা হয় ১৯৮২ইং সনের ৪ঠা আগস্ট রাঙ্গামাটিতে এক সভা আহবানের মাধ্যমে। এই কমিটির ১৯৮২ইং সনের ২২শে আগস্ট ও ৯ই অক্টোবর দুই বার রাঙ্গামাটিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সর্ব সম্মত দাবীনামা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়নি। ১৯৮২ইং সনে ২৫শে অক্টোবর যোগাযোগ উপ কমিটি সর্ব প্রথম খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি থানাধীন ভাইবোনছড়ায় জনসংহতি সমিতির মধ্যে আদর্শগত বিরোধের কারণে অন্তর্কলহ আরম্ভ হয় ১৯৭৮ইং সন থেকে। পরে উহা গুরুতর রূপ ধারণ করে এবং প্রীতি কুমার চাকমা ও ভবতোষ দেওয়ান কতিপয় কর্মীসহ বিভক্ত হয়ে যায়। তারা ১৯৮৩ইং সনের ১৪ই জুন সর্ব প্রথম পরস্পর সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে ১৯৮৩ইং সনের ১০ই নভেম্বর মিঃ মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মাকে ৮ জন সহকর্মী সহ ত্রিপুরা রাজ্যের অমরপুর মহকুমার ইজারা গ্রামের কল্যাণপুর ক্যাম্পে হত্যা করে, কিন্তু তবু তারা পার্টির কতৃৎ ও ক্ষমতা দখল করতে

পারেননি। ১৯৮৫ইং সনের ২৯শে জুন খ্রীতি ফ্রপের ২৩৩জন কর্মী সরকারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু খ্রীতি কুমার চাকমা ও ভবতোষ দেওয়ান ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে দেশে আর ফিরেননি। মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা (সন্ত) ও (মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মার ভাই) এর নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতির তার রাজনৈতিক কার্যক্রম চালিয়ে নিতে থাকেন।

এরশাদ সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি শৃংখলা ফিরে আনার লক্ষ্যে জন সংহতি সমিতির সঙ্গে আলোচনা করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৮৩ ইং সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর ২৪তম পদাতিক বাহিনীর জিওসি মেজর জেনারেল আবদুল মোন্নাফকে দিয়ে রাঙ্গামাটিতে টাউন হলে এবং সভায় উপজাতীয় আহবানের মাধ্যমে ট্রাইবেল কনভেনশন পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সভায় উপজাতীয় নেতা শান্তিময় দেওয়ানকে আহবায়ক করে কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। এই কমিটি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন স্থানে মিটিং করে তাদের বক্তব্য ও জনগণের নিকট পেশ করেন। ১৯৮৩ইং সনের ৩রা অক্টোবর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল এরশাদ রাঙ্গামাটি আসলে রাঙ্গামাটি স্টেডিয়ামে এক সভায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রস্তাব দেওয়ার আহবান করেন। সেই উদ্দেশ্যে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দ ১৯৯০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসনবিধি সংশোধনের প্রস্তাব এনে ১৯৮৩ইং সনের ১২ই অক্টোবর চট্টগ্রামের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জনাব আলী হায়দার খান এর মাধ্যমে সরকারের কাছে পেশ করেন। এভাবে সরকারের সাথে ট্রাইবেল কনভেনশনের নেতৃবৃন্দের কয়েকবার মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ ইং সনের অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রপতি এরশাদ শান্তি বাহিনীর প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন এবং পর্যায়ক্রমে এপ্রিল/৮৫ পর্যন্ত এই আদেশ বর্ধিত করা হয়।

ইতিমধ্যে ১৯৮৪ ইং সনের ১৭ই জানুয়ারী বাঘাইছড়ি থানায় কর্মরত শেল অয়েল কোম্পানীর ৬ জন বিদেশী কর্মকর্তাকে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা বিকাল ৫টায় সিঁজকমুখ থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এর মধ্যে ঐদিনই ৩জনকে ছেড়ে দিয়ে অপর ৩ জনকে ধরে নিয়ে যায়। ১৮ই জানুয়ারী/৮৪ ট্রাইবেল কনভেনশনের আহবায়ক শান্তিময় দেওয়ান, খাগড়াছড়ি আহবায়ক উপেন্দ্র লাল চাকমা বাঘাইছড়ি যান এবং বাঘাইছড়ি থানার নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় ২৩শে জানুয়ারী/৮৫ শান্তি বাহিনীর সাথে যোগাযোগ ও অপহৃত বিদেশীদের সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেন। ২৫শে জানুয়ারী মিঃ উপেন্দ্র লাল চাকমা শান্তি বাহিনীর নেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হন এবং ১৯৮৫ইং সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ২২ কেজি স্বর্ণ ও ১ কোটি টাকার অধিক দেশী ও বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে সকল বিদেশী নাগরিকদেরকে মুক্তি দেওয়া হয়।

ট্রাইবেল কনভেনশনের পরামর্শে ও অনুরোধক্রমে জেনারেল এরশাদ জন সংহতি সমিতির সাথে পুনরায় আলোচনা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং যোগাযোগ কমিটির আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ ও পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সাথে বৈঠক বসতে রাজী হন। এভাবে

ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালানোর ফলে ১৯৮৫ইং সনের ২১শে অক্টোবর পানছড়ি থানাধীন পুজগাং এলাকায় এরশাদের আমলে জন সংহতি সমিতি ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকই সরকার পক্ষ পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যাকে একটা জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা হিসাবে মেনে নেন এবং তাহা রাজনৈতিক ভাবে সমাধান করতে সম্মত হন।

রাজা দেবাশীষ রায় রাজগদীতে আসীন হয়েও তার অধ্যয়ন ও উচ্চ শিক্ষা লাভ করণ অব্যাহত রাখেন। তিনি রাঙ্গামাটি সরকারী কলেজ থেকে ১৯৭৮ইং সনে ১ম বিভাগে এইচ.এস.সি এবং ১৯৮১ইং সনে ২য় বিভাগে বিএ পাশ করেন। বিএ পাশ করে তিনি আইনে বিএ অনার্স পড়েন এবং ১৯৮৫ইং বিএ অনার্স (আইন) পাশ করেন। ১৯৮৬ইং সনে তিনি লন্ডন লিংকন ইন থেকে ব্যারিষ্টারী পাশ করেন। ১৯৮৮-৮৯ইং তিনি অবসর গ্রাণ্ড ডিএসপি ত্রিপুরা কান্স চাকমা এর মেয়ে তাতু রায়কে বিয়ে করেন এবং ঐ সন থেকে তিনি ঢাকা হাই কোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৯১ইং সনে তিনি আবার অষ্ট্রেলিয়া থেকে আইন বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং আইনে ডিপ্লোমা বিষয়ক ডিগ্রী লাভ করেন। কুমার ত্রিভুবন রায় (জন্ম- ১২/০২/১৯৯০ইং) ও রাজ কুমারী আরাধনা আয়েত্রী রায় (জন্ম- ১৬/০৪/১৯৯৪ইং) নামে রাজা দেবাশীষ রায়ের ১ ছেলে ও ১ কন্যা রয়েছে। সাংসারিক জীবনে রাজা দেবাশীষ রায়ের চরম বিপর্যয় ১৯৯৮ইং নভেম্বর মাসে (সম্ভবত: ১৮/১১/১৯৯৮ইং তারিখ) রানী তাতু রায়ের অকাল মৃত্যু হয়।

তিনি (রাজা দেবাশীষ রায়) বর্তমানে সরকারী বে-সরকারী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িত রয়েছেন। তিনি পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কল্পে “টংক্যা” নামে একটি এনজিও গড়ে তোলেন এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা ও তদারকী করেন। ঐ সংস্থায় তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি “বাংলাদেশ ইন্ডিজেনার্স এন্ড ট্রাইবেল পিপলস এসোসিয়েশন ফর এডভান্সমেন্ট” এর সম্মানিত সদস্য হন। তিনি “দ্বিতীয় ধরিত্রী সম্মেলন” এ যোগদান করেন ১৯৯৬ইং সনে এবং “কমিশন অন সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট” এর সম্মানিত সদস্য হন। ইহা ছাড়াও তিনি দেশে বিদেশে আর্থ-সামাজিক ও সমাজ চেতনামূলক বহু কর্মশালা ও সেমিনারে যোগদান করে মূল্যবান বক্তব্য দেন। তিনি সময় সময় তার সভা পরিষদ ও জ্ঞানীগণী বহু নেতৃবৃন্দ লয়ে নিজ সার্কেলে ও মৌজাগুলিতে সফরে যান এবং স্থানীয় লোকজন আপায়র জন সাধারণের সঙ্গে যত বিনিময় করেন এবং সমাজ ও দেশ উন্নয়নে আলোচনা ও বক্তব্য রাখার চেষ্টা করতে থাকেন অদ্যাবধি।

স্বাধীনতার পর এ সময়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব-সমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহল বসে নেই। নিজ নিজ জাতি ও সমাজ রক্ষা করণের কল্পে যুব সমাজ ও শিক্ষিত মহল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ও দেশে নানা অত্যাচার উৎপীড়ন, জুলুম ও নিপীড়ন উপেক্ষা করে নিজ নিজ পেশা ও নানা ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য কর্মক্ষেত্রে নেমে যান। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের ৩ প্রধান শহর, উপ-শহর (উপজেলা) ও গ্রামাঞ্চলে বহু আর্থ-সামাজিক, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া ও সামাজিক কল্যাণ এবং রাজনৈতিক

দল ও ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠে। রাঙ্গামাটিতে এরূপ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের মধ্যে জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর (জুভাপ্রদ) পাহাড়ী প্রকাশনা গোষ্ঠী, মুড়াল্যা ও জাগরনী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, বৌদ্ধ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য খাগড়াছড়িতে চলন্তিকা সাহিত্য পরিষদ, সমন্বয় শিল্পী গোষ্ঠী, বান্দরবানে বান্দরবান সাহিত্যঙ্গন, আলী কদম উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ক্লাব প্রভৃতির নাম চোখে পড়ার মত। ইহা ছাড়াও ক্রীড়া জগতে রাঙ্গামাটিতে বেশ কয়েকটি সংগঠন গড়ে উঠে। এদের মধ্যে ইয়থ স্পোর্টিং ক্লাব, রাঙ্গামাটি ইয়ং ক্লাব, রাইজিং স্টার ক্লাব, ছদক ক্লাব প্রভৃতি এর নাম করণ করা যেতে পারে এবং খাগড়াছড়িতে ত্রিপুরা উপজাতি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সংসদ, প্রগতি সংঘ ও বান্দরবানে ঈগল স্পোর্টিং ক্লাব, উপজাতীয় নবোদয় সংঘ, প্রভৃতি সংগঠনে যথায়থ অবদান রয়েছে। কয়েকটি রাজনৈতিক ও ছাত্র সংগঠনও গড়ে উঠে এদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, পাহাড়ি ছাত্র সমিতি, ট্রাইবেল পিপলস পার্টি, ট্রাইবেল স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও পাহাড়ী গণ পরিষদ।

এই সকল সংগঠনগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে অনেক অবদান রেখে যান। কোন কোন সংগঠন পরে বিলুপ্ত বা নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। অবশ্য সরকারও পাহাড়ীদের সংস্কৃতিতে সংরক্ষণ ও রক্ষা করার জন্য প্রথমে রাঙ্গামাটি “উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট” নামে এক সরকারী কার্যক্রম গড়ে তোলেন। পরে তাহা সম্প্রসারিত করে। বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও কক্সবাজারেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই সকল সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী উপজাতীয়রা বাংলায় ও বাংলা অক্ষরে নিজ নিজ ভাষায় বহু সাহিত্য, বহি, বার্ষিকী প্রকাশ করেন। এক জরীপে জানা গেছে বৎসর ভিত্তিক প্রকাশনা পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রায় নিম্নরূপঃ

সন ভিত্তিক প্রকাশনার সংখ্যা

১৯৭২- ৪	১৯৮৬- ২১
১৯৭৩- ২	১৯৮৭- ৩৪
১৯৭৪- ২	১৯৮৮- ২৮
১৯৭৫- ২	১৯৮৯- ১০
১৯৭৭- ২	
১৯৭৮- ৫	
১৯৭৯- ১০	
১৯৮০- ২২	
১৯৮১- ১৭	
১৯৮২- ২২	
১৯৮৩- ১৯	
১৯৮৪- ২৩	
১৯৮৫- ১৪	

মোট- ২৪৭টি

স্থান ভিত্তিক প্রকাশনার সংখ্যা

রাঙ্গামাটি-	১৪২
খাগড়াছড়ি-	২৫
বান্দরবান-	১৮
চন্দ্রঘোনা-	২০
কাপ্তাই-	১৮
রামগড়-	১১
ঘাগড়া-	৪
জুরাছড়ি-	৪
রাইখালী-	২
বেতবুনিয়া-	১
আলীকদম-	১
রাজস্থলী-	১

মোট- ২৪৭টি

বহু স্থানে এই কার্যক্রম এখনও অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যমাটিতে আদিবাসী ও উপজাতিদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্যসমূহ চর্চা, সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে কতিপয় যুবক ও বুদ্ধিজীবী এর উদ্যোগে ১৯৮১ইং সনে “জুম ইনথেটিকস” (জা-ক) নামে একটি অরাজনৈতিক সংস্থা গড়ে উঠে মোনঘর রাজ্যমাটিকে কেন্দ্র করে। তার অবদান ও সৃষ্টি অপূর্ব। এই সংস্থাতে প্রায় পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল উপজাতির শিল্পী ও কর্মীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়াও এই সংগঠনে বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী মহলের অংশ গ্রহণ, সাহায্য ও সুন্দর পরামর্শ বিদ্যমান রয়েছে। এই সংস্থার কর্মকুশলী ও কর্মকর্তাগণ এককভাবে অনুষ্ঠান করলেও সাধারণতঃ উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট রাজ্যমাটি এর সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম ও কর্মসূচী পরিচালনা করে থাকেন। তাই এই সংস্থার খ্যাতি, সৃষ্টি ও দক্ষতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা বিশেষতঃ চাকমা, মার্মা, ত্রিপুরা ও তঞ্চঙ্গ্যারা সকল ক্ষেত্রে শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের শিক্ষিত বাঙ্গালীদের চেয়ে পিছে থাকলেও অগ্রগতি ও উন্নয়নের প্রচেষ্টা প্রশংসা যোগ্য। অন্যান্য পিছে পড়া উপজাতিদের টেনে আনার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এখন শুধু তিন পার্বত্য জেলায় নয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম বড় বড় শহরে ছাড়াও বাংলাদেশের প্রায় সকল থানা উপজেলায় ১০/৫ জন উপজাতীয় লোক সরকারী কার্যালয়ে কর্মরত দেখা যায় এবং বিদেশেও প্রায় ৫০০ শতাধিক উপজাতীয় লোক বিভিন্ন সেটরে কর্মরত রয়েছেন বলে জানা যায়।

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলেই ১৯৭৯ইং সনে পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী পুনর্বাসন কাজ শুরু হয় এবং ১৯৮২-৮৩ইং সন পর্যন্ত উহা পুরাদমে অব্যাহত থাকে। জন সংহতি সমিতির নেতৃবৃন্দ প্রথমতঃ পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের নোটিশ ও লিফলেট বিলি করে পুনর্বাসন প্রতিরোধ ও বন্ধ করার চেষ্টা করেন কিন্তু উহাতে ফলপ্রসূ না হওয়ায় পুনর্বাসন এলাকা আক্রমণ ও জ্বালিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এভাবে ১৯৮০ইং সনে ২৫শে মার্চ শান্তিবাহিনীর সদস্যরা কাউখালী থানার পোয়া পাড়া, বেতছড়ি প্রভৃতি কয়েক গ্রামে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দেন। এতে কিছুক্ষণের মধ্যে পুনর্বাসিত বাঙ্গালীদের কয়েক হাজার বাড়ী ঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। সেইদিনই ২৫শে মার্চ/৮০ শান্তি বাহিনীর হামলার পরবর্তী সময়ে সেনা বাহিনীর হুত্র ছায়ায় হাজার হাজার বাঙ্গালী উপজাতীয়দের গ্রাম ও এলাকা আক্রমণ, নরহত্যা, ঘর-বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে হাজার হাজার উপজাতীয়দের ঘর-বাড়ী পুড়ে যায় এবং স্থানীয় বাজার চৌধুরী বাবু কুমুদ বিকাশ তালুকদার, গণ্যমান্য ব্যক্তি শশীদেব চাকমা, অম্বিনী কুমার কার্বারী, মংরী কার্বারী (মার্মা), সুখাই কার্বারী (মার্মা) ম্যাকা কার্বারী (মার্মা) সহ বহু গণ্যমান্য লোক মারা যান। এই ঘটনায় উপজাতীয় ২১৪জন নিহত, ১৫০জন আহত, ৩০জন মহিলা ধর্ষিত

ও ৯টি গ্রামে অগ্নি সংযোগ করা হয় বলে জানা গেছে এবং বহু সংখ্যক পাহাড়ী নর-নারী নিখোঁজ হন বলে শুনা গেছে। এইরূপ ঘটনায় পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলায় বিভিন্ন স্থানে। মাটিরাঙ্গা, বেলছড়ি, ভূষণছড়া, হরিণা, পানছড়ি, ছংড়াছড়ি, মেরুং হিরাচর, সার্বোয়াতলী, পাবলাখালী, লংগদু, মারিশ্যাচর লোগাং প্রভৃতি এলাকায় ৯১৫ জন নিহত, ১৪৮৮জন আহত, ১৪০ জন ধর্ষিত ও ২৭১৬টি ঘর পুড়ে যাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। ইহা ছাড়া ইহার অতিরিক্ত আরো অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, যাহা সংগ্রহ করা যায়নি। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় এলাকায় ধ্বংস যজ্ঞ ও অত্যাচার নিপীড়ন চালানো হয়েছে।

১৯৮০ইং সনের ৭ই এপ্রিল তৎকালীন খাদ্য প্রতিমন্ত্রী অংশৈ প্র চৌধুরী, উপজাতীয় নেতা মিঃ চারু বিকাশ চাকমাসহ সর্ব প্রথম কাউখালী ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে যান এবং ইহার পর জাসদ সাংসদ শাহজাহান সিরাজ ঐ টিমে রাশেদ খান মেনন, উপেন্দ্র লাল চাকমা কাউখালী পরিদর্শন করতে যান। কোন সেনা বাহিনী ও সরকার পক্ষ ইহার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেননি। উভয়দল ইহা একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেন। শান্তিবাহিনীর হামলার জবাবে সেনা বাহিনীর ছত্রছায়ায় বাঙ্গালীদের পাল্টা আক্রমণ, লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ এর ফলে শত শত পাহাড়ীদের গ্রাম খালি হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীরা সেই খালি গ্রামগুলি দখল করে নেন। উপজাতীয় লোকেরা জীবন রক্ষার্থে পলাইয়ে গিয়ে ভারতে শরণার্থী হন। এভাবে প্রায় ৫০,০০০ পাহাড়ী শরণার্থী হয়ে যান বলে জানা গিয়াছে। ইহাতে একদিকে শান্তি বাহিনীর আক্রমণ, প্রতিরোধ ও কর্মতৎপরতা, অপরদিকে বিদেশে অর্ধ-লক্ষাধিক পাহাড়ী ও বাংলাদেশের নাগরিক অনাহারে, অর্ধাহারে অসুখে, বিসুখে শত শত লোক বিশেষতঃ শিশু ও নারী মৃত্যুবরণ এরশাদ সরকারকে ভাবিয়ে তুলেছে। কিভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করা যায়। মানবিক সংস্থাও আন্তর্জাতিকভাবে এরশাদ সরকারকে এ ব্যাপারে দারুণ চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন।

ঐ ঘটনার পরও পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক খেলা নিয়ে অনেক প্রহসন চলে অনেক আলোচনা ও বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু কিছুতেই সমস্যা সমাধানের পথ বেরিয়ে আসেনি। শেষ নাগাদ বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জেনারেল এরশাদ ১৯৮৭ইং সনের ১৯শে সেপ্টেম্বর তিন পার্বত্য জেলার উপজাতীয় নেতাদের সঙ্গে চট্টগ্রামে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং ঐ বৈঠকেই জেনারেল এরশাদ পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যাকে একটি জাতীয় ও রাজনৈতিক সমস্যা বলে ঘোষণা দেন এ ব্যাপারে সরকারের কাছে সুপারিশ পেশ করার জন্য জাতীয় কমিটি গঠন করার ওয়াদা করেন। ঐ বৈঠক ও সিদ্ধান্তের আলোকে কিছু দিনের মধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এ.কে খন্দকারের নেতৃত্বে ৬ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়। জাতীয় কমিটি ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির সাথে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রাক্তন সাংসদ উপেন্দ্র লাল চাকমাকে যোগাযোগ

করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য বৈঠকের প্রস্তুতি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৮৭ইং সনের ১৪ই অক্টোবর যোগাযোগ কমিটি ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে খাগড়াছড়ি জেলাধীন পানছড়ি-পূজগাং এ সর্বশেষ প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৭ইং সনের ১৭ই, ১৮ই ডিসেম্বর পানছড়ি থানার পূজগাং এলাকায় অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জনসংহতি সমিতি প্রথম বারের মত একটি পাঁচ দফা দাবীনামা সরকার পক্ষদের কাছে পেশ করেন (১) পার্বত্য অঞ্চলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন (২) এ ব্যাপারে সাংবিধানিক নিশ্চয়তা (৩) ১৯৪৭ইং সনে ১৭ই আগস্ট পর্যন্ত বসবাসকারী পার্বত্য চট্টগ্রামে থাকার নিশ্চয়তা (৪) পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের নিশ্চয়তা (৫) পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি তৎসংক্রান্ত আরো ২৫টি দাবী সংযোজন।

দ্বিতীয় বৈঠকে (১৭ই ১৮ই/৮৭ইং) জন সংহতি সমিতির সরকারের কাছে পেশকৃত ৫ দফার প্রেক্ষিতে ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোন বৈঠকে দফা-রফা না হওয়ায় ১৪ই, ১৫ই ডিসেম্বর/৮৮ ৭ম বৈঠক আর অনুষ্ঠিত হয়নি। সরকার জনসংহতি সমিতির সাথে কোন সমস্যা সমাধান হবে না এই ধারণা পোষণ করে পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে বোঝা পড়া করে ১৯৮৯ইং সনের ২৫শে জুন অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার পরিষদ নামে ৩টি জেলা পরিষদ আইন পাশ করে নেন এবং পরিষদের নিবাহী ক্ষমতা পরিষদ আইনের ২৪নং অনুচ্ছেদ বলে ও চেয়ারম্যানের কাছে ন্যস্ত করেন এবং ৬৪নং অনুচ্ছেদবলে চূড়ান্ত ক্ষমতা পরিষদ এর কাছে অর্পণ করেন। ইহা জনসংহতি সমিতির ৫ দফা বিকল্প স্বায়ত্তশাসন বলে সরকার দাবী ও প্রস্তাব করতে থাকেন। জনসংহতি সমিতি এই স্থানীয় সরকার পরিষদের ঘোর বিরোধিতা করেন এবং ইহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ স্থানীয় সরকার পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক সপ্তাহ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তবর্তী ২০/২৫ মাইলের মধ্যে স্থিত উপজাতীয়দের ত্রিপুরা বা মিজোরামে যেতে বাধ্য করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে ঘর-বাড়ী পুড়ে দেন। ইতিমধ্যে ১৯৮৯ইং সনে ৪ঠা মে লংগদুতে উপজেলা চেয়ারম্যান আবদুর রশিদ সরকারের হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ পুনর্বাসিত বাঙ্গালীরা লংগদু বসবাসকারী প্রায় সব উপজাতীয়দের ঘরবাড়ী, গ্রাম জ্বালিয়ে দেন এবং কয়েক হাজার উপজাতি-উদ্বাস্তু হন এবং জনসংহতি সমিতির ভারতের মিজোরামে আটক রাখা উপজাতীয় লোকেরা শান্তি বাহিনীর বেষ্টিত থেকে পালিয়ে নিজ উপজেলায় বরকল, জুরাছড়ি ও বিলাইছড়ি ফিরে আসেন এবং এইরূপ অধিকাংশ লোক সর্বহারা হয়ে আভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়ে ভাসমান অবস্থায় ঘুরতে থাকেন। কোন সময় সাজেক ভেলীতে, কোন সময় ফরেস্ট এলাকায়, কোন সময় নিকট আত্মীয় স্থানীয় লোকালয়ে।

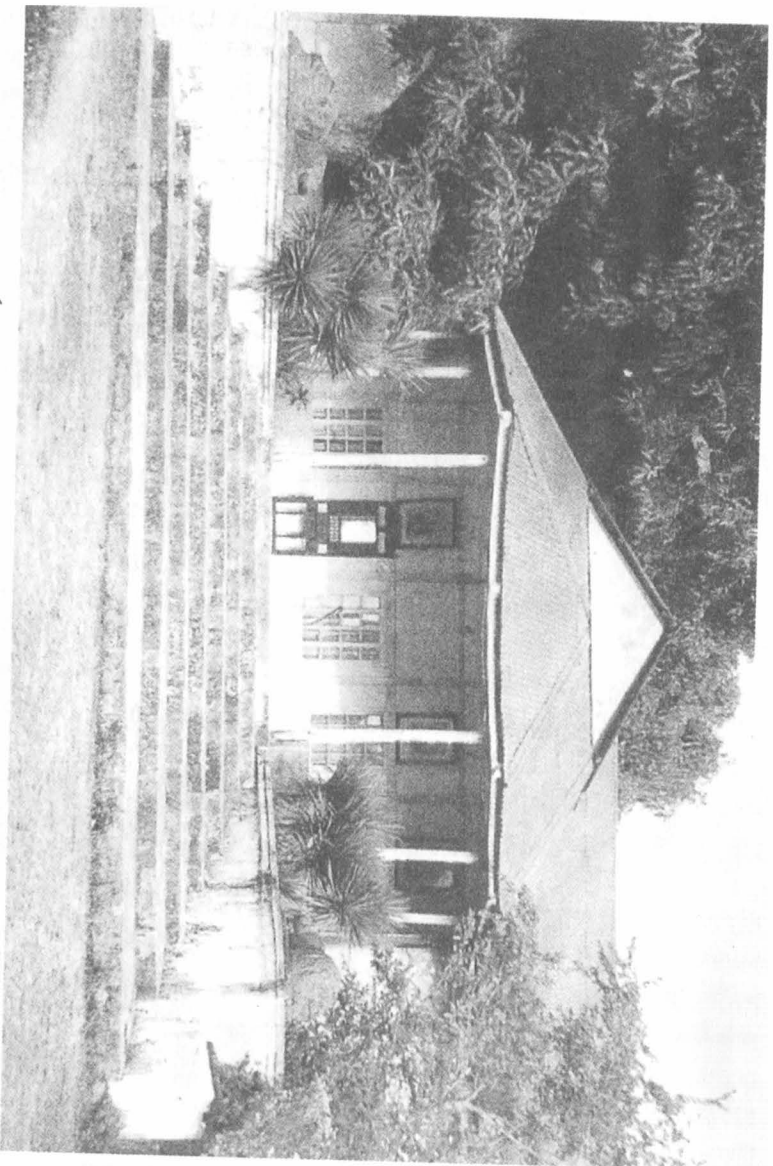
ইতিমধ্যে ১৯৯০ইং সনের ডিসেম্বর এক অভ্যুত্থানে জেনারেল এরশাদ গদী হারান এবং তিনি অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান (অস্থায়ী) রাষ্ট্রপতি বিচারপতি জনাব শাহাবুদ্দীন আহম্মদ এর কাছে ক্ষমতা অর্পণ করতে বাধ্য হন। ১৯৯১ইং সনের বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বেগম খালেদা জিয়া এর নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করেন। বেগম খালেদা জিয়া প্রধান মন্ত্রী হন এবং শেখ হাসিনা প্রধান বিরোধী দলের নেত্রী হন। বি.এন.পি ক্ষমতায় এসেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী পুনর্বাসন বন্ধ হয়নি এবং উপজাতীয়দের উপর অত্যাচার জুলুম ধামেনি। সেইভাবে শান্তিবাহিনীর আক্রমণ, প্রতিরোধ ও কার্যক্রমও অব্যাহত থাকে। তবে বিএনপি ক্ষমতায় এসে ভবিষ্যতে পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধানের ও পার্বত্য শান্তিচুক্তি সম্পাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দেয়। শান্তি বাহিনীর আক্রমণ ও প্রতিরোধ শুধু বাঙ্গালীদের উপর নয়, গেরিলা পদ্ধতিতে শান্তি বাহিনীর সদস্যরা বিভিন্ন স্থানে বহু সামরিক ক্যাম্প ও তহলদারি গ্রুপের আক্রমণ করে বহু ক্ষয়-ক্ষতি সাধন করেন। এভাবে শান্তি বাহিনীরা জুরাহড়ি থানায় লুলংছড়িতে মেজর রাজা মহসিন সহ প্রায় ২৭/২৮ জন সৈনিককে হত্যা করেন। বরকল থানার আন্দার মানিক সামরিক ক্যাম্প আক্রমণ করে অনেক সৈন্যকে হত্যা করেন। দিঘীনালা থানার নারাইছড়ি বিডিআর ক্যাম্প ধ্বংস ও জোয়ানদের হতাহত করেন। এভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক স্থানে সামরিক বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ ব্যাটালিয়নের উপর আক্রমণ হয়। এইরূপ হতাহত জোয়ানদের সংখ্যা সরকার গোপনে রাখলেও নিহতদের সংখ্যা কয়েক শতাধিক এবং আহতদের সংখ্যা সহস্রাধিক বলে জানা গেছে। এতে সামরিক বাহিনী সরকারের উপর অসন্তুষ্ট ও উপজাতীয় লোকদের উপর অসহনীয় হয়ে উঠে। সামরিক বাহিনী সরকারকে চাপ দিতে থাকে, হয়তো পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা সমাধান করা হউক, নয়তো সামরিকবাহিনী দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম ধুলিসাং করে দেওয়ার হুকুম দেওয়া হউক। সরকার এত তাড়াতাড়ি কোন দিকে পা-বাড়াতে পারছেন না। চারিদিকে দেশী-বিদেশী আন্তর্জাতিক চাপ।

বিএনপি সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদগুলি চালু রাখার পাশাপাশি জনসংহতি সমিতির সাথেও আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে সাবেক সংসদ সদস্য উপেন্দ্র লাল চাকমা ১৯৮৯ইং সনের ৩১শে মে বাংলাদেশ ত্যাগ করে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। ভারতে গিয়ে উপেন্দ্র লাল চাকমা “জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতি” গঠন করে শরণার্থীদের সংগঠন ও দাবীদাবা করতে থাকেন। পার্বত্য অঞ্চলের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বিএনপি সরকার যোগাযোগ মন্ত্রী কর্নেল অলি আহম্মদকে আহবায়ক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি যোগাযোগ কমিটি গঠন করেন। ১২ই মে/১৯৯২ইং তারিখ এবং জনসংহতি সমিতির সাথে যোগাযোগ করার জন্য মিঃ হংসধ্বজ চাকমাকে আহবায়ক করে একটি উপ যোগাযোগ কমিটি গঠন করা হয় ১৩ই আগস্ট/১৯৯২ইং তারিখ। মূল কমিটিতে



চাকমা যুবরাজ ত্রিভুবন আৰ্য্যদেব ৰায়

বর্তমান রাজবাড়ী (আগনে ভস্মীভূত)



ছিলেন শাহজাহান চৌধুরী এমপি, সৈয়দ আহিদুল আলম এমপি, মোঃ শাহজাহান, এমপি, বরকত উল্লাহ এমপি, শাহজাহান এমপি, মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী এমপি, রাশেদ খান মেনন এমপি এবং আবদুল মতিন খসরু এমপি পরে অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠনের দাবীতে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য মিঃ কল্প রঞ্জন চাকমাকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৯২ইং সনের ২০শে মে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদ এর দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান প্রতিহত ও বাধা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাজ্যমাটিতে বাঙ্গালী সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটি কর্তৃক বাধা ও সহিংসতা ঘটনা ঘটে। এতে বাঙ্গালী ছাত্র জনতার একটি অংশ প্রথমে বনরূপা ফরেস্ট অফিসের উত্তর প্রান্তের উপজাতীয় বাড়ীগুলিতে অগ্নিসংযোগ করে। সেখান থেকে গিয়ে বনরূপা পেট্রোল পাম্পের আশেপাশের দোকান ও উপজাতীয় পাড়ায় বাড়ী ঘরে অগ্নি সংযোগ করে। প্রায় একই সময়ে পেট্রোল পাম্পের অদূরে অবস্থিত ট্রাইবেল আদামের বাড়ী ঘরেও অগ্নি সংযোগ করা হয়। উচ্ছৃংখল জনতার এই হামলায় বনরূপা, ট্রাইবেল আদাম ও দেওয়ান পাড়া এলাকায় প্রায় ৯০টি উপজাতীয় ও অউপজাতীয় বসতবাড়ী ও দোকানগৃহ পুড়ে যায়। এতে মোট ১২ জন লোক আহত হন। যারা সবাই উপজাতীয় লোক। সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের নিক্রিয়তা, অবহেলার জন্য এতগুলি ঘর বাড়ী পুড়ে যায় অগাধ সম্পত্তি বিনষ্ট ও লোক আহত হওয়ার প্রতিবাদে স্থানীয় সরকার পরিষদ এর চেয়ারম্যান মিঃ পৌতম দেওয়ান চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। পরে সরকার মিঃ পারিজাত কুসুম চাকমাকে অস্থায়ী চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন।

ইতিমধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি ১লা আগস্ট ১৯৯২ইং সালে প্রচারিত এক বিজ্ঞপ্তি পত্রের মাধ্যমে ২০শে আগস্ট/৯২ থেকে ২০শে নভেম্বর/৯২ পর্যন্ত একতরফাভাবে তিন মাসের অস্ত্র বিরতি ঘোষণা দেন এবং সরকারের সাম্প্রতিক পদক্ষেপকে স্বাগত জানান। যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ এর নেতৃত্বে গঠিত পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত কমিটি ১৯৯২ইং সনের ২৬শে আগস্ট থেকে খাগড়াছড়িতে দুইদিন ব্যাপী মত বিনিময় সফর শুরু করেন এবং এই কমিটি খাগড়াছড়ি, রাজ্যমাটি ও বান্দরবানে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দল ও নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ ও মত বিনিময় করেন। পরিশেষে সকল মহলের জল্পনা, কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৯৯২ইং সনের ৫ই নভেম্বর সকাল সাড়ে ১০টায় খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউসে জনসংহতি সমিতির কড়া নিরাপত্তা ও সরকারী বাহিনীর সহায়তায় জনসংহতি সমিতি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বিশেষ কমিটির প্রথম বৈঠক শুরু হয় এবং মাঝখানে মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি সহ ৬ ঘন্টা আলাপ করে বিকাল ৫ টায় বৈঠক শেষ হয়। জনসংহতি সমিতির পক্ষে নেতৃত্ব দেন মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা (সম্ভ) ও বিশেষ কমিটির পক্ষে নেতৃত্ব দেন যোগাযোগ মন্ত্রী কর্ণেল অলি আহম্মদ। জন সংহতি সমিতির নেতাকে সহায়তা দেন সমিতির শীর্ষ স্থানীয় নেতা মিঃ সুধা সিদ্ধু খীসা

মিঃ রূপায়ন দেওয়ান, মিঃ গৌতম চাকমা ও মিঃ রক্তোৎপল ত্রিপুরা। কমিটির সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগের মিঃ কল্প রঞ্জন চাকমা, এমপি জনাব মোস্তাক আহম্মদ চৌধুরী, এমপি, বিএনপির সৈয়দ ওয়াহিদুল হক, এমপি জনাব আবদুল মতিন খসরু এমপি, জনাব বরকত উল্লাহ এমপি ও জনাব মোহাম্মদ শাহ জাহান এমপি। বৈঠকে অল্প বিরতির মেয়াদ ৩১শে ডিসেম্বর/৯২ইং পর্যন্ত সম্মত হয়। ১৯৯২ইং সনের ২৬শে ডিসেম্বর ঐ স্থানেই দ্বিতীয় বৈঠক হয়। ২৭শে ডিসেম্বর/৯২ তারিখ মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা (সভ্য) পানছড়ির খুদক ছড়ায় ১৪টি জাতীয় দৈনিকের প্রতিনিধি নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করেন।

ঐ সম্মেলনে যোগাযোগ উপ-কমিটির আহবায়ক মিঃ হংসধ্বজ চাকমা, সদস্য জনাব মোঃ সুফি ও পানছড়ি থানার নির্বাহী অফিসার মোঃ শাহাবুদ্দীন পর্যবেক্ষক হিসাবে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। মিঃ লার্মা এই সাংবাদিক সম্মেলনে তার বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি অবিচল আস্থা রেখেই পার্বত্য অঞ্চলের ১০টি ভিন্ন ভাষাভাষী জাতি সত্ত্বর জাতীয় অস্তিত্ব, ভূমি অধিকার, নিজস্ব সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যেই জনসংহতি সমিতি এই দীর্ঘ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। ইহা কোন বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন নয়। এভাবে বিএনপি আমলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিশেষ কমিটি ও উপ-কমিটির সঙ্গে ১৩টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধানে বা চুক্তি সম্পন্ন করার মত পর্যায় এ না আসায় বৈঠক অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়।

১৯৯৬ইং সনে জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসলে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পার্টি সরকার গঠন করেন। ক্ষমতায় আসার পর আওয়ামী লীগ সরকার বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও আওয়ামী লীগের ১১ জন সংসদ সদস্য সমন্বয়ে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি গঠন করে ৩০শে সেপ্টেম্বর/১৯৯৬ইং তারিখ। তারপর সংলাপ চালাতে থাকেন।

২১-২৪ ডিসেম্বর/৯৬ এ খাগড়াছড়ি সার্কিট হাউজে ১ম ও ২৫-২৭ জানুয়ারী/৯৭ এ ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ২য় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১২-১৩ইং মার্চ/৯৭ ঢাকায় পদ্মায় তৃতীয় বৈঠকের পর ২৮শে মার্চ থেকে ৭ই এপ্রিলের মধ্যে ৬৮০৮ জন শরণার্থী দেশে ফিরে আসেন। ১১-১৪ মে/৯৭ তারিখ ঢাকার পদ্মায় চতুর্থ বৈঠকে সরকার পক্ষ ও জনসংহতি সমিতি একটি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হন। ৮ই এপ্রিল/৯৭ তারিখ এমপি কল্প রঞ্জন চাকমা এর নেতৃত্বে শরণার্থীদের পুনর্বাসনের জন্য টাঙ্কফোর্স গঠন করা হয়। সরকার ও শান্তিবাহিনী উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক আলোচনা হয় চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে সমুদয় শর্ত সমূহ নিয়ে। উভয়পক্ষ একমতে উপনীত হয়ে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে সরকার ও জনসংহতির মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের চূড়ান্ত লক্ষ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান

মন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ এবং জন সংহতি সমিতির পক্ষে মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লার্মা (সন্ত্র) ঢাকায় 'শান্তিচুক্তি'তে স্বাক্ষর করেন। বিএনপি এই শান্তিচুক্তিতে বিরোধীতা করেন। শান্তিচুক্তির শর্তানুসারে ১৯৯৮ইং সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী বহু সহস্র পাহাড়ী-বান্গালী, মন্ত্রীবর্গ, দেশী-বিদেশী কূটনীতিকের উপস্থিতিতে খাগড়াছড়ির নব-নির্মিত স্টেডিয়ামে এক বর্ণাঢ্য সমাবেশ ও সমারোহের মধ্যে শান্তি বাহিনীর ৭৩৯জন সদস্যসহ মিঃ লার্মা প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অস্ত্র সমর্পণ করেন। এভাবে শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের সূচনা হয়। বিএনপি এই অস্ত্র সমর্পণও প্রত্যাখ্যান করেন। অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদে শান্তিচুক্তি বিল পাশ হয়ে গেল। এখন সম্পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল। শান্তিচুক্তির পর তিন পার্বত্য জেলায় সন্ত্র লার্মার নেতৃত্বে জনসংহতি সমিতি পুনর্গঠন ও তিনটি জেলা আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হয় এবং একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করে আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

শান্তিচুক্তির আলোকে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নভাবে (সংক্ষেপে) গঠিত ও পরিচালিত হবে:-

১। পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহ অধিকতর শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ আইন ১৯৮৯ এর বিভিন্ন ধারা সংশোধন ও সংযোজন সাপেক্ষে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদের সমন্বয়ে পার্বত্য জেলা পরিষদ ও পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে আঞ্চলিক পরিষদ ও পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। যার পদ মর্যাদা হবে একটি প্রতিমন্ত্রীর সমকক্ষ এবং তিনি অবশ্যই উপজাতীয় হবেন।

২। চেয়ারম্যানসহ আঞ্চলিক পরিষদ ২২ (বাইশ) জন সদস্য লয়ে গঠিত হবে। পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য উপজাতীয়দের মধ্যে হতে নির্বাচিত হবেন।

৩। পরিষদের গঠন নিম্নরূপ হবে:-

চেয়ারম্যান (উপজাতীয়) -	১ জন।
উপজাতীয় সদস্য (পুরুষ)-	১২ জন।
উপজাতীয় সদস্য (মহিলা)-	২ জন
অউপজাতীয় সদস্য (পুরুষ)-	৬ জন।
অউপজাতীয় সদস্য (মহিলা)-	১ জন।

মোট- ২২ জন।

উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে ৫ জন চাকমা, ৩ জন মার্মা, ২ জন ত্রিপুরা, ১ জন মুরুং ও তঞ্চঙ্গ্যা এবং ১ জন লুসাই, বোম, পাংখো, খুমী, চাক ও ঝিয়াং উপজাতি থেকে নির্বাচিত হবেন। অ-উপজাতীয় পুরুষ সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেক জেলা থেকে ২ জন নির্বাচিত হবেন। উপজাতীয় মহিলা সদস্য নিয়োগের ক্ষেত্রে

চাকমা ১ জন ও অন্যান্য উপজাতি থেকে ১ জন নির্বাচিত হবেন। পরিষদের মহিলাদের জন্য ৩ (তিন)টি আসন সংরক্ষিত হবে। এক তৃতীয়াংশ অ-উপজাতীয় হবে।

৪। পরিষদ এর মেয়াদ ৫ বৎসর হবে।

৫। অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি ভূমি-কমিশন থাকবে। ইহার মেয়াদ হবে তিন বৎসর এবং আঞ্চলিক পরিষদ এর পরামর্শক্রমে ইহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যাবে। কমিশন গঠনঃ-

ক) অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি।

খ) তিন সার্কেল চীফ।

গ) আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি

ঘ) তিন জেলা পরিষদ এর চেয়ারম্যান।

৬। উপজাতীয়দের মধ্যে হতে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং এই মন্ত্রণালয়কে সহায়তা দান করার জন্য নিম্নে বর্ণিত উপদেষ্টা কমিটি থাকবেঃ-

(১) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী।

(২) আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি

(৩) রাজ্যমাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি।

(৪) খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি।

(৫) বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান/প্রতিনিধি।

(৬) সাংসদ রাজ্যমাটি।

(৭) সাংসদ খাগড়াছড়ি।

(৮) সাংসদ বান্দরবান।

(৯) চাকমা রাজা।

(১০) বোমাং রাজা।

(১১) মং রাজা।

(১২) তিন পার্বত্য জেলা হতে সরকার কর্তৃক মনোনীত পার্বত্য এলাকায় স্থায়ী আদিবাসীদের ৩ জন অ-উপজাতীয় সদস্য।

৭। সরকারের অনেক গড়িমসি ও প্রস্তাবিত সংশোধনীয় আইনগুলি সংশোধন না করায় সরকার আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নিয়োগ প্রদানের পরও মিঃ লার্মা কার্যভার গ্রহণ করেননি। পরবর্তীতে জনগণ, নেতৃবৃন্দের অনুরোধক্রমে তিনি তিন পার্বত্য জেলায় সফর ও জনমত যাচাই এর পর ১২/০৫/৯৯ তারিখ ঢাকায় গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের পর কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ২৭/০৫/৯৯ইং তারিখ রাজ্যমাটিতে অভিষেক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

(১) মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিশ্রিয় লার্মা (সন্ত্র)-	চেয়ারম্যান
(২) মিঃ উষাতন তালুকদার-	সদস্য
(৩) মিঃ রূপায়ন দেওয়ান-	সদস্য
(৪) মিঃ সুধা সিদ্ধু খীসা-	সদস্য
(৫) মিঃ গৌতম চাকমা-	সদস্য
(৬) মিঃ স্নেহ কুমার চাকমা-	সদস্য
(৭) মিসেস্ মাধবীলতা চাকমা-	সদস্যা
(৮) মিঃ মংনুটিং মারমা-	সদস্য
(৯) মিঃ থৈমাটিং মারমা-	সদস্য
(১০) মিঃ কে. এস মং মারমা-	সদস্য
(১১) মিসেস্ উনুঞ্চ মারমা-	সদস্যা
(১২) মিঃ রক্তোৎপল ত্রিপুরা-	সদস্য
(১৩) মিঃ সুধা রাম ত্রিপুরা-	সদস্য
(১৪) মিঃ নুরুল আলম-	সদস্য
(১৫) মিঃ মাহাবুর রহমান-	সদস্য
(১৬) মিঃ মোঃ সফি-	সদস্য
(১৭) মিঃ মোঃ জাফর আহম্মদ-	সদস্য
(১৮) মিঃ মোঃ সফিকুর রহমান-	সদস্য
(১৯) মিঃ কাজল কান্তি দাশ-	সদস্য
(২০) মিঃ নীলু কুমার তঞ্চঙ্গ্যা-	সদস্য
(২১) মিঃ লয়েল ডেবিড বোম-	সদস্য
(২২) বেগম রওশন আরা বেগম-	সদস্যা ।

দীর্ঘদিন প্রায় দুই দশক ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জনসংহতি সমিতি তথা পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা সশস্ত্র সংগ্রাম করলেও আওয়ামী লীগ আমলে ২রা ডিসেম্বর ১৯৯৭ইং তারিখ শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয় এবং আঞ্চলিক পরিষদ এর চেয়ারম্যান মিঃ জ্যোতিরিন্দ্র বোধিশ্রিয় লার্মা (সন্ত্র) তার ২২ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিষদ কার্য্যভার গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের কিছু মহলের ষড়যন্ত্রে শেখ হাসিনা সরকার শান্তিচুক্তির শর্ত মোতাবেক আঞ্চলিক পরিষদ এর কার্য্যাদি সন্তোষজনক ভাবে কার্য্যকর করেননি। আওয়ামীলীগ সরকার প্রায় ৩ (তিন) বৎসরের অধিক ক্ষমতায় থাকার পরও ১০ই অক্টোবর ২০০১ইং সনের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি এর নিকট আওয়ামী লীগের পরাজয় হয় এবং বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠন করেন। শান্তিচুক্তির বিরোধী বিএনপি ক্ষমতায় আসায় শান্তিচুক্তি আরো বেশী বিতর্কিত হয়ে পড়ে। আসার আলো রাস্তামাটি আসন থেকে বিএনপি প্রার্থী মিঃ মনি স্বপন দেওয়ান সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং

পরবর্তীতে সরকার গঠন করার সময় মিঃ মনি স্বপন দেওয়ানকে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপ-মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। উপ-মন্ত্রী মনি স্বপন দেওয়ান বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তি, উন্নয়ন ও আঞ্চলিক পরিষদের ভূমিকা কার্যকর করার সচেষ্ট রয়েছেন এবং তিনি কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছেন বলে শুনা যাচ্ছে।

ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠী চাকমা রাজ বংশ আরম্ভ প্রায় ইতিহাসের ১২৯ বৎসর অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ইতোমধ্যে দুইটি আমল বৃটিশ আমল, পাক-আমল শেষ হয়ে বাংলাদেশ আমলের প্রায় ৩১ বৎসর পার হওয়ার পথে। বৃটিশ আমলে ১৮৭৩ইং সনে রাজা হরিশ্চন্দ্র এর রাজ সিংহাসনে আরোহনের সঙ্গে সঙ্গে এই চাকমা রাজ বংশ আরম্ভ হয়। বৃটিশ আমলে ১৯৪৭ইং পর্যন্ত প্রায় ৭৪ বৎসর এবং পাক-আমলে ১৯৭১ইং পর্যন্ত প্রায় ২৪ বৎসর শেষ হয়ে ১৯৭১ইং সনে বাংলাদেশ আমল সূচনা হয় ২৫শে নভেম্বর ১৯৭৭ইং সনে রাজা দেবাশীষ রায় এর রাজা অভিষেকের মাধ্যমে। সৎ, তরুণ, তেজোদীপ্ত নতুন রাজা, রাজা দেবাশীষ রায় জাতি ও দেশের জন্য অনেক কিছু করবেন এ হ'ল সকলের প্রত্যাশা।

রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে চাকমা রাজা ও চাকমারা বার্মা ও আরাকান ত্যাগ করতে বাধ্য হন ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে। তদানিন্তন গৌড়ের সুলতান নবাব জালাল উদ্দিন আহম্মদের কৃপায় চাকমা রাজা ও চাকমারা বাংলার পূর্বাংশে চট্টগ্রামের কক্সবাজার এলাকার আলীকদম টেকনাফ উখিয়া প্রভৃতি এলাকায় সর্ব প্রথম প্রবেশ করেন এবং বসতি গড়ে তোলেন। তৎকালীন সময়ে দলপতি বা রাজার আশ্রয়ে বসতি ও সমাজ গড়ে উঠে। চাকমা রাজা বার্মা আরাকান ত্যাগ করায় অধিকাংশ চাকমা ধীরে ধীরে বাংলায় চলে আসেন। প্রজাবৃন্দ চলে আসায় জনবল গড়ে উঠায় এবং গৌড়ের নবাবের পৃষ্ঠপোষকতায় চাকমা রাজা মনে কিছু বল ও সাহস পান। চাকমা রাজা রাজ্যে ও এলাকায় সভা পরিষদ মন্ত্রণালয় নিযুক্ত ও আত্ম রক্ষার্থে নিজস্ব সেনা বাহিনী গড়ে তোলেন। এভাবে সুলতান আমল, মোগল আমল ও বৃটিশ আমল পর্যন্ত অতিক্রান্ত হয়ে যায় এবং ১৯৪৭ইং পর্যন্ত বাংলার ভূভাগে চাকমাদের আগমন ও রাজত্ব প্রায় ৫২৯ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। ইতোমধ্যে চাকমা রাজা ও তার প্রজাবৃন্দ কক্সবাজার থেকে উত্তর দিকে সরে আসতে থাকেন। এভাবে আলীকদম কদমতলীতে প্রায় ৪০/৫০ বৎসর, রোয়াং (সম্ভবতঃ মানিকপুর) প্রায় ১৫০ বৎসর অবস্থান করে অষ্টাদশ শতাব্দির প্রথম ভাগে সুখ বিলাসে (দক্ষিণ-রাঙ্গুনিয়ায়) দ্বিতীয় রাজধানী ও মোগল বাদশা থেকে জমিদারী পত্তন করেন চাকমা রাজা। সুখবিলাসে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বসবাস করে ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে রাঙ্গুনিয়ার রাজানগরে রাজধানী স্থাপন করেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার চাকমা রাজার দুর্বলতার সুযোগে রাজানগর থেকে রাঙ্গামাটিতে চাকমা রাজার রাজধানী স্থানান্তর করতে বাধ্য করেন। তবু রাজা হরিশ্চন্দ্র এর আমলটা ১৮৮৫ইং পর্যন্ত রাজানগর চাকমা রাজার দ্বিতীয় রাজধানীরূপে বলবৎ ছিল। রাজা ভুবন মোহন রায় থেকে বর্তমান পর্যন্ত রাঙ্গামাটিই চাকমা রাজার প্রধান বাসস্থান রূপে গড়ে উঠে।

১৮৩২ খৃস্টাব্দে রাজা ধরম বকস খাঁ এর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে চাকমারা পিতৃহীন অনাথ হয়ে পড়েন। রাজা ধরম বকস খাঁ আমল পর্যন্ত চাকমা রাজার যথাক্ষিৎ সার্বভৌমত্ব, রাজশক্তি ও সামরিক শক্তি ছিল। বার্মা-আরাকান ত্যাগের পর চাকমা রাজা স্বাধীন রাজা না হলেও অর্ধ-স্বাধীন, করদ মিত্র রাজা রূপে সুলতানি আমল, মোগল আমল এবং বৃটিশ আমল ১৮৩২ইং পর্যন্ত আত্মশক্তি নিয়ে নিজ রাজ্য শাসন ও পরিচালনা করে আসতেন এবং ঐ তিন আমলে কিছু কর ও বশ্যতা স্বীকার করে স্বাধীন ভাবে ও প্রতিনিবেশি রূপে বসবাস করতেন। সুলতান আমলে চাকমা রাজার সঙ্গে নবাবের কোন বিরোধ শুনা যায়নি। বরং ১৪৩৪/৩৫ খৃস্টাব্দে আরাকান রাজা চাকমা রাজ্য আক্রমণ করলে নবাব চাকমা রাজাকে সাহায্য করার জন্য চট্টগ্রাম থেকে রায়ু সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু নবাবের সৈন্য পৌঁছার আগে চাকমা রাজা আরাকান রাজার কাছে পরাজিত হয়ে রায়ুর সন্নিকটে রাজার কুল চাকমাকুলে স্থানে সন্ধি করতে বাধ্য হন। মোগল আমলে কয়েক বার চাকমা রাজার সহিত মোগলদের শক্তি পরীক্ষা হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চাকমা রাজা ১৭১৫ খৃস্টাব্দে ও ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে ১ম ও ২য় কার্পাস চুক্তি (শান্তিচুক্তি) সম্পাদন করতে বাধ্য হন। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে বৃটিশ বাহিনী পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌল্লাহকে পরাজিত করে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন নিয়ন্ত্রণে এনে ১৭৬১ইং সনে চট্টগ্রাম অঞ্চল হাতে নিলেও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে গঠিত চাকমা রাজ্যের চাকমা রাজা ১৭৭৬ ইং পর্যন্ত বৃটিশ সরকারকে কোন কর না দিয়ে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করতে থাকেন। ১৭৭৭ইং সনে বৃটিশ সরকার ক্যান্টেন লেনাক ১৭৮০/৮১ খৃস্টাব্দে ক্যান্টেন টরমাস এর নেতৃত্বে দুই বার অভিযান প্রেরণ করেও ব্যর্থ হন এবং বৃটিশ বাহিনী দুই বারেই পরাজিত হয়ে পলায়ন করতে বাধ্য হন। চাকমা রাজার পক্ষে নেতৃত্ব দেন সেনাপতি রনু খাঁ দেওয়ান এবং সহায়তা দেন জানু খাঁ দেওয়ান এভাবে বার বার দুই বার পরাজিত হয়ে বৃটিশ বাহিনী আর জলপথে কর্ণফুলী উজানে চাকমা রাজ্য আক্রমণ করতে সাহস করেননি। ১৭৮৫ইং সনে বৃটিশ সরকার কূটনৈতিক কৌশল অবলম্বন করেন এবং এক রিয়ান সর্দার রাম মনি দোভাষীর পুত্র জয় মনি দোভাষী স্থল পথে চাকমা রাজার রাজধানী সুখ বিলাস আক্রমণ করতে পথ দেখিয়ে দিলে বৃটিশ বাহিনী রাজধানী অতর্কিত আক্রমণ করেন। চাকমা রাজা আগে খবর পেয়ে রাজানগরে পলাইয়ে যান। পরে ১৭৮৭ইং সন চাকমা রাজা কলিকাতা গিয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস এর সাথে সাক্ষাৎ করে আত্মসমর্পণ করেন। চাকমা রাজার গুরুত্ব, মান-সম্মান বিবেচনা করে গভর্নর জেনারেল চাকমা রাজাকে ক্ষমা করেন এবং একটি চুক্তি মাধ্যমে রাজ্য ফেরৎ দেন। ইহাই চাকমা রাজার সাথে বৃটিশ সরকারের শেষ যুদ্ধ ও সমঝোতা। ইহার পর চাকমা রাজার সাথে বৃটিশ সরকারের কোন যুদ্ধ বিদ্রোহ হয়নি। বৃটিশ সরকার চাকমা রাজ্যকে স্থিত রেখে দুর্বল করে শোষণ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। এরপর চাকমা রাজাকে বৃটিশ সরকার কোন দিন আর আক্রমণ করেননি। কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতা

কেড়ে নিতে থাকেন। এভাবে রাজা ধরম বকস খাঁ আমল পর্যন্ত ১৮৩২ইং রাজার মৃত্যু পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার চাকমা রাজ্যের কোন পরিবর্তন করেননি। রাজা ধরম বকস খাঁর মৃত্যুর পর তার কোন যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিলেন না।

একমাত্র নাবালিকা কন্যা, চিকনবি ওরফে মেনকাকে রেখে রাজা ধরম বকস খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। অনেক প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও হত্যাকাণ্ডের পর রাজা ধরম বকস খাঁ এর বিধবা পত্নী রানী কালিন্দী রানী রাজগদী দখল করেন ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে। এর মধ্যে কর্ণফুলী নদীর পানি অনেকদূর গড়িয়ে গেছে। চাকমা রাজ্য দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। এই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ইং সনে চাকমা রাজ্যটি তিন খণ্ডে বিভক্ত করে পশ্চিম অঞ্চল চট্টগ্রাম জেলার সাথে উত্তর পূর্ব অঞ্চল আসামের (লুসাইহিল-মিজোরাম) জুড়ে দিয়ে শুধু মধ্যবর্তী অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসনিক ইউনিট সৃষ্টি করেন। পরবর্তীতে কুমার হরিশ্চন্দ্রকে ১৮৬৮ইং সনে রাজা ধরম বকস খাঁ এর দৌহিত্র হিসাবে ব্রিটিশ সরকার রাজার উত্তরাধিকারী ঘোষণা ও ১৮৭৩ইং সনে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যাভিষেক করলেও ১৮৬৯ ইং পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা চাকমা রাজ্যটিকে পুনঃ তিন খণ্ডে চাকমা সার্কেল, বোমাং সার্কেল ও মং সার্কেল সৃষ্টির ঘোষণা দেন এবং ১৮৮১ইং খ্রিস্টাব্দে ঐ ঘোষণা কার্যকরী করেন। রানী কালিন্দী রানী ও রাজা হরিশ্চন্দ্র ইহার বিরুদ্ধে আপিল করেও কোন ফলবতী হয় নাই। এভাবে চাকমারা ১৮৩২ইং সনে পিতৃহারা ও ১৮৬০ইং সনে মাতৃহারা হয়ে অনাথ এবং অতি দুর্বল জাতিতে পরিণত হন।

১২৯ বৎসর ওয়াংখা গঝা চাকমা রাজার রাজত্বকালে চাকমারা কি হারালো ও কি পেলেন। হারানোর ঝুড়ি ভারী, প্রাপ্তির হিসাব স্বল্পতম। ওয়াংখা গঝার রাজত্ব আরম্ভ হওয়ার আগেই ১৮৩২ইং সনে পিতৃহারা (রাজা ধরম বকস খাঁ এর মৃত্যু) ও ১৮৬০ইং সনে মাতৃহারা (চাকমা রাজ্য খণ্ডিত বিভাগ ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সৃষ্টি) হন চাকমারা ও চাকমা রাজা পিতৃহারা মাতৃহারা অনাথ শিশু চাকমারা ও চাকমা রাজা এখনও বিলুপ্তি হয়নি। ইহাই জাতির জন্য বড় পাওনা। ধর্মের দিক দিয়ে চাকমারা মহাযানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী ছিলেন ১৮৫৬-৫৭ সন পর্যন্ত যাহা হিন্দু ধর্মের দ্বারাও প্রভাবিত। তাই দেখা যায় ১৮৫৬-৫৭ইং সন পর্যন্ত চাকমারা তান্ত্রিকবাদী রুলী বা রাউলী নামীয় একদল যাজক বা পুরোহিত দ্বারা যাবতীয় ধর্ম কর্ম বুদ্ধ পূজা, শিব পূজা, কালী পূজা, দুর্গা পূজা এভাবে নানা পূজা অর্চনা করতেন। যাহা প্রায় বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত প্রবলভাবে প্রচলিত ছিল। ১৮৫৬-৫৭ ইং সনে রানী কালিন্দী রানী ভদন্ত সারমেধ মহাস্থবির নিকট থেরোবাদী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ১৮৬৬ইং রাজানগরে মহামনি বৌদ্ধ মন্দির ও ১৮৬৯ইং সনে ঘিয়াং (গেং) স্থাপিত করে চাকমা সমাজে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসার করার চেষ্টা করলেও ১৬/১৭ বৎসর অর্থাৎ ১৮৭৩ইং সন পর্যন্ত কোন চাকমা রাউলীদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বৌদ্ধ ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভ সাহস করেননি।

১৮৭৩ইং সনে দীননাথ চাকমাই সর্ব প্রথম বরমিত্র ভিক্ষু নামে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তার দীর্ঘ দিন পর পুনঃচান চাকমা দ্বিতীয় ভিক্ষু হন বিজ্ঞানানন্দ ভিক্ষু নামে। এরপর কালা চোগা ভিক্ষু হন জ্ঞানরত্ন নাম দিয়ে যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শ্রীলংকা যান ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন কল্লে। ১৯১৬ইং সনে দীঘিনালায় চাকমা রাজ অফিস স্থাপিত হলে চাকমা রাজা ভুবন মোহন রায় একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। পালকধন চাকমা ভিক্ষু হয়ে ত্রিরত্ন ভিক্ষু নাম ধারণ করে তিনি দীর্ঘদিন তথায় অবস্থান করেন এবং ধর্ম প্রচার করে। ১৯৩৪ইং সনে তিনি চাকমা রাজার রাজগুরু হয়ে রাজ্যমাটিতে আসেন। ১৯৩৪ইং সনে বুংগোজার আদা ঞ্চ চাকমা উপসম্পদা নিয়ে ক্ষান্তিবরা ভিক্ষু নামে পরিচিত হয়। ইতিপূর্বে ধামাই গঝার বৃষকেতু চাকমা ১৯২৫/২৬ইং সনে উপসম্পদা নিয়ে সুবর্ণ ভিক্ষু নামে পরিচিত হন কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৩৩ইং সনে বার্মায় ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা করতে গিয়ে তথায় মৃত্যুবরণ করেন। তার পরবর্তীতে বিমলানন্দ ভিক্ষু চল্লিশ দশকে বৌদ্ধ ধর্মের ও চাকমা সমাজের উপর গবেষণা করেন। কিন্তু হঠাৎ ১৯৪৯ইং সনে তিনি মৃত্যুবরণ করায় এ ব্যাপারে শূন্যতা সৃষ্টি হয়। পরম সুভাগ্য চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে এক দিকপালের আবির্ভাব হয় পঞ্চাশ দশকের শেষ ভাগে ভদন্ত শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো ১৯৫৮ইং সনে রাজ্যমাটিতে আগমন করেন প্রায় ১০ বৎসর বার্মা খেরোবাদী বৌদ্ধ ধর্মের উপর পড়াশুনা, গবেষণা ও ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় তাকে রাজগুরু পদে বরণ করে নেন এবং চাকমা রাজ বিহারে রাজগুরুর যাবতীয় সুব্যবস্থা করে দেন। নিজ প্রতিভা প্রদীপ্ত রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাথেরো সারা পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষতঃ চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যা সমাজে খেরোবাদী বৌদ্ধ ধর্মের এক সাড়া জাগানো ধর্মের জোয়ার এনে দেন। তিনি “পার্বত্য বৌদ্ধ ভিক্ষু” ও “পার্বত্য বৌদ্ধ সমিতি” নামে দুইটি ধর্মীয় সংস্থা সংগঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুইটি সংগঠনের মাধ্যমে তিনি প্রায় সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রামের আনাচে-কানাচে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের ব্যবস্থা করেন এবং ভিক্ষু থাকার ব্যবস্থা করেন। ইতিপূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিশেষতঃ চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা অধ্যুষিত অঞ্চলে সারা বৎসরে ২/১টি বিহারেও কঠিন চীবর দানোৎসব হতো কিনা সন্দেহ। এ সময়ে প্রতি বৎসর ওয়া বা বর্ষাবাস শেষ হওয়ার পর প্রায় বিহারে পূর্ব প্রস্তুতি কর্মসূচী মোতাবেক একের পর এক এক বিহারে কঠিন চীবর দানোৎসব অনুষ্ঠিত হতে থাকে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধদের পরম সৌভাগ্য প্রায় ১০/১১ বৎসর রাজ্যমাটি সদর থানাস্থ ধনপাতা নামক গভীর অরণ্যে সাধনারত সাধনা সিদ্ধি মহাপুরুষ ১৯৬০ইং সনে ধনপাতা ত্যাগ করে দীঘিনালা থানার সদরে বনভাস্ত্রে নামে পরিচিত হয়ে ভদন্ত আর্য্য পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো গণ সমাগমে আবির্ভূত হন এবং তথায় প্রায় ১০ বৎসর, লংগদু তিনটিলায় প্রায় ৭ বৎসর অবস্থান ধর্ম প্রচার করে ১৯৭৭ইং সনে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে রাজ্যমাটি রাজবন বিহারে সশিষ্যে আগমন করেন এবং অদ্যাবধি তথায় অবস্থান করতেন। তার অপূর্ব সৃষ্টি ও

উদ্ভাবন ২৪ ঘণ্টায় তুলা থেকে সুতা কেটে কাপড় বুনে চীবর সেলাই করে কঠিন চীবর দানোৎসব সম্পাদন যাহা নাকি মহোপাসিকা বিশাখা প্রবর্তন করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং জীবিত অবস্থায়। এই মহামানবের ধর্ম দেশনা ও ধর্ম প্রচার শুধু পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বাংলাদেশের সীমারেখা অতিক্রম করে বহু দেশে-বিদেশে সরিয়ে পড়েছে। দেশের তার ভক্তবৃন্দ ছাড়াও বিদেশের বহু নাগরিক ও ভক্তবৃন্দ তার সামান্যতম দর্শন ও দেশনা শুনার জন্য আকুল। বর্তমানে তিনি আর্য্য পুরুষ শ্রাবক বুদ্ধরূপে পরিচিতি হয়ে পড়েছেন। তার ধর্ম দেশনা ও ধর্ম প্রচারে চাকমাদের বৌদ্ধদের বহু কুসংস্কার দূরীভূত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে রাজবন বিহারের প্রায় ৬০ (ষাট) টি শাখা বিহার ও পৌনে পাঁচ শতাধিক শিষ্য প্রশিষ্য নিয়ে তার ধর্মীয় পরিমন্ডল গঠিত হয়েছে এবং উত্তরোত্তর শাখা বিহারের সংখ্যা ভিক্ষু সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বত্য ভিক্ষু ও বন ভাস্কের ভিক্ষু মিলে বর্তমানে পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় সহস্রাধিক ভিক্ষু রয়েছেন বলে জানা যায়। উভয় ভিক্ষু দল নিজ নিজ পরিমন্ডলের আওতায় নিজ নিজ কর্তব্য কর্মে রত রয়েছেন।

চাকমা রাজা দেবাশীষ রায়, দেশের মানুষ, রাজা ও নেতা হিসাবে একজন সকলগুণের অধিকারী ব্যক্তিত্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চাকমা রাজা ফতে খাঁ তার সেনা নায়ক কাপু খাঁকে নিয়ে সমগ্র ভূ-ভারত বিজয়ী একদল মোগল সেনাকে কল্লবাজার এলাকায় অতর্কিতে আক্রমণ করে দুইটি বৃহৎ আকারের কামান ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। উহার মধ্যে একটি ফতে খাঁ কামানটি এখনও চাকমা রাজার রাজ-দরবারের প্রাঙ্গণে অতীতের গৌরব ঘোষণা করতেছে। অপরটি নাকি ব্রিটিশ সরকার লঞ্চ নিয়ে যাওয়ার সময় লঞ্চ থেকে কর্ণফুলী নদীতে পড়ে যায়। আর পাওয়া যায়নি। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় সেইকালে জনগৃহহণ করলে, কামান না হউক, একটা কিছু ছিনিয়ে আনতেন বা সেইরূপ কোন শৌর্য্য-বীর্য্য দেখাতে পারতেন। চাকমা জাতি ও চাকমা রাজার সকল অতীত গৌরব হারিয়ে গেছে। এখন চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় কোন কামান বা অন্য কিছু ছিনিয়ে না আনলেও, তিনি পৃথিবীর গোলকটা এপিঠ ওপিঠ সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছেন একবার আমেরিকা, একবার ল্যাটিন আমেরিকা, একবার ইউরোপের বিভিন্ন-দেশে, এশিয়ার বহু দেশে বিশ্বের কোন মহাসম্মেলনে, সেমিনারে, বৈঠকে যোগদান করতেছেন জাতি ও দেশের ভাগ্য উন্নয়ন ও রক্ষার জন্য তিনি ঘরে বসে নেই। চাকমা রাজা দেবাশীষ রায় এর কাজ, প্রচেষ্টা ও অবদান অতুলনীয় ও অভাবনীয়। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে জাতির ভাগ্য ও কর্ম অর্পণ করে ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস এখানে সমাপ্ত করলাম।

ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠীর চাকমা রাজ বংশের বিজক বা তালিকা

বর্তমান চাকমা রাজ পরিবার এর বংশ পরিচিতি ও তালিকা
(ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠী)

(রাজা ধরম বকস খাঁ এর মৃত্যুর পর (১৮৩২ খৃস্টাব্দ) পূর্ববর্তী চাকমা রাজ বংশের শাসন (মুলিমা গঝা চাকমা রাজ বংশ) শেষ হয়।

গোপীনাথ দেওয়ান (জাতীয় বীর রনু খাঁ দেওয়ান এর প্রপৌত্র ও
ওয়াংখা গঝা কালা কাঙারা গোষ্ঠী)

শ্রী রাজকন্যা মেনকা ওরফে চিকনবি (রাজা ধরম বক্স খাঁ এর
৩য় শ্রী রানী হারিবি এর গর্ভজাত কন্যা)



১ম পুরুষ	রাজা হরিশ্চন্দ্র (১৮৪১-১৮৮৫ইং)	(ওয়াংখা গঝা ১ম রাজা)
	১ম শ্রী রানী সৌরিশ্রী রায়	২য় শ্রী রানী মনোমোহিনী রায়



২য় পুরুষ	(১) রাজা কুমারী স্বর্ণময়ী রায় স্বামী কৃষ্ণ কিশোর দেওয়ান (তন্যা গঝা) ঘাগরা	(২) রাজা ভুবন মোহন রায় ২য় রাজা (১৮৭৬-১৯৩৪ ইং) ১ম এন্ট্র্যান্স পাশ/১৮৯৩ ইং
-----------	--	---

(৩) কুমার রমনী মোহন রায়
(১৮৮১-১৯৬১ ইং)
এন্ট্র্যান্স/১৮৯৭ ইং
শ্রী- সরসী বালা রায় (দেওয়ান)

রাজা ভুবন মোহন রায়- ২য় পুরুষ ও ২য় রাজা
১ম স্ত্রী রানী দয়াময়ী রায় (দেওয়ান)



৩য় পুরুষ (১) রাজ কুমারী বিজন বালা (১৮৯৯-১৯৮১) স্বামী- যামিনী কুমার দেওয়ান চাকমা ১ম গ্র্যাজুয়েট বিএ/১৯১৩ (১৮৯০- ১৯৬৫)	(২) রাজা নলিনাক্ষ রায় ৩য় রাজা (১৯০২-১৯৫১) বিএ/১৯২৫ স্ত্রী রানী বিনীতা রায় (সেন) (৩) কুমার বিরূপাক্ষ রায় মেট্রিক/২৩ স্ত্রী সুধীরা বালা রায়
---	---

২য় স্ত্রী রমাময়ী রায় (দেওয়ান)



৩য় পুরুষ (৪) রাজ কুমারী সুসমা বালা স্বামী প্রতুল চন্দ্র দেওয়ান	(৫) রাজ কুমারী নিহার বালা স্বামী মং প্র সাইন চৌধুরী (মং রাজা) (৬) কুমার উৎপলাক্ষ রায় (আই.এ) স্ত্রী তপতি রায়।
---	--

৩য় পুরুষ (৭) কুমার কোকনদাক্ষ রায় ১ম এম.এ বাংলা/১৯৩৭	(৮) কুমার কুবলয়াক্ষ রায় আই.এ স্ত্রী রমা রায় (৯) কুমার মঞ্জুলাক্ষ রায়, মেট্রিক স্ত্রী রেনুকা রায়
--	--

৩য় পুরুষ (১০) কুমার দিব্যাক্ষ রায়
স্ত্রী লতিকা রায়

রাজা নলিনাক্ষ রায়- ৩য় পুরুষ ও ৩য় রাজা
স্ত্রী রানী বিনীতা রায়



৪র্থ পুরুষ (১) রাজ কুমারী অমিতি রায় স্বামী লে: কর্ণেল হিউম	(২) রাজা ত্রিদিব রায় (১৯৩৩-২০১২ইং) ৪র্থ রাজা জন্ম- ১৪ই মে/০৩৩, মৃত্যু- ১৭ই সেপ্টেম্বর/২০১২ স্ত্রী রানী আরতি রায় (৩) কুমার সমিত রায় এম. এ/৬৮ ইতিহাস স্ত্রী জয়তি রায়।
--	--

রাজা নলিনাক্ষ রায়



৪র্থ পুরুষ (৪) রাজ কুমারী মৈত্রী রায়
এম. এ/৬৯ ইংরেজী
স্বামী: লে: কর্ণেল হিউম

(৫) রাজ কুমারী রাজশ্রী রায়
বি.এ
স্বামী কুমার জয়সিনজী ঝাল

(৬) কুমার নন্দিত রায়
শ্রী ঝর্ণা রায়

রাজা ত্রিদিব রায়- ৪র্থ পুরুষ ও ৪র্থ রাজা
১ম শ্রী রানী আরতি রায়



৫ম পুরুষ (১) রাজ কুমারী চন্দ্রা রায়
এম.এ
স্বামী- জে. ও. এইচ. এন
হেনরিকসন

(২) রাজা দেবানীষ রায়- ৫ম রাজা
(১৯৫৯)
বিএ ও ব্যারিষ্টার
১ম শ্রী রানী তাড়ু রায়, এম. এ (ইংরেজী)
মৃত্যু ১৯৯৮,
২য় শ্রী রানী যেন যেন রায়
(৩) কুমার শিবানীষ রায়
বিএ
শ্রী গাব্রিএলা টংবেলা ২য় শ্রী মোনালিসা

৫ম পুরুষ (৪) কুমার ইন্দ্রানীষ রায়

(৫) রাজ কুমারী ত্রিবেনী রায়
বিএ
স্বামী পাবেল খীসা মৃত

রাজা ত্রিদিব রায়
২য় শ্রী রানী অঞ্জলী রায়



৫ম পুরুষ (৬) চাঁদ রায়, বি, এ (অনার্স)
শ্রী সোনালিতা রায়

(৭) রাজ কুমারী পিয়া রায় এম. এ (ইংরেজী)
স্বামী ডাঃ সুমেধ দেওয়ান
এম.বি.বি.এস ও চক্ষু বিশেষজ্ঞ

রাজা ত্রিদিব রায়
৩য় শ্রী রানী মার টিং কুয়েন ট্রিক রায়



৫ম পুরুষ (৮) কুমার পদ্মসম্ভব ওয়েনহেল রায়

রাজা দেবশীষ রায়- ৫ম পুরুষ ও ৫ম রাজা
 জ্ঞী রানী তাতু রায়, মৃত্যু (১৯৯৮)
 ২য় রানী য়েন য়েন রায়
 ↓

৬ষ্ঠ পুরুষ	(১) কুমার ত্রিভুবন আর্থদেব রায় জন্ম- ১১/০২/১৯৯০	(২) রাজ কুমারী আরাধনা আয়েজী রায় জন্ম- ১৬/১০/১৯৯৪ইং।
------------	---	--

২য় পুরুষ কুমার রমনী মোহন রায়
 জ্ঞী সরসী বালা রায় (দেওয়ান)
 ↓

৩য় পুরুষ	(১) অনিল রায় জ্ঞী ইন্দুমতি রায়	(২) নিরুপম রায় মেট্রিক/৩১ জ্ঞী শৈলজা রায়	(৩) অরুণ রায় জ্ঞী সাধনা রায়
-----------	-------------------------------------	--	----------------------------------

৩য় পুরুষ	(৪) সলিল রায় মেট্রিক/৪৭ জ্ঞী সুনিতা রায় (দেওয়ান)	(৫) ইন্দ্রানী রায় স্বামী প্রভাত কুমার দেওয়ান বি. এ/৩৬, বিএ বিটি
-----------	--	---

৩য় পুরুষ অনিল রায় ইন্দুমতি রায়
 ↓

৪র্থ পুরুষ	(১) অসীম রায় মেট্রিক/৫২ ১ম জ্ঞী নিবেদিতা রায় ২য় জ্ঞী মমতা রায়	(২) রমেন রায়, মেট্রিক জ্ঞী অনামিকা রায়	(৩) মলয় রায় জ্ঞী অমর শশী রায়
------------	--	---	------------------------------------

৪র্থ পুরুষ	(৪) সুদত্তা রায় মেট্রিক স্বামী কপিলেন্দু দেওয়ান	(৫) লিপিকা রায় স্বামী ফুলেশ্বর চাকমা বিএ
------------	--	---

৩য় পুরুষ নিরুপম রায়-শৈলজা রায়
 ↓

৪র্থ পুরুষ	(১) জয়শ্রী রায়, মেট্রিক স্বামী কুশল দেওয়ান বিএসসি/৫৯ পরিচালক, কৃষি বিভাগ	(২) সোমেন রায় জ্ঞী জিনা রায়	(৩) অদ্যুত রায় জ্ঞী সুমনা রায়
------------	--	----------------------------------	------------------------------------

৪র্থ পুরুষ	(৪) কৌশিক রায় জ্ঞী শিল্পী রায়	(৫) সুমিতা রায়	(৬) নীলা রায় স্বামী প্রব জ্যোতি দেওয়ান
------------	------------------------------------	-----------------	---

৩য় পুরুষ অরুণ রায়-সাধনা রায়



৪র্থ পুরুষ	(১) অতনু রায় স্বামী অনিন্দিতা রায়	(২) কিরিটি রায়, বিএ স্বামী বীথিকা রায়	(৩) পুলক রায় এম, এ (ইং) বি, এড্ স্বামী গীতা রায়	(৪) হিমাদ্রী রায় স্বামী বেবী রায়
------------	--	--	---	---------------------------------------

৪র্থ পুরুষ	(৫) সুপর্ণা রায় স্বামী সুশোভন দেওয়ান ডিপ্রোমা প্রকৌশলী	(৬) অর্চনা রায়	(৭) শিপ্রা রায় স্বামী রামেন্দু বিকাশ চাকমা
	(৮) কনকনা রায় স্বামী সুনীল কুমার কার্বারী		(৯) অনুভা রায় বিএ স্বামী শেখর দত্তিদার এম.এ

৩য় পুরুষ সলিল রায়-সুনিতা রায়



৪র্থ পুরুষ	(১) তনয় রায় (দিনা) বিএ স্বামী স্মৃতি রায়	(২) সঞ্চয় রায় স্বামী জোনাকি রায়	(৩) শ্রীময় রায় এমবিবিএস
			(৪) প্রতীম রায় এল.এল.এম স্বামী দীপা রায়

৪র্থ তনয় রায়-স্মৃতি রায়



৫ম পুরুষ	(১) প্রসন্ন রায়	(২) শৈলেশ রায়	(৩) সুস্মিতা রায়
----------	------------------	----------------	-------------------

৪র্থ সঞ্চয় রায়-জোনাকী রায়



৫ম পুরুষ	(১) বন্দিতা রায়	(২) সুরজিৎ রায়
----------	------------------	-----------------

৪র্থ প্রতীম রায়-দীপা রায়



৫ম পুরুষ (১) ইরিন্ৎ রায়

৩য় পুরুষ বিরূপাক্ষ রায়-সুধীরা বালা রায়

৪র্থ পুরুষ	(১) চিরঞ্জীব রায় বিএসসি/৪৯ শ্রী পূর্ণিমা রায়	(২) রাজীব রায় শ্রী রাজ কুমারী উনিকা দেবী রায়	(৩) পার্শ্ব রায় শ্রী অমলা রায়
------------	--	---	------------------------------------

৪র্থ চিরঞ্জীব রায়-পূর্ণিমা রায়

৫ম পুরুষ	(১) দেবপ্রিয় রায় বিএ অনার্স অধ্যয়ন শ্রী মিসিকো রায় বি.কম অনার্স/৮১ (১ম)	(২) রাহুল রায় বিএসসি প্রকৌশলী টেক্সটাইল শ্রী পুতুলী রায়	(৩) জীবক রায় আইএ শ্রী সুমিতা রায়
----------	---	--	--

৫ম পুরুষ	(৫) শর্মিলা রায়, আইএ স্বামী-বিদেশী	(৬) ঐন্দ্রিলা রায়, আইএ স্বামী রমেল খীসা, এমএ
----------	--	--

৪র্থ রাজীব রায়-উনিকা দেবী রায়

৫ম পুরুষ	(১) চিনাক্ষ ছেইন (মঙ্গু) রায়	(২) ছেইচিন ঞ্চ (গুলা) রায়	(৩) নিঞ ছেইন (বুলি) রায়
	(৪) সইনেচিন (গুরিয়া) রায়	(৫) পাইচিন (পাপড়ি) রায়	(৬) হ্লাচিন (ময়ূরী) রায়

৪র্থ পার্শ্ব রায়-অমলা রায়

৫ম পুরুষ	(১) হৃদক রায়, আইএ শ্রী পান্নী রায়, এমএ	(২) রাজেশ রায়	(৩) গিভি রায়	(৪) শর্মিষ্ঠা রায় স্বামী বিদেশী
----------	---	----------------	---------------	-------------------------------------

৪র্থ অসীম রায়-নিবেদিতা রায়, মমতা রায়

৫ম পুরুষ	(১) মানস রায় শ্রী কানন রায়	(২) নীরেল রায়	(৩) খুর্জি রায়
----------	---------------------------------	----------------	-----------------

৪র্থ রমেন রায়-অনামিকা রায়

৫ম পুরুষ	(১) ইন্দ্রনীল রায়	(২) নাচিকেতা রায় শ্রী শতাব্দী রায়	(৩) বীতেশ রায়	(৪) নীতেশ রায়
----------	--------------------	--	----------------	----------------

৪র্থ মলয় রায়-অমর শশী রায়



৫ম পুরুষ (১) মনিকুন্ডল রায় (২) সম্ভোষ রায় (৩) নয়ন রায় (৪) মিথিলা রায়

৪র্থ সোমেন রায়-জিনা রায়



৫ম পুরুষ (১) বেজী রায় (২) নীটোল রায়

৪র্থ অদ্যুত রায়-সুমনা রায়



৫ম পুরুষ (১) রাত্রি রায় (২) তখী রায়

৪র্থ অতনু রায়- অনিন্দিতা রায়



৫ম পুরুষ (১) রত্ন দ্বীপ রায় (২) পল্লব রায় (৩) ঋতুশ্রী রায়

৪র্থ কিরিটি রায়-বীথিকা রায়



৫ম পুরুষ (১) শুভজা রায় (২) মৌসুমী রায় (৩) নবাকুশ রায়

৪র্থ পুলক রায়-গীতা রায়



৫ম পুরুষ (১) সীমন্ত রায় (২) পাঙ্ক রায়

৪র্থ হিমাদ্রী রায়-বেবী রায়



৫ম পুরুষ (১) অর্জন রায় (২) পূজা রায়

৪র্থ কৌশিক রায়-শিল্পী রায়



৫ম পুরুষ (১) সূর্য রায়

৩য় কুমার উৎপলাক রায়-তপতি রায়



৪র্থ পুরুষ (১) তপন রায়, আই.এ (২) আশীষ রায়, এম.এ, (৩) তনুশ্রী রায়, আই.এ,
(৪) রূপশ্রী রায়, (৫) তরুণ রায়, বি.এ

৩য় কুমার কুবলয়াক রায়-রমা রায়



৪র্থ পুরুষ (১) অমিতাভ রায়

৩য় কুমার মঞ্জুলাক রায়-রেনুকা রায়



৪র্থ পুরুষ	(১) উজ্জ্বলা রায় স্বামী সুকুমার দেওয়ান	(২) রূপম রায় আই.এ শ্রী রেহেনা রায়	(৩) বিক্রম রায় বি.কম অনার্স শ্রী বিপাশা রায়	(৪) উত্তরা রায় এম.এ (ইতিহাস) স্বামী তপন চৌধুরী এম.এ
------------	---	---	---	---

৪র্থ পুরুষ	(৫) করবী রায় মেট্রিক স্বামী কুমার বরণ দেওয়ান মেট্রিক	(৬) নেলী রায় আই.এ স্বামী ভারত চন্দ্র খীসা উপ-সহঃ প্রকৌঃ	(৭) কাবেরী রায় স্বামী টুটুন্যা চাকমা (৮) গৌতম রায় বি.এ শ্রী হৈমন্তী রায় বি.এ
------------	---	---	--

৪র্থ পুরুষ	(৯) লিলি রায় এম.এ (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	(১০) প্রিতম রায় বি.এ
------------	---	--------------------------

৪র্থ পুরুষ রূপম রায়-রেহেনা রায়



৫ম পুরুষ (১) সংবতিকা রায় (আই.এ) (২) নাদিকা রায় (মেট্রিক)

৪র্থ বিক্রম রায়-বিপাশা রায়



৫ম পুরুষ (১) প্রাঞ্জল রায় (আই.এ) (২) রূপসন্ধ্যা রায়

৪র্থ গৌতম রায়-হৈমন্তী রায়



৫ম পুরুষ:

৪র্থ প্রিতম রায়



৫ম পুরুষ (১) রকেট রায়

৩য় পুরুষ কুমার দিব্যাক্ষ রায়-লতিকা রায়



৪র্থ পুরুষ	(১) অবন্তী রায় আই.কম শ্রী পদ্মা তালুকদার বি.এ বিএড্	(২) মনুয় রায় মেট্রিক শ্রী অসীমা রায়	(৩) দেবিকা রায় স্বামী রনজিত কুমার চাকমা আই.কম (৪) গীতিকা রায় স্বামী রবীন্দ্র লাল চাকমা মেট্রিক
------------	---	---	---

৪র্থ পুরুষ	(৫) ভূপেশ রায় আই.এম.সি শ্রী শিখা রায় বি.এ	(৬) উমেশ রায় বিএ শ্রী কাবেরী রায় আই.এ (হেডম্যান)	(৭) বিখীকা রায় মেট্রিক স্বামী অসীম দেওয়ান আই.এ
------------	--	---	---

৪র্থ অবন্তী রায়-পদ্মা তালুকদার



৫ম পুরুষ (১) পথিকৃত রায় (২) শ্রাবন্তী রায় (ম্যাট্রিক)

৪র্থ মনুয় রায় - অসীমা রায়



৫ম পুরুষ (১) দিঘিজয় রায় (২) বিপ্লব রায়

৪র্থ ভূপেশ রায়-শিখা রায়



৫ম পুরুষ (১) স্নিগ্ধা রায় (আই.এ) (২) রঞ্জত শুভ্র রায় (মেট্রিক) (৩) গৌবিন্দ রায়

৪র্থ উমেশ রায়-কাবেরী রায়



৫ম পুরুষ (১) যাত্রী রায় তীর্থ জিং রায়

৪র্থ পুরুষ কুমার সমিত রায় (জনি) - জয়তি রায় মেট্রিক
এম.এ (ইতিহাস),

৫ম পুরুষ (১) উজ্জয়িনী রায় (২) সমুদ্রজিং রায় (৩) শায়ন্তিনী রায়, এল. এল. বি
বিএ
স্বামী আন্ততোধ চাকমা
বিএ

৪র্থ কুমার নন্দিত রায় (রেনি) - ঝর্ণা রায় (ধক্ক বিএ)



৫ম (১) ভাকুর রায় (ট্রিনি এমবিএ) (২) ডা: লুশ্বিনী রায় (এমবিবিএস)

রাজ পরিবারে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ (২০০০ইং) পর্যন্ত

ক- গ্র্যাজুয়েটঃ

- ১। রাজা নলিনাক্ষ রায় বিএ/১৯২৫
- ২। মিঃ চিরঞ্জীব রায়, বিএসসি/১৯৪৯
- ৩। চাঁদ রায়, বি, এ (অনার্স)
- ৪। রাজা দেবাশীষ রায়, বিএ ও ব্যারিষ্টার।
- ৫। কুমার শিবাশীষ রায়, বিএ
- ৬। রাজ কুমারী ত্রিবেণী রায়, বিএ
- ৭। মিঃ কিরিটি রায়, বিএ
- ৮। মিঃ তন্ময় রায়, বিএ
- ৯। শ্রীময় রায়, এমবিবিএস
- ১০। মিঃ রাহুল রায়, বিএসসি প্রকৌঃ (টেক্সটাইল)
- ১১। মিঃ বিক্রম রায়, বি.কম (অনার্স)
- ১২। মিঃ গৌতম রায়, বিএ
- ১৩। মিঃ প্রিতম রায়, বিএ
- ১৪। মিঃ উমেশ রায়, বিএ
- ১৫। মিসেস্ উজ্জয়িনী রায়, বিএ
- ১৬। মিঃ তরুণ রায়, বিএ

খ- মাস্টার্স ডিগ্রীধারীঃ

- ১। কুমার কোকনদাক্ষ রায়, এম. এ/১৯৩৭
- ২। কুমার সমিত রায়, এমএ (ইতিহাস)
- ৩। রাজ কুমারী মৈত্রী রায়, এমএ (ইংরেজী)
- ৪। রাজ কুমারী রাজশ্রী রায়, এমএ
- ৫। রাজ কুমারী চন্দ্রা রায়, এমএ, এলএলএম
- ৬। রাজ কুমারী প্রিয়া রায়, এমএ (ইংরেজী)
- ৭। উত্তরা রায়, এমএ (ইতিহাস)
- ৮। লিলি রায়, এমএ (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)
- ৯। মিঃ আশীষ রায়, এমএ
- ১০। প্রতীম রায় (পাস্পু) এলএলএম অনার্স সহ
- ১১। পুলক রায়, এম. এ (ইং) বি.এড্
- ১২। ভাস্কর রায় (ট্রেনি) এমবিএ
- ১৩। ডাঃ লুখিনী রায়, এমবিবিএস

বিদ্রঃ জরিপের পর আরো গ্র্যাজুয়েট ও মাস্টার্স ডিগ্রীধারী সংযোজন হতে পারে। বাহা জানা যায়নি।

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত

- ১। নামঃ কুমুদ বিকাশ চাকমা।
- ২। পিতার নামঃ প্রয়াত অশ্বখামা চাকমা, ধামাই গঝা লেজা তদেগা শুতি।
- ৩। মাতার নামঃ প্রয়াত পুন্যাবি চাকমা, শুড় কাষেই গঝা মেন্দর শুতি।
- ৪। স্ত্রী এর নামঃ প্রয়াত গীতা রানী চাকমা।
- ৫। স্বত্তরের নামঃ প্রয়াত গোল মনি চাকমা (দারোগা), শুড় কাষেই গঝা মেন্দর শুতি।
- ৬। শাশুড়ির নামঃ প্রয়াত স্বর্ণ লতা চাকমা, ধামাই গঝা তদেগা শুতি।
- ৭। জন্মঃ ৪ঠা মার্চ ১৯৩৫ইং (প্রকৃত), ২৩শে মার্চ ১৯৪০ মেট্রিক সনদপত্র।
- ৮। জন্ম স্থানঃ ধূল্যাছড়ি ১০৫ জীবতলী মৌজা, রাজামাটি সদর, রাজামাটি।
- ৯। শিক্ষা দীক্ষাঃ ধূল্যাছড়ি, এম ই স্কুল থেকে ১৯৫১ সনে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস, রাজামাটি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৬ইং সনে ২য় বিভাগে মেট্রিক পাস, স্যার আশুতোষ কলেজ কানুনগো পাড়া থেকে ১৯৫৮ইং সনে ৩য় বিভাগে আইএ পাস এবং ঐ কলেজে বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন।
- ১০। বিবাহঃ ১৩ই নভেম্বর ১৯৬০ইং।
- ১১। পুত্র কন্যাঃ
 - (১) রিনাক্ষী জন্ম ১৯৬৪, আইএ পাস (১৯৮৪ইং)
 - (২) দ্রৌপদ জন্ম ১৯৬৬, বিএ (১৯৯২ইং)
 - (৩) কৌশিক জন্ম ১৯৬৮, বিএসসি (অনার্স) এমএসসি (১৯৯৫ইং)।
- ১২। কর্ম জীবনঃ
 - (১) ১৯৬১-১৯৬৯সনে পুনর্বাসন বিভাগে এসিস্টেন্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার পদে কর্মরত।
 - (২) ১৯৬৯-১৯৯৭ইং সনে সমবায় বিভাগে সহকারী পরিদর্শক পদে যোগদান, পদোন্নতি হয়ে সমবায় পরিদর্শক পদে ১৯৯৭ইং সনে চাকুরী থেকে অবসর।
- ১৩। বর্তমান ঠিকানা ও অবসর জীবনঃ খাদ্যশুদাম এলাকা, তবলছড়ি, রাজামাটি। ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে জড়িত। ১৯৯৯-২০১০ইং সনে ভারতে বুদ্ধ গয়া চাকমা বুদ্ধিষ্ট টেম্পল নির্মাণ ও উৎসর্গ। ১৯১০ইং হতে ১৯১৩ইং পর্যন্ত ধনপাতা বন বিহারে মন্দির নির্মাণ ও সমাপ্তির পথে।
- ১৪। স্থায়ী ঠিকানাঃ গ্রামঃ জীবতলী, ডাকঘর- মারিশা, থানা- বাঘাইছড়ি, জেলা- রাজামাটি।
- ১৫। দেশ ও তীর্থ ভ্রমণঃ
 - (১) ১৯৯৭ইং সনের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে আরাকান ও মায়ানমার (বার্মা) ভ্রমণ।
 - (২) ১৯৯৮, ২০০১ইং ও ২০০৬ইং সনে ভারতে তীর্থ যাত্রা ও ভ্রমণে বুদ্ধগয়া, সারণাথ, কুশীনগর, লুম্বিনী (নেপাল), শ্রাবস্তি, বৈশালী, রাজগীর, নালন্দা প্রভৃতি দর্শন।
 - (৩) ২০০১ ও ২০০৪ইং সনে ত্রিপুরায় ভ্রমণ ও আগরতলা, মৌনগাঁও, দেড়গাঁও, (পেচায়তল), শীলছড়া, যতনবাড়ী নতুন বাজার, অমরপুর, উদয়পুর দর্শন।

১৬। প্রকাশনাঃ

(ক) যৌথভাবে প্রকাশনাঃ-

(১) বন ভাস্কের দেশনা ২য় খণ্ড ও ৩য় খণ্ড (ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া) যথাক্রমে ১৯৯৬, ১৯৯৮ইং।

(২) সফল আত্ম জীবনী ও চাকমা সমাজ ব্যবস্থা ডাঃ প্রমোদ বিকাশ তালুকদার, ১৯৯৯ইং।

(৩) চাকমা জাতির সমাজ ব্যবস্থা (খসড়া) কুমুদ বিকাশ চাকমা ২০০০ইং সন।

(খ) এককভাবে সংকলন ও সম্পাদনাঃ-

(১) শিক্ষাক্ষেত্রে চাকমা জাতির অগ্রগতি ২০০০ইং (গবেষণা গ্রন্থ)।

(২) ধামাই গঝা লেজা তদেগা শুভি বিজক বা বংশ তালিকা ১ম সংস্করণ ২০০০ইং সন।

(৩) চাকমা বুদ্ধি টেম্পল ও ধর্মশালা বুদ্ধগয়া এর ইতিবৃত্ত ও রাস্তামাটি বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ এর কার্যক্রম ১ম সংস্করণ ২০১২ইং।

(৪) রাস্তামাটি পার্বত্য জেলা বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ এর স্মরণিকা ও বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন ১ম খণ্ড থেকে ৭ম খণ্ড (১৯৯৯ থেকে ২০১১ইং)।

(৫) ধনপাতা বন বিহার উন্নয়ন পরিক্রমা- ১,২,৩ (২০০৯-২০১১ইং)

(৬) চাকমা দুই রাজ বংশ ২০১৩ (প্রকাশনার পথে)।

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান ২য় খণ্ড-অপ্রকাশিত।

(৮) পার্বত্য চট্টগ্রামের কৃতি সন্তান ৩য় খণ্ড বিশেষ সংখ্যা (অপ্রকাশিত)।

(৯) আমার দেশাজীবন (আত্ম জীবনী) অপ্রকাশিত।

(১০) শুড় কাখেই গঝা বিজক বা বংশ তালিকা ১ম সংস্করণ ২০১০ অপ্রকাশিত।

১৭। প্রকাশনা (২)

(গ) লেখকের অন্যান্য প্রকাশিত রচনাবলীঃ-

(১) শ্রদ্ধেয় বনভাস্কের সফল জীবন বৃত্তান্ত সূত্র বনভাস্কের দেশনা ৩য় খণ্ড ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া ১৯৯৮ইং।

(২) পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা অগ্রদূত-কৃষ্ণ কিশোর চাকমা, সূত্র বাংলাদেশ শিশু একাডেমী রাস্তামাটি পৃষ্ঠা- ৪১

(৩) বার্মা (মায়ানমার) সফর, সূত্র টঙ জুম ইনস্টিটিউট কাউন্সিল (জাক)০৬/ পৃষ্ঠা ১৪৫।

(৪) বুদ্ধগয়া তীর্থ ভ্রমণ ২০০৬,

সূত্র: জুম সাংঘাই সংকলন/০৮ পৃষ্ঠা- ১৭৫

(৫) একান্ত সাক্ষাৎকার

সূত্র গুপ্তগীতি/২০০৩, পৃষ্ঠা- ৬৫

(৬) রাজগুরু শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাধেরো এর সফল জীবনী।

সূত্র দীপ্তি চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ স্মারক পৃষ্ঠা- ১০৯।

(৭) বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে নন্দপাল ভাস্কের অবদান

সূত্র- নন্দপাল ভাস্কের জন্ম স্মারক ৬১ তম ১০ই মে/২০১৩

১৮। সাংগঠনিক কার্যক্রমঃ

- (১) রাজ্যমাটি বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ এর সাধারণ সম্পাদক ৩ মেয়াদ (১৯৯৯-২০১১ইং পর্যন্ত)
- (২) রাজ্যমাটি বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ-সভাপতি, ৪র্থ পরিচালনা কমিটি (২০১২ - ২০১৪ ইং) পর্যন্ত।
- (৩) রাজবন বিহার ভিক্ষু মন্ডলীদের ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনা কমিটি ম্যানেজার ২০০৬ ইং।
- (৪) উন্নয়ন কমিটি ধনপাতা বনবিহার, রাজ্যমাটি অধ্যায় এর সভাপতি ২০০৯-২০১৪ ইং।
- (৫) রাজ্যমাটি জেলা পরিষদে এর সম্মাননা/২০০১ এর কমিটির সদস্য ও বিচার মন্ডলীর সদস্য।
- (৬) বে-সরকারী সংস্থা আশিকা-মান উন্নয়ন কেন্দ্র এর সভাপতি কয়েক মেয়াদ।
- (৭) রাজবন ভাবনা কেন্দ্র (কাটাছড়ি), উপদেষ্টা কমিটি সদস্য।
- (৮) সম্বোধি ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি, উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য
- (৯) ধনপাতা বন বিহার পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা সদস্য।
- (১০) রাজ্যমাটি সমবায় ব্যাংক পরিচালক (কয়েক মেয়াদ)
- (১১) রাজ্যমাটি হাউজিং সমবায় সমিতির সভাপতি ২০০৯- ২০১৪ ইং।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

- ১। The Hill Tracts of Chittagong and the Dwellers therein 1869, by T. H. Lewin
- ২। History of Burma 1883 by Lt. General Sir Arthur P. Phayree.
- ৩। A Fly on the Wheel, 1912 by T. H. Lewin
- ৪। History of Chittagong, 1981 by Dr. S. B Qanungo
- ৫। History of Arakan, 1994 by Dr. Mohammed Yunus.
- ৬। Chakma Resistance to British Domination 1998, Dr. S. B Qanungo
- ৭। Dr. Francis Buchanan in South East Bengal 1798 Published 1992. edited by Wellem van Schendol
- ৮। চাকমা জাতি ১৯০৯, সতীশ চন্দ্র ঘোষ।
- ৯। চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস ১৯১৯ রাজা ভুবন মোহন রায়।
- ১০। শ্রী শ্রী রাজানামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস ১৯৪০ মাধব চন্দ্র চাকমা (কর্মী)।
- ১১। চাকমা জাতির ইতিবৃত্ত ১৯৬৯ বিরাজ মোহন দেওয়ান।
- ১২। পার্বত্য চট্টলের এক দীন সেবকের জীবন কাহিনী, ১৯৭০ কামিনী মোহন দেওয়ান।
- ১৩। পার্বত্য রাজ লহরী ১৯৬২ নোয়ারাম চাকমা।
- ১৪। ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস ১৯৭৭ অধ্যাপক কে, আলী এম, এ।
- ১৫। পার্বত্য চট্টগ্রামের পরিচিতি ১৯৭৮, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।
- ১৬। চাকমা জাতি ও চাকমা রাজ বংশের ইতিহাস (১৯৬১-৬২) ১৯৮১ প্রাণহরি তালুকদার।
- ১৭। স্বধর্ম পথে ১৯৮০ শ্রী আঙু ফুলচান কার্বারী।
- ১৮। চাকমা পরিচিতি ১৯৮৩, সুগত চাকমা (ননাধন)।
- ১৯। চাকমা ইতিহাস বিচার ১ম খন্ড ১৯৯১ অশোক কুমার দেওয়ান।
- ২০। চাকমা ইতিহাস বিচার ২য় খন্ড ১৯৯৩ অশোক কুমার দেওয়ান।
- ২১। পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রকৃতি ও সংস্কৃতি ১৯৯৪, সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা।
- ২২। চাকমা জাতি ও সমসাময়িক ইতিহাস ১৯৯৬, বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা।
- ২৩। রাজমালা বা ত্রিপুরা ইতিহাস ১৮৯৭, শ্রী কৈলাশ চন্দ্র সিংহ।
- ২৪। মোন কথা ১৯৯১, আধিকারিক মোনঘর প্রকাশন।
- ২৫। চম্পক নগর সন্ধানে : বিবর্তনের ধারায় চাকমা জাতি ১৯৯৯ সুপ্রিয় তালুকদার
- ২৬। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পার্বত্য স্থানীয় সরকার পরিষদ, রাজ্যমাটি ১৯৯৩ এডভোকেট জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা।
- ২৭। চাকমা দর্পণ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ খন্ড- যামিনী রঞ্জন চাকমা (১৯৯৩-১৯৯৬ ইং)।
- ২৮। রাজ্যমাটি বৈচিত্র্যের এক্যতান- জেলা প্রশাসন ২০০৪ ইং।

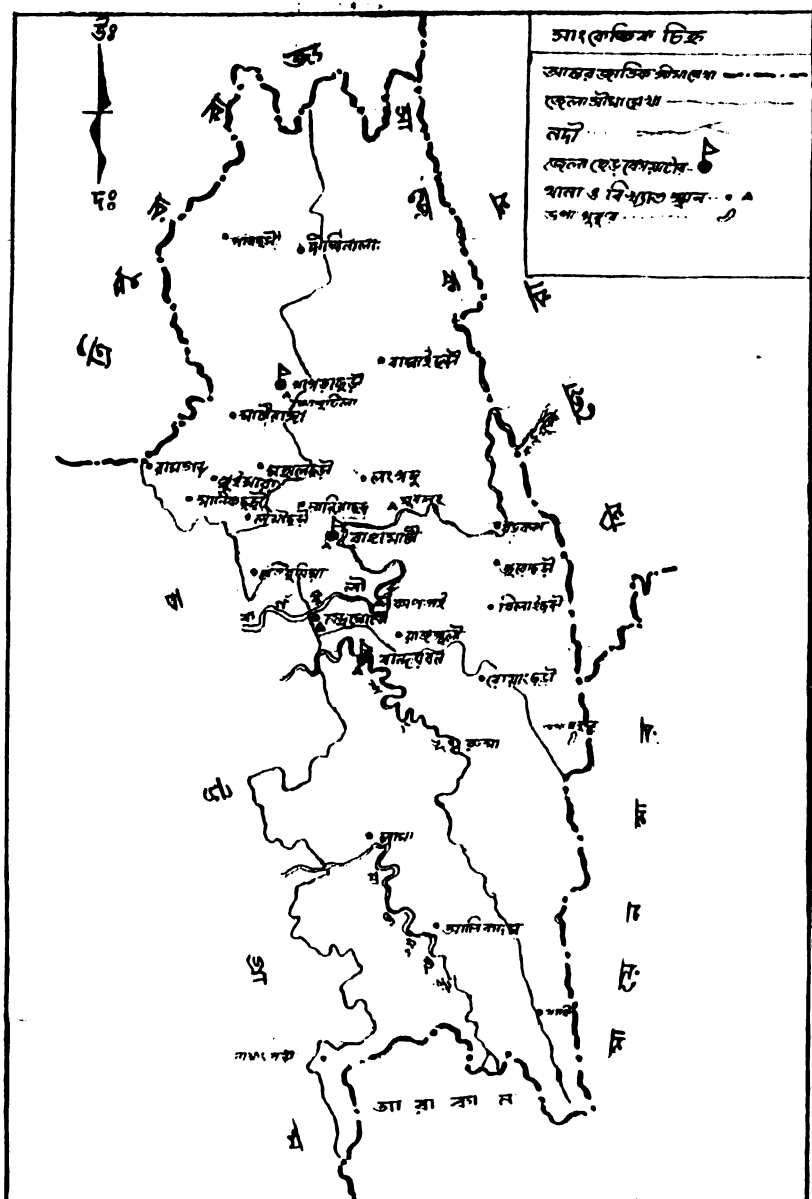
১৮। সাংগঠনিক কার্যক্রমঃ

- (১) রাঙ্গামাটি বৌদ্ধ মৈত্রী সংঘ এর সাধারণ সম্পাদক ৩ মেয়াদ (১৯৯৯-২০১১ইং পর্যন্ত)
- (২) রাঙ্গামাটি বৌদ্ধ-মৈত্রী সংঘ-সভাপতি, ৪র্থ পরিচালনা কমিটি (২০১২ - ২০১৪ ইং) পর্যন্ত।
- (৩) রাজবন বিহার ভিক্ষু মন্ডলীদের ভাষা শিক্ষা কোর্স পরিচালনা কমিটি ম্যানেজার ২০০৬ ইং।
- (৪) উন্নয়ন কমিটি ধনপাতা বনবিহার, রাঙ্গামাটি অধ্যায় এর সভাপতি ২০০৯-২০১৪ ইং।
- (৫) রাঙ্গামাটি জেলা পরিষদে এর সম্মাননা/২০০১ এর কমিটির সদস্য ও বিচার মন্ডলীর সদস্য।
- (৬) বে-সরকারী সংস্থা আশিকা-মান উন্নয়ন কেন্দ্র এর সভাপতি কয়েক মেয়াদ।
- (৭) রাজবন ভাবনা কেন্দ্র (কাটাছড়ি), উপদেষ্টা কমিটি সদস্য।
- (৮) সম্বোধি ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি, উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য
- (৯) ধনপাতা বন বিহার পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা সদস্য।
- (১০) রাঙ্গামাটি সমবায় ব্যাংক পরিচালক (কয়েক মেয়াদ)
- (১১) রাঙ্গামাটি হাউজিং সমবায় সমিতির সভাপতি ২০০৯- ২০১৪ ইং।



গ্রন্থকার- কুমুদ বিকাশ চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা চাকমা অধ্যুষিত অঞ্চল





“ফতে খা”

চাকমা রাজ্য কর্তৃক ১৭৫০-১৭৬৪ খৃ
সেগুন সেনা হাতিতে স্থাপিত বায়ান,

“FATEH KHAN”

CANNON CAPTURED FROM THE MIZO
BY THE CHAKMA RAJA IN 1754